তৃতীয় দুনিয়া

ইয়ে. ঝুকভ
ল. দেল্যুসিন
আ. ইস্কেন্দেরভ
ল. স্তেপানভ

সমস্যাবলি এবং পরিপ্রেক্ষিত

তৃতীয় দুনিয়া

তৃতীয় দুনিয়া

ইয়ে. ঝুকভ
ল. দেল্যুসিন
আ. ইস্কেন্দেরভ
ল. স্তেপানভ

সমস্যাবলি
এবং পরিপ্রেক্ষিত

ইয়ে. ঝুকভ
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান
আকাদেমির সদস্য
ল. দেল্যুসিন
আ. ইস্কেন্দেরভ
ল. স্তেপানভ

তৃতীয় দুনিয়া

সমস্যাবলি এবং পরিপ্রেক্ষিত

(জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের চলতি পর্ব)

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: **বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়**

অঙ্গসজ্জা: **সের্গেই দানিলভ**

Третий мир:
проблемы и перспективы

(Современный этап национально-освободительного движения)

На языке бенгали

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

সূচি

লেখকদের ভূমিকা

এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জাতীয় স্বাধীনতা আর সামাজিক অগ্রগতির জন্যে জনগণের সংগ্রাম হয়ে উঠেছে পৃথিবীজোড়া মনোযোগের কেন্দ্র এবং শিক্ষাপ্রদ তাত্ত্বিক বিচারের বিষয়বস্তু। এমনটা ঘটাতে কয়েকটা উপাদান সাহায্য করেছে।

প্রারম্ভে বলতে হয়, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন এখন বিকশিত হচ্ছে অভূতপূর্ব পরিসরে, পরিব্যাপ্ত হচ্ছে বিশাল বিশাল অঞ্চলে, এই আন্দোলন কোটি কোটি, এমনকি শত শত মিলিয়ন মানুষকে রাজনীতিক সংগ্রামে সক্রিয় অংশীদার করে তুলছে। বিভিন্ন জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের প্রকৃতি আর প্রধান প্রধান ধারা আবিষ্কার করা এবং আধুনিক কালের বিভিন্ন বৈপ্লবিক আর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সেগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা আর প্রাসঙ্গিকতা প্রতিপাদন করা রাজনীতিক এবং তত্ত্বগত দিক থেকেও বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন।

দ্বিতীয়ত, যেসব দেশে এইসব জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন বিকশিত হচ্ছে সেইসব দেশে রয়েছে লক্ষণীয়ভাবে বহুতর অপরিণত সামাজিক সম্পর্ক এবং যথার্থ অনন্যসাধারণ বিভিন্ন ঐতিহাসিক, জাতীয় আর সামাজিক অবস্থা, এইসব মিলে সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন জটিল রাজনীতিক, আর্থনীতিক আর মতাদর্শগত সমস্যা, সেগুলির বিষয়গত বিশ্লেষণ এবং পূর্ণাঙ্গ মার্কসবাদী ব্যাখ্যা দরকার। যাকে বলা হয় 'তৃতীয় দুনিয়া' তার দেশগুলিতে এখন পরিলক্ষিত বহু সামাজিক ব্যাপার বিস্তৃত তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণ থেকে আগ্রহজনক।

তৃতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ক্রমাগত অধিকতর আক্রমণাত্মক কর্মনীতি এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান তৎপরতার

দরুন গত কয়েক বছরে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সামনে কাজগুলি অনেক বেশি জটিল হয়ে পড়েছে। ঘানা আর ইন্দোনেশিয়ার ঘটনাগুলি, মধ্য প্রাচ্যে সংকট এবং অন্যান্য ঘটনা থেকে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করার জন্যে, নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিতে অস্থিত রাজনীতিক আর আর্থনীতিক অবস্থা সৃষ্টি করতে এবং পূর্ববর্তী অবস্থানগুলিতে কোন-না-কোন উপায়ে নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগুলো চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে গভীর বিশ্লেষণ করে দেখা আবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, বিভিন্ন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সাময়িক বিপত্তিগুলোর কারণ কী, ঐসব আন্দোলনের এখনকার বাধাবিঘ্নগুলো কী, সেগুলির মোকাবিলা করার উপায়-উপকরণ কী।

এশিয়া এবং আফ্রিকার যেসব প্রাক্তন ঔপনিবেশিক ভূমি স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেগুলিতে বিকাশের প্রক্রিয়া এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৃথক পৃথক। কেউ কেউ পুঁজিতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছে; জনগণের স্বার্থের অনুযায়ী সুদূরপ্রসারী সামাজিক এবং আর্থনীতিক সংস্কারের কর্মসূচি ধরে চলেছে কেউ কেউ; আবার অন্য কেউ কেউ এক ঐতিহাসিক চৌমাথায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা এখনও মনস্থির করতে পারে নি। নিঃসন্দেহে কিছু পরিমাণে এর কারণ এই যে, এগুলির কোন কোন দেশ রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে বিশ বছরের বেশি হল, অন্যান্যেরা রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে সবে হালে। কিন্তু প্রধান কারণটাকে দেখতে পাওয়া যাবে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন মাত্রার ক্ষেত্রে, এই দেশগুলির সামাজিক কিংবা শ্রেণীগত গড়নের পার্থক্যের মধ্যে, তাদের জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের পরিসর আর প্রাবল্যের মধ্যে, তাদের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর আপেক্ষিক সংখ্যাগত আর সাংগঠনিক শক্তির মধ্যে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইসব পার্থক্যের উপর যদি ধরা হয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক, জাতিবিদ্যাগত আর জাতীয় বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আর ধর্মীয় ঐতিহ্য, এবং আয়তন, লোকসংখ্যা, আকার আর বিভিন্ন ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের মতো উপাদানগুলি, তাহলে দেখা যাবে এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলির সামনে বহু সমস্যারই জন্যে প্রত্যেকটি পৃথক ক্ষেত্রে পৃথক-পৃথকভাবে দৃষ্টিপাত করা দরকার। প্রসঙ্গক্রমে, সামাজিক আর আর্থনীতিক সমস্যাবলির ক্ষেত্রেই কেবল নয়, রাজনীতি আর

রাজনীতিজ্ঞতার বিভিন্ন দিকেও, বিশেষত, সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন রূপ, পদ্ধতি আর হারের ক্ষেত্রেও এই সিদ্ধান্ত খাটে।

তবু, আজকের জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সামনে যেসব মূর্ত-নির্দিষ্ট সমস্যা রয়েছে সেগুলির গভীর বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নেওয়া চাই কোন কোন সামান্যীকরণ আর সিদ্ধান্ত, তাহলে সমগ্রভাবে এই আন্দোলনের পক্ষে অভিন্ন কয়েকটা সাধারণ নিয়মে উপনীত হওয়া সম্ভব। অধিকন্তু, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের ভিতরে বহু নতুন ঘটনকে যদি পৃথক পৃথক করে না ধরে, চলতি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির পটভূমিতে, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, দুই বিশ্ব সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, একমাত্র তবেই ঐসব ঘটনের সঠিক উপলব্ধি হতে পারে এবং সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কাজেই, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে চালু সামাজিক-আর্থনীতিক আর রাজনীতিক প্রক্রিয়াগুলির যেকোন মূর্ত-নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের মধ্যে সমগ্রভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ তত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্যাবলির একটা বিবরণ থাকা চাই, এটা অপরিহার্য।

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের দ্রুত বিকাশের আনুকূল্যে গত কয়েক বছরে বেশ কতকগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেগুলিতে, নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিতে পরিলক্ষিত সবচেয়ে আগ্রহজনক ঘটনা আর ব্যাপারগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি থেকে পাওয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাধারণ সিদ্ধান্তকে যোগ্যতাসহকারেই প্রধান প্রধান তত্ত্বগত আর ব্যবহারিক সমস্যাবলির বিবরণের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে, উন্নয়নশীল দেশগুলির বিষয়ে রচনার প্রবল স্রোতের মধ্যে অল্প কয়েকটা রচনাতেই তৃতীয় দুনিয়ার বৈশিষ্ট্যনির্দেশক সামাজিক ব্যাপারগুলির সারমর্ম এবং ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তার উপর, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের অনেক সমস্যার অপব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে আধুনিক ইতিহাসরচনাবিদ্যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলি সংক্রান্ত ঘটনাবলি এবং তথ্যাদির বুর্জোয়া ব্যাখ্যা দিচ্ছেন কোন কোন লেখক, আবাব আরও কেউ কেউ র‍্যাডিক্যাল বামপন্থী সুবিধাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব ব্যাপারের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছেন।

এই সবকিছুর ফলে একটা বিষয়গত বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ হাজির করার গুরুত্ব দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে — সেটা হবে এমন বিশ্লেষণ যাতে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির পরিচালিত মুক্তি-সংগ্রামের নিয়ামক নিয়মগুলি দৃষ্টিগোচর

হবে, আর, নতুন স্বাধীন দেশগুলির পক্ষে বিশিষ্ট বিভিন্ন মেজাজের অসাধারণ বৈচিত্র্য এই আন্দোলনের উপর যেসব প্রকৃতিনির্দেশক উপাদান চাপিয়ে দিয়েছে সেগুলিকে দেখানো হবে, তেমনি, দেখানো হবে আজকের জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনগুলির ভবিষ্যৎ বিকাশের ধারাগুলিকেও।

এই বিশ্লেষণে সমস্যাগুলিকে বিচার-বিবেচনা করতে চাওয়া হয়েছে তিনটে শিরোনামায়: রাজনীতিক, সামাজিক-আর্থনীতিক এবং মতাদর্শগত।

রাজনীতিক শিরোনামায় সমস্যাগুলির মধ্যে থাকবে — আজকের জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলির প্রকৃতি এবং সেগুলির চালিকাশক্তি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা, আর এইসব বিপ্লব এবং আমাদের একালের অন্যান্য বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্কের মূল্যায়ন।

সমস্ত প্রগতিশীল, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিকে একই অভিন্ন জাতীয়-গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কাঠামের মধ্যে সংহত করার উপায়, উপকরণ এবং রূপ বেছে নেবার ব্যাপারে এশিয়া আর আফ্রিকার নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির পক্ষে বিপুল ব্যবহারিক মূল্যসম্পন্ন কাজ হল বিভিন্ন শ্রেণীর আর বিভিন্ন সামাজিক সমষ্টির মধ্যে সম্পর্ক এবং সমাজে সেগুলির আপেক্ষিক গুরুত্বের বিশ্লেষণ।

রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জিত হবার পরে জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলি মিলিয়ে না গিয়ে বরং পরিসরে এবং প্রাবল্যে আরও বেড়েই ওঠে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে সুতীব্র সংঘাতের অবস্থার মধ্যে জীবনযাত্রার নতুন প্রণালীর জন্ম হচ্ছে। মুক্ত দেশগুলির সামাজিক প্রগতি এবং প্রকৃত স্বাধীনতার সংগতিপূর্ণ বিকাশের পন্থা নির্ধারণের জন্যে সংগ্রামরত বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজশ পাতানো স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরোধিতার মুখোমুখি হয়। সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক বিকাশের অমুক কিংবা অমুক পথ বেছে নেবার ব্যাপারটা নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির পক্ষে একটা মূলগত সমস্যা — কেননা, কোটি কোটি মানুষের জীবনের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের আগে এই সমস্যাটা ছিল তত্ত্বক্ষেত্রের বিষয়, কিন্তু এখন এটা সাধারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে এসে গেছে, এখন বিভিন্ন সামাজিক-শ্রেণীগত শক্তির এবং ঐসব শক্তির স্বার্থসেবী রাজনীতিক পার্টিগুলির জোট বাঁধার চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন নিরিখ হয়ে উঠেছে এই প্রশ্নটা।

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের এই চলতি পর্বে সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্যাগুলি বিশেষ জরুরী হয়ে উঠেছে। এর ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে — বিশেষত, যেমন, উত্তরণকালের অনন্যসাধারণ প্রকৃতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, মুক্ত দেশগুলির সামাজিক এবং আর্থনীতিক বিকাশে বিস্তর-সহায়ক বিষয়গত এবং অধ্যাত্মীয় উপাদানগুলির নিশানাদিহি করা — যেমন, উত্তরণকালে রাষ্ট্রের ভূমিকা, জনগণের রাজনীতিক সংগঠনের তাৎপর্য, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাজে জনগণকে টানবার উপায়-উপকরণ, ইত্যাদি।

জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের ব্যাপারে এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলি ছোট-বড় বহু সমস্যার মুখোমুখি আসে -- সেগুলির মীমাংসা সহজ নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এবং অন্যত্রও আর্থনীতিবিদেরা এই দেশগুলিতে আর্থনীতিক জোয়ারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সর্বপ্রযত্নে কাজ করছেন -- এইসব সমস্যা হল: এইসব দেশের বেশির ভাগই যেসব আর্থনীতিক বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়ে চলেছে সেগুলির কারণ এবং সেগুলিকে অতিক্রম করার উপায়; জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে অর্থ যোগানের বিভিন্ন উৎস; কৃষির প্রশ্ন এবং খাদ্যসমস্যা; জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত-মালিকানাধীন ক্ষেত্রের তুলনামূলক গুরুত্ব; শিল্পযোজনের হার এবং লঘু আর গুরু শিল্পের অনুপাত; উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ক্রিয়া, ইত্যাদি। অবশ্য এই সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব আজ পুরোপুরি দেওয়া যায় না। তবে, এইসব এবং অন্যান্য সমস্যা যে সূত্রবদ্ধ হচ্ছে, এটাই সেগুলির যথোপযুক্ত উপলব্ধি এবং সমাধানের সহায়ক হতে পারে। এখানে প্রসঙ্গটা হল, প্রধানত, আজকের অবস্থায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গ্রহণীয় বিজ্ঞানসম্মতভাবে ন্যায্য আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন রূপ এবং প্রণালী আবিষ্কার করা; সেগুলির যথার্থ সম্ভাবনা এবং এই দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার দেশগুলির সঙ্গে আর্থনীতিক সহযোগিতার সম্ভাব্যতার বিচার-বিবেচনা অনুসারে সেটা করতে হবে।

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন নিয়ে অধ্যয়নকারীরা ইদানীং সংশ্লিষ্ট মতাদর্শগত প্রশ্নগুলির দিকে ক্রমেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। এটা নিছক সমাপতনিক ব্যাপার নয়: জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রটা মতাদর্শগত যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠেছে বলে সেটা হচ্ছে। মতাদর্শগত অবস্থানগুলিতে

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির গুরুতর রাজনীতিক পরাজয় ঘটেছে, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তারা কোন কোন আর্থনীতিক সুযোগসুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছে -- তবু, এইসব অবস্থান ছেড়ে দেবার অভিপ্রায় তাদের নেই। প্রকৃতপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবগুলির অধিকতর বিকাশ যদি পূর্বাহ্নে ব্যর্থ করা না যায় তাহলে সেটাকে যাতে ব্যাহত করা যায় এমন একগুচ্ছ মতাদর্শগত ধারণা উদ্ভাবন করা এবং মুক্ত দেশগুলিকে যেকোন মূলগত সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে বেশ কিছু কাল যাবত দূরে রাখার আশায় তারা তৃতীয় দুনিয়ার উপর মতাদর্শগত চাপ আরও বাড়িয়েছে। তৃতীয় দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রসারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যে এই অঞ্চলের মাটিতে বুর্জোয়া মতাদর্শের ক্ষয়ে যাওয়া ধারণাগুলোকে আবার জীইয়ে তোলা তাদের আর একটা লক্ষ্য।

সাধারণভাবে বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপর এবং বিশেষভাবে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের উপর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব যেসব কুযুক্তিপূর্ণ রাজনীতিক এবং তাত্ত্বিক নীতি চাপিয়ে দিতে চাইছে সেগুলির বিরুদ্ধে এই অঞ্চলে বিপ্লব আর প্রগতির শক্তিগুলির লড়াই চালানো অবশ্যকরণীয়, তার ফলে পরিস্থিতি আরও উগ্র হয়ে উঠেছে।

যত প্রকাণ্ডই হোক না কেন, কোন একটা মাত্র বিশ্লেষণে এশিয়া আর আফ্রিকার দেশে দেশে জনগণের জীবন আর সংগ্রামের সমস্ত দিক নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে পারার দাবি করতে পারা যায় না। কাজেই, এই রচনার পরিধি সীমাবদ্ধ করার দরকার হয়েছে: অনেক সমস্যা কেবল বিবৃত করা হয়েছে, সেগুলির আরও বিচার-বিশ্লেষণ দরকার হবে।

পর্যালোচিত প্রক্রিয়াগুলি অত্যন্ত জটিল, ঘটনাবলি এখনও সুস্থিত হয়ে ওঠে নি, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পরিস্থিতিই ঘনঘন এবং প্রায়ই অপ্রত্যাশিত-ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে — এইসব কারণে এই লেখকেরা কোন শর্তহীন মতপ্রকাশ কিংবা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা থেকে বিরত থাকবার চেষ্টা করেছেন।

উপর-উপরকার বিভিন্ন ব্যাপারের নিচে যেসব গভীর প্রক্রিয়া জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন শ্রেণী, সামাজিক সমষ্টি, রাজনীতিক পার্টি আর নেতাদের মনোভাব নির্ধারণ করছে সেগুলিকে লক্ষ্য করতে পাঠককে সাহায্য করা এবং, এইভাবে, জাতীয় আর সামাজিক মুক্তির জন্যে এশিয়া আর আফ্রিকার দেশে দেশে জনগণের কঠিন সংগ্রামের ক্ষেত্রে যত সামান্যই হোক কিছু অবদান রাখাই এই লেখকদের বিবেচনায় তাঁদের কাজ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমাদের একালে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন

জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলির আঘাতে আঘাতে বিশ্ব ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে — এই বিপ্লবের প্রবল বিকাশ আমাদের একালের একটা বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদান। পুরন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলোর ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন জাতীয় রাষ্ট্র, আর এইসব রাষ্ট্রের মানুষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির শিকার হতে আর রাজি না হয়ে নিজেদের ভাগ্য গড়ার কাজটা নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে বারো বছরের মধ্যে এশিয়ায় সতেরটা দেশ ঔপনিবেশিক জোয়াল ছুড়ে ফেলে দিল। অল্প কয়েকটা দেশের নাম করে বলা যায়, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা এবং সিংহল এখন স্বাধীন বিকাশের কর্মসূচি নিয়ে চলেছে।

এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক পরাজয়ের ঘা খেয়ে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আফ্রিকায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারবে বলে আশা করেছিল। মার্কিন সাংবাদিক এবং ঔপনিবেশিক রাজগুলোর সক্রিয় সমর্থক জন গাণ্টার তখন লিখেছিলেন: 'বিশাল এবং শক্তিপরীক্ষার ক্ষেত্র এই মহাদেশ পশ্চিমী দুনিয়ার পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন, তার কারণ শুধু এই নয় যে, এর অবস্থান সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন আর মহাদেশটা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন কাঁচামালে ঠাসা, কারণটা এই যে, এটা হল আমাদের শেষ সীমান্ত। এশিয়ার অনেকটা খোয়া গেছে, আফ্রিকা রয়েছে।'* তবে, উপনিবেশবাদীরা যেমনটা আশা করেছিল সেইভাবে আফ্রিকা দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় রইল না।

* John Gunter, *Inside Africa*, New York, 1955, p. 4.

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবগুলির ঊর্মিভঙ্গ ক্রমবর্ধমান শক্তিতে আছড়ে পড়ে পড়ে প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় এবং পরে ক্রান্তীয় আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের বনিয়াদগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করল। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে আফ্রিকার চৌত্রিশটা রাষ্ট্র জাতীয় সার্বভৌমত্ব অর্জন করল।

এই কথাগুলি লিখবার সময়ে এশিয়ায় আর আফ্রিকায় ৭০টার বেশি দেশে সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসন আর নেই। ১৯১৯ সালে পৃথিবীর ৭২ শতাংশ জুড়ে ছিল উপনিবেশ আর পরাধীন দেশগুলি, সেগুলিতে ছিল পৃথিবীর লোকসংখ্যার ৬৯ শতাংশের বেশি, কিন্তু এখন বাদবাকি উপনিবেশগুলির আয়তন ভূপৃষ্ঠের ৪ শতাংশেরও কম, আর সেগুলিতে আছে পৃথিবীর লোকসংখ্যার ১·১ শতাংশ — ৩ কোটি ৭০ লক্ষের চেয়ে সামান্য বেশি।

সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এইসব সার্বভৌম রাষ্ট্রের দেখা দেবার ঘটনাটা হল জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি, — ঔপনিবেশিক আর পরাধীন ভূমিগুলিতে জনগণের দীর্ঘকাল যাবত পরিচালিত কঠোর সংগ্রামের একটা স্বাভাবিক ফল। এ হল বিপুল তাৎপর্যসম্পন্ন একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

১। জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যের কারণ

ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন দেশগুলি জাতীয় স্বাধীনতায় পেশীছেছে বিভিন্ন পথে। কোন কোন দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে, আবার অস্ত্রের শরণ নিতে হয়েছে অন্যান্যকে। তবু, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশেষ অবস্থা অনুসারে রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের এইসব উপায়-উপকরণ যতই বিভিন্ন এবং অনন্য হয়ে থাকুক না কেন, এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে দীর্ঘ কষ্টসাধ্য লড়াইয়ের পরে, এই উপাদানটা সমস্ত ক্ষেত্রেই অভিন্ন। স্বাধীনতা কঠোর লড়াই করে জিতে নিতে হয়, স্বাধীনতা আপনা থেকে আসে না।

উপনিবেশবাদের মতাদর্শবাদীরা বলে, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি নাকি বদলে গেছে, এমনকি, উপনিবেশগুলোকে ছেড়ে দিলেই যেন তাদের লাভ -- এই কারণেই নাকি উপনিবেশবাদীরা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারেই

অধীনস্থ জাতিগুলিকে স্বাধীনতা মঞ্জুর করা উচিত মনে করেছে।* বৃটিশ উপনিবেশবাদের সমর্থকেরা বিশ্বাস করাতে চায় যে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক কর্মনীতি বরাবরই এমনভাবে রচিত যাতে 'লোকের ন্যায্য জীবনযাত্রার মান, এবং যেকোন মহলের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি, এই দুইই নিশ্চিত করার অবস্থায় ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলিকে কমনওয়েলথের মধ্যে দায়িত্বশীল স্বশাসনে পরিচালিত করা' যায়।**

উপনিবেশবাদীদের তথাকথিত সহৃদয় অভিপ্রায়ের কোন কথাই অবশ্য উঠতে পারে না: কথাটা হল এই যে, পৃথিবীটা - - আর তার সঙ্গে উপনিবেশ আর পরাধীন দেশগুলি — এমন মাত্রায় বদলে গেছে যাতে সাম্রাজ্যবাদীদের আয়ত্তের বাইরে বিভিন্ন হেতু তাদের একটার পর একটা অবস্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য করছে।

এই হেতুগুলি কী, তার নিশানাদিহির চেষ্টা করা যাক।

ঔপনিবেশিক জাতিগুলির জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রধান, নিষ্পত্তিমূলক হেতু হল ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক রুশ বিপ্লব, — এই বিপ্লব কোটি কোটি মানুষের বিপুল সুপ্ত শক্তি উৎসারিত করে দিল এবং রাজনীতিক বিষয়াবলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে তাদের অনুপ্রাণিত করল। রাশিয়ায় বৈপ্লবিক ঘটনাবলি পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় একটা ভেদ ঘটালো, এবং লাগিয়ে দিল পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট, আর তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট, — সরাসরি এই বৈপ্লবিক

---

* দৃষ্টান্তস্বরূপ, *New York Times* পত্রিকার রাজনীতিক ভাষ্যকার সাইরাস্ ল. সুল্জ্বের্গেরের মত তাই, তিনি লিখেছেন: 'সংক্ষেপে, ধনী ভূমিগুলি দেখা যাচ্ছে আরও ধনী হচ্ছে, আর দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হচ্ছে। রোয়ান্দার মানুষ অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত—যদিও স্বাধীনতার জন্যে অধিকতর গর্বোদ্দীপ্ত — জীবনে নেমে যাচ্ছে, কিন্তু আফ্রিকায় সাম্রাজ্যিক ব্যয়ের জন্যে বেলজিয়ম আর দায়ী নয়, এই বেলজিয়ম আরও বেশি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠছে। গাবোনের অধিবাসীরা আরও কম খেতে পাচ্ছে, টাঙ্গানাইকার অধীবাসীরা আরও খারাপ পরছে, কিন্তু উপনিবেশবাদের খরচখরচা আর গর্ব দুইই বাদ দিয়ে ইউরোপ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠছে।' (C. L. Sulzberger, *Unfinished Revolution. America and the Third World*, New York, 1965, p. 9.)

** Kenneth Bradley, *Britain's Purpose in Africa*, London, 1959, p. 3.

ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক দুনিয়া অতি অস্থির অবস্থায় পড়ে গেল।

১৯১৭ সালের আগে উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে সমস্ত জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব চূর্ণ করা হত আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতা দিয়ে, তখন সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্রাধিপত্য ছিল।* অক্টোবর বিপ্লব পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। এই বিপ্লব জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে মোড় ঘুরিয়ে দিল। তার পর থেকে উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলিতে বৈপ্লবিক আন্দোলন বিকশিত হতে থাকল ঢের বেশি ব্যাপক পরিসরে, এই আন্দোলন সাংগঠনিক দিক দিয়ে উন্নতর হল। শুধু তাই নয়: বিপ্লবীদের মনে আসন্ন মুক্তির প্রবল আস্থা এনে দিল অক্টোবর বিপ্লব।

অক্টোবর বিপ্লব যে এশিয়ায় আর আফ্রিকায় জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামে প্রবল চলনশক্তি যুগিয়েছে, এ কথা উপনিবেশবাদের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকেরাও মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। তবে, বুর্জোয়া লেখকেরা যা করতে বিরত থাকছে সেটা করছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব; মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের পক্ষে অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য এবং এমনকি, পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কথাটাকেও খাটো করে দেখাবার কাজ হাতে নিয়েছে ঐ নেতৃত্ব। সেই ১৯৪৯ সালে মাও সে-তুং কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক কথাই বলেছিলেন: 'বলা হয়, 'আন্তর্জাতিক সাহায্য ছাড়াও জয় সম্ভব।'

---

* আন্তর্জাতিক শ্রমিক আর কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা এবং বহু বছর ধরে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ অধ্যয়নকারী র. পামে দত্ত স্মৃতিচারণ করে বলেছেন: '১৯১৭ সালের আগেকার জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের জগতের কথা আমার বেশ ভালভাবে মনে আছে, তখন ভারত এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় আন্দোলনের নেতারা ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজে আমার বাবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন; পারসিক বিপ্লবের সম্মানার্থে ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত মজলিশ বা এশীয় ছাত্রদের প্রথম সমিতির বৈঠক বসেছিল আমার বাবার বাড়ির একটা কামরায় (জওহরলাল নেহরু তখন ছাত্র ছিলেন, তিনি সদস্য ছিলেন, যদিও খুব সক্রিয় নয়)। পৃথিবীর সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদের নৃশংসতা, ঔপনিবেশিক যুদ্ধ এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বৃটেনে জন-আন্দোলন আলোড়ন চালাত। অবিরাম প্রতিবাদ-সভা হত। মিসরে, ভারতে, পারস্যে, কঙ্গোয় দমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ চলত। কিন্তু ১৯১৭ সালের আগে উদ্‌যাপন করার মতো কোন জয় ছিল না।' (*Marxism Today*, Vol. 8, No. 1, 1964, p. 9.)

ওটা একটা হেত্বাভাস। সাম্রাজ্যবাদ বজায় থাকতে আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক শক্তিগুলির কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের সাহায্য ছাড়া কোন দেশে কোন যথার্থ জনগণের বিপ্লব জয়লাভ করতে পারে না, জয় হলেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় না... সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি না থাকত, ফাশিস্টবিরোধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদি বিজয় না হত, যদি জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চূর্ণ না হত - - এটা আমাদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন - - ইউরোপে যদি জনগণতন্ত্রগুলি দেখা না দিত, প্রাচ্যের নিপীড়িত দেশগুলির সংগ্রামে যদি গতিবেগ সঞ্চারিত হতে না থাকত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান এবং অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশে শাসক প্রতিক্রিয়াপন্থী চক্রগুলির বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রাম যদি পরিচালিত না হত, সংক্ষেপে, এই সমস্ত উপাদান যদি না থাকত, তাহলে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির শক্তি প্রকৃতপক্ষে যা আছে তার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি হত। এইসব উপাদান না থাকলে আমরা জয়যুক্ত হতে পারতাম? নিশ্চয়ই না।'* আজ চীনে তারা সবাইকে এই কথাটা ভুলিয়ে দিতেই চাইছে — কেননা, এই কথাটা চীনা নেতৃত্বের এখনকার খোলাখুলি শভিনিস্টিক, জাতীয়তাবাদী কর্মনীতির বিরোধী।

নাৎসী জার্মানি আর সমরবাদী জাপানের সামরিক বিপর্যয় এবং ইউরোপ আর এশিয়ার অনেক দেশে জয়যুক্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার উপর নতুন প্রচণ্ড আঘাত হয়ে পড়ল। ইতোমধ্যে সংকটাপন্ন ঐ ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়তে আরম্ভ করল।

সমাজতন্ত্র একটিমাত্র দেশের চৌহদ্দি পার হয়ে সম্প্রসারিত হল, গড়ে উঠল সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা — তার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিসাম্যের মূলগত পরিবর্তন ঘটে গেল এবং জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যমণ্ডিত বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। সমাজতন্ত্র পরাক্রমশালী শক্তি হয়ে উঠে সারা পৃথিবীতে বিকাশের ধারাগুলির উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করতে না থাকলে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার দ্রুত ভাঙনের মতো বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা কখনও ঘটতে পারত না, এই ভাঙনের ফলে ইতোমধ্যে ১৫০ কোটির বেশি মানুষ মুক্তিলাভ করেছে।

---

* মাও সে-তুং, 'জনগণতন্ত্র সম্বন্ধে', মস্কো, ১৯৪৯, পৃঃ ৯ (রুশ সংস্করণ)।

মানবজাতির ঐতিহাসিক বিকাশের প্রধান মর্মবস্তু, প্রধান ধারা এবং প্রধান প্রধান উপাদানকে এখন সাম্রাজ্যবাদ আর নির্ধারণ করছে না, তা নির্ধারণ করছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা এবং সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শক্তিগুলি। সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা গুরুতর সংকটের ভিতর দিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে এই ব্যবস্থার ভিতরে দ্বন্দ্ব-বিরোধগুলো বেড়ে চলেছে। কিন্তু, পুঁজিতন্ত্র তার আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বগুলোর কবলে পড়েছে বলে একটা ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিতন্ত্রের পতন ঘটবে আপনা থেকেই, এমন ধারণার সঙ্গে সেটাকে কোনক্রমেই এক করে দেখা চলে না। যুদ্ধোত্তর বছরগুলির অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত বিপ্লবের উৎকর্ষগুলি, শিল্পে স্বয়ংক্রিয়া, রাষ্ট্রীয় নিয়মনের নতুন নতুন রূপ আর পদ্ধতি, আর্থনীতিক সমন্বয়, অর্থনীতির সামরিকীকরণ এবং আরও কতকগুলি উপাদানকে পুঁজিতন্ত্র লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে। তবে, সেটা পুঁজিতন্ত্রের মূল গলদগুলো সংশোধন করতে পারে নি, তা কখনও পারবেও না। অনেক চেষ্টা করেও পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার সহজাত বদ্ধতার প্রবণতা অতিক্রম করতে পারে নি। অন্য দিকে, পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতায় বিশ্ব সমাজতন্ত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে সাফল্য লাভ করছে, এ কথা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হচ্ছে।

আজকের পুঁজিতন্ত্রের সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলি পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের ভিতরকার মৌলিক দ্বন্দ্বটাকে অতিক্রম করতে পারে নি — এই দ্বন্দ্ব হল শ্রম আর পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্ব; সেগুলি বরং এই দ্বন্দ্বের প্রকোপ বাড়িয়ে দিয়েছে, শ্রেণী-শক্তিগুলির সমবর্তন বেড়েছে। অগ্রসর পুঁজিতন্ত্রের দেশগুলিতে যুদ্ধোত্তর কালপর্যায়ে ধর্মঘট আন্দোলনের পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ১,৬৫,৬০০টা ধর্মঘটে শ্রমিকসংখ্যা ছিল ৭,৪৫,০০,০০০, আর ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে ধর্মঘটের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,০৯,৮০০, সেগুলিতে জড়িত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ২৫,৯১,০০,০০০। যুদ্ধপূর্ব কালপর্যায়ের সঙ্গে তুলনায় শিল্পে-অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধর্মঘটীদের গড় বার্ষিক সংখ্যা ৩·৫ মাত্রা বেড়েছে।*

* 'মহান অক্টোবর এবং বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া', মস্কো, ১৯৬৭, পৃঃ ২৭১ (রুশ সংস্করণ)।

আজকাল শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে ক্রমাগত বেশি বেশি মাত্রায় একটা ঔপনিবেশিকতাবিরোধী ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, সেটা হল সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের শিকার জাতিগুলির সপক্ষে। এটা যুদ্ধোত্তর কালপর্যায়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক জাতিগুলির মুক্তির জন্যে ফ্রান্স, ইতালি, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়ম, হল্যান্ড, স্পেন এবং পর্তুগালের প্রগতিশীল শক্তিগুলির খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান হয়েছে।

এশিয়ায় আর আফ্রিকায় জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলির একটা বৈশিষ্ট্য হল ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক যোগাযোগ আর সহযোগিতা; একলা চলবার কোন ঝোঁক নেই।* যখনই জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামরত কোন জাতি স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা অর্জন করে সেটা মুক্তি আর জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে তখনও সংগ্রামরত ঔপনিবেশিক জাতিগুলির পক্ষে একটা ছাঁকা লাভ। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ আর নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এশিয়া আর আফ্রিকার জাতিগুলি একখানা দুর্দান্ত অস্ত্র গড়ে তুলেছে — এই অস্ত্র হল তাদের ঐক্য আর সংহতি। এই যেসব জাতি মুক্তি অর্জন করেছে কিংবা করছে তাদের রয়েছে বিভিন্ন অভিন্ন লক্ষ্য, আর সাম্রাজ্যবাদ তাদের একই অভিন্ন শত্রু। অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণী কিংবা সামাজিক স্তরের মধ্যে নিহিত বিভিন্ন পার্থক্য এবং প্রায়ই মতাদর্শ, রাজনীতিক মত-বিশ্বাস আর ধর্মমতের পার্থক্যের দরুন তাদের লড়াইয়ের ধরনে যেকোন পার্থক্য সত্ত্বেও ওটাই তাদের সক্রিয়, সংগ্রামী মৈত্রীর বাস্তব ভিত্তি।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এইসব মূল উপাদানের ফলেই এশিয়ায় আর আফ্রিকায় জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলির সাফল্যমণ্ডিত বিকাশ ঘটেছে। তবে, খাস উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলির ভিতরেই কোন কোন সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক উপাদান পূর্বাহ্নে সুপরিণত হয়ে না উঠলে এইসব বিপ্লব এই একই মাত্রায় সাফল্যমণ্ডিত হত না। এই রকমের একটা ঘটনা

---

* এই মনোভাবটিকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন বর্মী নেতা আউং সান্, তিনি খুব স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে, 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাধারণ বৈপ্লবিক আন্দোলনের কাঠামের মধ্যে যদি পরিচালিত হয় একমাত্র তবেই বর্মায় বিপ্লবের সাফল্যমণ্ডিত পরিসমাপ্তি ঘটানো যেতে পারে।' 'বর্মার চ্যালেঞ্জ' (বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার সংকলন), মস্কো, ১৯৬৫, পৃঃ ২৩৯ (রুশ সংস্করণ)।

হল এমনসব সামাজিক শক্তির উদ্ভব যেগুলি জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা ছাড়াও এই আন্দোলনের ভার হাতে নেবারও যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হবার ঠিক আগের বছরগুলিতে সমস্ত সামাজিক স্তরের দ্রুত ক্রমবর্ধমান রাজনীতিক তৎপরতা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। যেমন শ্রমিকেরা তেমনি কৃষকেরা কার্যত সর্বজনীন পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরণ চালিয়েছিল। দেখা দিয়েছিল যেমন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক গণ-সংগঠন, তেমনি বিভিন্ন রাজনীতিক পার্টি। যেমন, ভারতে ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৪৭ সালের গোড়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনে সমবেত হয়েছিল কার্যত প্রত্যেকটি শিল্পের শ্রমিক, কৃষক, ব্যাঙ্কের কর্মচারী, শিক্ষক, ইত্যাদি। 'অবিলম্বে স্বাধীনতা'র দাবি সর্বাত্মক হয়ে উঠেছিল: শ্রমিক থেকে জাতীয় বুর্জোয়া অবধি সমস্ত শ্রেণী এবং সমস্ত পার্টি আর অন্যান্য সংগঠন এই দাবির সমর্থক ছিল।* বর্মায় ১৯৪৬—১৯৪৭'এর শীতের মাসগুলিতে প্রকৃত স্বাধীনতার দাবির সমর্থনে দেশ জুড়ে শ্রমিক, কর্মচারী এবং ছাত্ররা বহু সভা-সমাবেশ, মিছিল আর ধর্মঘট চালিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে বর্মায় কার্যত সাধারণ রাজনীতিক ধর্মঘট চলেছিল।**

ঔপনিবেশিক আফ্রিকায়ও লোকসংখ্যার সমস্ত স্তর ক্রমেই অধিকতর মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।*** ক্রান্তীয় আফ্রিকার দেশগুলিতে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠিত হয়েছিল বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন

---

* 'ভারতের আধুনিক ইতিহাস,' মস্কো, ১৯৫৯, পৃঃ ৪৬১ (রুশ সংস্করণ)।

** ভ. ফ. ভার্সিলিয়েভ, 'বর্মার ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ (১৮৮৫—১৯৪৭)', মস্কো, ১৯৬২, পৃঃ ৩৬৪ (রুশ সংস্করণ)।

*** আফ্রিকার সমস্যাবলি সম্বন্ধে ইংরেজ অধ্যয়নকারী ডেরেক কার্টুন ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিকে খুব ঠিকই বলেছিলেন যে, 'এই মহাদেশে ফ্রান্স এবং বৃটেনের অধিকৃত প্রায় প্রত্যেকটা রাজ্যে প্রায় অবিরাম রক্তপাতের বিস্ময়কর চিত্রটাই গত বছরগুলির মুখ্য তাৎপর্যসম্পন্ন উপাদান নয়। সেটা হল — সাম্রাজ্যিক শক্তিগুলি আফ্রিকার মানুষের উপর যে নিকৃষ্টতম কার্যকলাপ চালিয়েছে তার মুখে সাধারণভাবে তাদের বিচিত্র, সুকৌশলী, অদম্য অগ্রগতি।' Derek Kartun, *Africa, Africa! A Continent Rises to Its Feet,* London, 1954, p. 27.

আর রাজনীতিক পার্টি, সেগুলি বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মানুষকে সংগঠিত করেছিল, সেগুলি বস্তুত ছিল জাতীয়-গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ধরনের সংগঠন। সেগুলির কর্মসূচিতে ছিল রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্যে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান।

ঐ কালপর্যায়েই সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তি এবং রাজনীতিক পার্টিগুলির মৈত্রী গড়ে উঠেছিল এবং সেটা হয়েছিল জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলির অপেক্ষাকৃত দ্রুত জয় ঘটাবার একটা প্রধান উপাদান। এই মৈত্রী এখনও [illegible] প্রাক্তন নিপীড়িত জাতিগুলির হাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র — কেননা, উপনিবেশবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নি।

২। জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলির নতুন নতুন দিক

আমাদের একালে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের নতুন নতুন প্রলক্ষণ দেখা দিয়েছে; ঊনিশ আর বিশ শতকের বাঁকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি থেকে এই আন্দোলনের পার্থক্য-নির্দেশ করছে এই প্রলক্ষণগুলি — এগুলিকে আমরা এখন বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করব।

১। আমাদের একালে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে এত বেশি দেশ এবং এত প্রকান্ড প্রকান্ড জনসমষ্টি জড়িত হয়েছে যা আগে কখনও হয় নি। এই আন্দোলন একটা মাত্র দেশের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সম্প্রসারিত হয়ে পৃথিবীর লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে জড়িয়ে নিয়েছে — তাই, এখন বলা যেতে পারে এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক প্রকৃতি লাভ করেছে। এই আন্দোলন আর কোন একটা মাত্র ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে না — এখন এই আন্দোলন সমগ্রভাবে সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে।

পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের একটা অভিব্যক্তি হিসেবে পৃথিবীর সারা মোটামুটি একই সময়ে উদ্ভূত এই আন্তর্জাতিক জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন বিভিন্ন জাতীয় শক্তি রূপে সৃষ্ট হয়ে উঠেছে, এইসব জাতীয় শক্তির বিকাশের মাত্রা বিভিন্ন। এই পরিণতির কারণ হল — এই আন্দোলনে

জড়িত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক আর আর্থনীতিক বৈশিষ্ট্য এবং পৃথক পৃথক দেশে এই আন্দোলনের প্রকৃতি, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণীগত বিন্যাস এবং নেতৃত্বের দক্ষতা।

সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে একই অভিন্ন সংগ্রামের মধ্যে প্রায় সমস্ত শ্রেণী আর সামাজিক স্তর মিলেমিশে গিয়ে বিভিন্ন বিস্তৃত রাজনীতিক পরিমেল গড়ে উঠেছে, এইভাবে সেটা যথার্থই গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ হয়েছে কিছুটা অনিশ্চিত, আর জাতীয় বিপ্লবের আশু আর দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যসাধনের দিক দিয়ে সেটা হয়েছে কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ; বহুলাংশে এর কারণ হল একটা বাস্তব উপাদান: এই আন্দোলনে জড়িত রয়েছে লোকসংখ্যার বিভিন্ন স্তর আর অংশ, তাদের সামাজিক অবস্থান বিভিন্ন, তারা নিয়ে আসে চলতি সমস্যাবলি সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা আর বিচার-বিবেচনা, সেগুলো প্রায়ই কিছুটা অস্পষ্ট, তারা আরও নিয়ে আসে নিজ নিজ জাতীয়তাবাদী আর ধর্মীয় বদ্ধধারণা, ত্রুটিবিচ্যুতি, ভুলভ্রান্তি।

২। আজকের জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের ফলে দেখা দিয়েছে কতকগুলি নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটা জগৎ, এইসব রাষ্ট্র বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসে নি, কিন্তু তাদের বেশির ভাগ আর সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয়। এশিয়া আর আফ্রিকার অনেক স্বাধীন রাষ্ট্র সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মনীতি অনুসরণ করছে এবং মানবজাতির পক্ষে প্রত্যক্ষ সংস্রবযুক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে। আক্রমণ আর যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতির বিরোধিতায় তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে যোগ দেয় এবং জাতিতে-জাতিতে শান্তি আর মৈত্রী দৃঢ়তর করতে সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির প্রভাব বাড়ছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটছে বলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সন্ত্রস্ত। উন্নয়নশীল দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতিতে গণতান্ত্রিক ধারাগুলোকে তারা রোধ করতে চায়, তারা চায় এই দেশগুলি আজ্ঞানুবর্তী হয়ে তাদের আক্রমণাত্মক কর্মনীতির পিছন পিছন চলুক। *Foreign Policy in the Sixties* বইয়ে তার একজন লেখক কথা তুলেছেন যে, গোষ্ঠীনিরপেক্ষ কর্মনীতি নাকি আর পরিবর্তিত

পারিস্থিতিক পরিস্থিতির অনুযায়ী নয় -- ভারতের নাকি এই কর্মনীতি বদলে এশিয়ায় পশ্চিমী সামরিক প্রস্তুতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা উচিত।*

বুর্জোয়া মতাদর্শবিদেরা নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির নেতাদের বুঝাতে চেষ্টা করছে যে, সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ কর্মনীতির পক্ষের একটা হেতু থাকলেও থাকতে পারত, কিন্তু এখন সেটা 'বহুলাংশে অলীক হয়ে পড়ছে'।** তারা আশা করে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলি অবশেষে সাম্রাজ্যবাদ আর কমিউনিজমবিরোধিতার আন্তর্জাতিক মূল কৌশলের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত অবস্থান হয়ে উঠবে।*** এতে তারা ভরসা করে যে, তৃতীয় দুনিয়ার মধ্যে ভেদ-বিভেদ ঘটবে, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে জাতীয় স্বার্থের সংঘাত লাগবে, এই দেশগুলি শেষপর্যন্ত বিভিন্ন জোটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, সেটা হবে ঐ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ব্যবস্থা অবলম্বনের চমৎকার সুযোগ।**** সাম্রাজ্যবাদীরা বেশ ভালভাবেই জানে যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং নতুন রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রনীতিতে ক্রমবর্ধমান প্রগতিশীল ধারা তাদের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধিগুলো কার্যে পরিণত করার পথে অন্তরায় হবে।

৩। জাতীয় রাষ্ট্রগুলি দেখা দেবার ফলে বাদবাকি ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক জাতিগুলির মুক্তি ত্বরান্বিত হয়। জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন একটা নতুন পর্বে ঢুকেছে, এখন থেকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হবে সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্যাবলির উপর, তারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

যেসব দেশ মুক্তি অর্জন করেছে কিংবা করছে তাদের রাজনীতিক স্বাধীনতার সম্প্রসারণ এবং দৃঢ় করা, তাদের আর্থনীতিক অনগ্রসরতা

---

* *Foreign Policy in the Sixties: the Issues and the Instruments* ed. by Roger Hilsman and Robert C. Good, The John Hopkins Press, Baltimore, 1965, p. 55.

** *Non-alignment*, ed. by I. W. Burton, London, 1966, p. 131.

*** *Ibid.*, p. 135.

**** অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জন ডোনাল্ড মিলার বিশেষত এই মর্মে দৃঢ়োক্তি করেন যে, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ঐক্যকামনার মূলে রয়েছে জঙ্গী উপনিবেশবাদবিরোধিতা, সেটা এখন বিচলিত হতে আরম্ভ করেছে, 'মনে হয় এটা সম্ভাব্য যে, আপনা-আপনি আফ্রো-এশীয়বাদের তেমন কোন ভবিষ্যৎ নেই।' I. D. B. Miller, *The Politics of the Third World*, London, 1966, p. 38.

দূর করার জন্যে অবশ্যপ্রয়োজনীয়, তেমনি, এই অনগ্রসরতা দূর করাটা প্রকৃত স্বাধীনতার জন্যে অপরিহার্য. এর সঙ্গে সঙ্গে, অধিকতর রাজনীতিক স্বাধীনতা হল বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কারের গুরুত্ব এবং পরিধির একটা ফল। জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের চলতি পর্বে সামাজিক-আর্থনীতিক উপাদানটা চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন, ঠিক যেমন দুই বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরোভূমিতে রয়েছে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতা। এই কারণেই সেইসব চীনা তত্ত্ববিৎ ভ্রান্ত যাঁরা বলেন — একদিকে, জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্যে এবং সামাজিক সমস্যাবলির সমাধানের জন্যে নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির প্রচেষ্টা, এবং, অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনীতিক সংগ্রাম, এই দুইয়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে; তাঁরা যে আরও বলেন যে, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের অর্থ হল জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্যগুলিকে 'বর্জন করা', এ কথাও ভুল।* এর উল্টোটাই সত্যের বেশি কাছাকাছি: সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্যাবলির সমাধানকে তুচ্ছ করার অর্থ হল সদ্য-অর্জিত স্বাধীনতাকে দুর্বল করা এবং জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের উপর সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগুলির আঘাত হানা আরও সহজ করে দেওয়া।

বুর্জোয়া মতাদর্শবিদদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন যে, তারা 'বলছে **জাতীয়** মুক্তির কথা... **আর্থনীতিক** মুক্তির কথাটা বাদ দিয়ে। অথচ, বাস্তবে, ঐ পরেরটাই প্রধান

---

* 'জেন-মিন জি-পাও' পত্রিকায় প্রকাশিত একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে, নতুন পর্বে মুক্ত দেশগুলির 'সর্বাগ্রে করণীয় কাজ রয়েছে পুরন আর নতুন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এবং তাদের দুষ্কর্মে সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রচণ্ডভাবে চালিয়ে যাওয়া। এই সংগ্রাম আগেরই মতো হিংস্র, আর রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত এবং অন্যান্য ক্ষেত্র জুড়ে এই সংগ্রাম চালানো হয় প্রধানত রাজনীতিক্ষেত্রে, তবে, সাম্রাজ্যবাদ যখন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সশস্ত্র দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে তখন সংগ্রাম অবশ্যই প্রায়ই পরিচালিত হয় সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে' ('জেন-মিন জি-পাও', ২২ অক্টোবর, ১৯৬৪)। সম্পূর্ণতই জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিষয়ে লেখা এই প্রবন্ধটায় এই আন্দোলনের বর্তমান পর্বটাকে বিশ্লেষণ করার এবং জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলিতে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলির নিশানদিহি করার কোন চেষ্টাও করা হয় নি। এখন যদি শুধু উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন 'বিকশিত হচ্ছে অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে', কিংবা 'এই আন্দোলন সর্বত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আর তাদের

জিনিস।'* আজ নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হাতে আর্থনীতিক শোষণের অবসান ঘটাবার সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে — আজ লেনিনের ঐ কথাটা বিশেষভাবে সময়োচিত। আসল কথাটা হল এই যে, এই সদ্য-মুক্ত দেশগুলিতে শ্রম-উৎপাদনক্ষমতা কম, এই দেশগুলি বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় অনিবার্যভাবেই শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হাতে অর্থনীতিগতভাবে লুণ্ঠিত হবে। এই পরিস্থিতিতে রাজনীতিক স্বাধীনতা আর্থনীতিক স্বাধীনতা নয়, রাজনীতিক স্বাধীনতা আপনা থেকেই শিল্পে অধিকতর অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উপর আর্থনীতিক নির্ভরশীলতার অবসান ঘটায় না। এ বিষয়ে প্রত্যয়জনক সাক্ষ্য পাওয়া যায় লাতিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে: এই দেশগুলি রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছিল দেড় শ' বছর আগে, কিন্তু অর্থনীতিগতভাবে তারা এখনও বহুলাংশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপর, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল।

কাজেই, আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম চলা চাই বিভিন্ন গভীর সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কারের জন্যে সংগ্রামের সঙ্গে একত্রে, এইসব সংস্কার সমাজতান্ত্রিক গঠনের দিকে ক্রমে অগ্রসর হবার জমিন তৈরি করবে; সমাজতান্ত্রিক গঠনই নিপীড়িত জাতিগুলির প্রকৃত স্বাধীনতায় পৌঁছবার একমাত্র পথ।

৪। আমাদের একালে জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলি আরও বেশি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে চলছে। এক সময়ে এগুলি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না, সে বিপ্লবে কেবল পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথ খুলে যেত, যেমন ইরান আর তুরস্কের ক্ষেত্রে। কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী-শক্তিগুলির মধ্যে পরিবর্তিত সম্পর্কের ফলে জাতীয়-মুক্তির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবগুলির অপেক্ষাকৃত দ্রুত পুঁজিতন্ত্রবিরোধী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হওয়া সম্ভব।

১৯২০ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে জাতি এবং উপনিবেশ সংক্রান্ত থিসিস সম্পাদনা করার সময়ে 'বুর্জোয়া-

---

প্রতিযোগীদের অবস্থানগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছে', তাহলে বিবরণটাকে পরিমাণগত শুধু গণ্ডিবদ্ধ করা হয়, আর জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে যেসব গুণগত পরিবর্তন ঘটছে সেগুলিকে উপেক্ষা করা হয়।

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 18, p. 398.

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের' বদলে 'বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলন' লেখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এটা মোটেই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল না: ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন দেশগুলিতে সংস্কারবাদী আর বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য ততদিনে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলে এই পরিবর্তন আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। লেনিন লিখেছিলেন: 'আমি যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছি সেটা সমস্ত থিসিসে করা হয়েছে, আমার মনে হয় তার ফলে আমাদের মত এখন অনেক বেশি যথাযথভাবে সূত্রবদ্ধ হয়েছে।'*

জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব — এই দু'রকমের বিপ্লব আমাদের একালে পরস্পরের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব প্রায়ই একেবারে শুরু থেকেই পরিচালিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ আর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই কেবল নয়, কিছু পরিমাণে পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধেও, অর্থাৎ কিনা, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যার বিরুদ্ধে লড়তে যায় মূলত সেই একই শত্রুর বিরুদ্ধে। তাই ব'লে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বর্তমান পর্ব আর তার প্রধানত সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক লক্ষ্যগুলিকে সমাজতান্ত্রিক পর্বের সঙ্গে এক করে দেখার কারণ নেই, তেমনি, কাজে কাজেই, সমাজের বিকাশের ধারাটাকে কৃত্রিমভাবে জোর করে এগিয়ে নেবারও কারণ নেই। বাস্তবে যা অকালীয় এমন কোন কাজ হাতে নেবার বিরুদ্ধে এবং ঘটনা পরম্পরার কোন কোন অপরিহার্য অন্তর্বর্তী যোগসূত্রে উপেক্ষা করার প্রলোভনের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকবার জন্যে যেকোন নির্দিষ্ট দেশে জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের বিকাশের চলতি মাত্রা আর পর্বের বিষয়টা সযত্নে বিবেচনা করা দরকার।

অন্যদিকে, জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবও এমন কাজ হাতে নিতে পারে — এবং কখনও কখনও তা নিষ্পন্নও করতে পারে — যে কাজ সাধারণত নিষ্পন্ন হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, এই সন্দেহাতীত সত্যটাকেও অগ্রাহ্য করা চলে না। আজকাল জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য আগের চেয়ে অনেকটা বেশি মিশে যাবার ধারা দেখা যাচ্ছে — কেননা, গোড়ায় জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যসাধনের জন্যে পরিচালিত মুক্তি আন্দোলন শেষপর্যন্ত

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 31, p. 242.

যুক্তিসম্মতভাবেই পরিচালিত হতে থাকে পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সে পুঁজিতন্ত্র একটা সমাজব্যবস্থা হিসেবে ঔপনিবেশিক উৎপীড়নের উদ্ভব ঘটায়।

৫। সমসাময়িক জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলি বহু রকমের উপায় আর কর্মকৌশল প্রয়োগ করে।

কোন দেশের মধ্যে মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতি এবং জাতীয় বিপ্লব যে পর্বে পেঁ'ছেছে তদনুসারে প্রত্যেকটি জাতি সংগ্রামের বিশেষ রূপটা বেছে নেয়। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য অনুসারে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সমেত সমস্ত উপায়ই প্রয়োগ করা হয়।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বরাবরই জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধগুলির প্রগতিশীল বৈপ্লবিক তাৎপর্য মেনে আসছেন এবং এই মুক্তি-যুদ্ধে সক্রিয় সমর্থন দিয়ে আসছেন।

এমনকি সশস্ত্র বিদ্রোহই হোক, কিংবা অন্য কিছু — কোন এক রূপের সংগ্রাম বেশি পছন্দ করার ব্যাপার এটা নয়। এটা হল কোন নির্দিষ্ট দেশে পরিস্থিতি সম্বন্ধে, বিভিন্ন রাজনীতিক শক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং রাজনীতিক উপযোগিতা সম্বন্ধে সর্বতোমুখী বিচার-বিবেচনা করবারই ব্যাপার। মুক্তির জন্যে লড়াই যেকোন রূপ ধারণ করুক না কেন, শেষপর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণের উপরই তার সাফল্য নির্ভর করে। সংগ্রামের যে রূপ বেছে নেওয়া হয় সেটার উপযোগিতা মেহনতী জনগণের পরীক্ষা করতে হয় নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে. -- সশস্ত্র বিদ্রোহে যদি মেহনতী জনগণের পূর্ণ সমর্থন নিশ্চিত না থাকে তাহলে তেমন বিদ্রোহের দরুন সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট সশস্ত্র সৈন্যদল আর জনগণের মধ্যে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। জিনিসটাকে ঐভাবে দেখা হলে সেটা হবে ষড়যন্ত্রের আর পেটি বুর্জোয়া জুয়াড়ী চালের মনোভাব।

কৃত্রিম উপায়ে বিপ্লব ঘটাবার যে ধারণাটাকে অতি-বামপন্থী সুবিধাবাদীরা জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের উপর চাপিয়ে দিতে চায় তার কোন মিল নেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে। ঐ ধারণা অনুসারে, 'প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লব উভয় ক্ষেত্রেই দৃঢ়সংকল্প বৈপ্লবিক সশস্ত্র সংগ্রাম প্রথম শ্রেণীর তাৎপর্যসম্পন্ন'।* সংগ্রামের

---

* 'জেন-মিন জি-পাও', ১১ই নভেম্বর, ১৯৬৫।

বিবিধ রূপ সংক্রান্ত নীতির প্রতি আন্তরিকতাশূন্য আনুগত্য দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাবাদীরা, প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামকেই একমাত্র উপায় হিসেবে তুলে ধরে এবং পরিস্থিতি-স্থান-কাল নির্বিশেষে সব ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সেটাকে চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সরকারী নথিপত্র অনুসারে, 'ক্ষমতা, স্বাধীনতা, মুক্তি আর সমানতা অর্জন করা যেতে পারে শুধু অস্ত্র-বলে, আর তা বজায় রাখা যায়ও অস্ত্র-বলে। এই হল শ্রেণী-সংগ্রামের সাধারণ নিয়ম।'*

সশস্ত্র সংগ্রামের পরম অগ্রাধিকার সংক্রান্ত মার্কসবাদবিরোধী থিসিসের সমর্থনে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নথিপত্র থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরতে অতি-বামপন্থী সুবিধাবাদীরা বড় ভালবাসে। এটা করতে গিয়ে, আন্তর্জাতিকের যেসব উপস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিস্থিতি চরমে উঠলে বলিষ্ঠ আর দৃঢ়সংকল্প কার্যকরণের প্রয়োজনের কথা আছে সেগুলিকে খেয়াল-খুশিমতো তুলে ধরতেই তারা অভ্যস্ত, কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন মতের কোন উল্লেখ করা থেকে তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই বিরত থাকে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচিতে নিম্নলিখিত বক্তব্যটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল: 'নতুন নতুন এবং অধিকতর চূড়ান্ত ধরনের স্লোগান তুলবার সময়ে পার্টিগুলিকে লেনিনবাদের রাজনীতিক কর্মকৌশলের সেই মৌলিক নিয়ম অনুসারে চলতে হবে, সে নিয়মে আছে যে, জনগণ যাতে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে পার্টির কর্মধারার নির্ভুলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয় সেইভাবে তাদের বৈপ্লবিক অবস্থানে পরিচালিত করার সামর্থ্য থাকা চাই। এই নিয়ম প্রতিপালনে অপারগ হলে তার ফলে অনিবার্যভাবেই ঘটবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা, ষড়যন্ত্রের পথ ধরা, কমিউনিজম থেকে 'বামপন্থী' মতান্ধতায় মতাদর্শগত অধঃপতন এবং পেটি বুর্জোয়া 'বৈপ্লবিক' হঠকারিতা।'**

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিবরণ খুললে দেখা যাবে, বহু প্রাক্তন উপনিবেশ সশস্ত্র সংগ্রামের উপায় অবলম্বন না করেই স্বাধীনতা অর্জন

* 'জেন-মিন জি-পাও', ২৪শে জুন, ১৯৬৪।

** "The Programme of the Communist International", *International Press Correspondence*, Special Number, Vienna, Dec. 31, 1928, Vol. 8, No. 92, p. 1767.

করেছে। জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বর্তমান পর্বে এশিয়া আর আফ্রিকার সর্বত্র নতুন নতুন জাতীয় রাষ্ট্র দেখা দিচ্ছে, তার মধ্যে অনেক রাষ্ট্র প্রগতিশীল সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কারের পথ ধরছে, এই সময়ে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বানটাকে বিষয়গতভাবে দেখলে তার লক্ষ্য হবে — হয়, অগ্রসর দেশগুলির রাজ সমেত বিভিন্ন বিদ্যমান রাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করা, নইলে, বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াটাকে 'ত্বরান্বিত করার' জন্যে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি এবং তাদের প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মধ্যে প্ররোচনা দিয়ে সশস্ত্র সংঘাত বাধানো। এই রকমের 'বৈপ্লবিক' চালচলনের একমাত্র ফল হতে পারে এইসব দেশে গড়ে উঠছে যেসব সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট সেগুলির মধ্যে ভেদ-বিভেদ, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের গুরুতর ক্ষতি এবং এই আন্দোলনের পরবর্তী বিকাশে বাধা।

এই হল জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের কয়েকটা নতুন উপাদান — এগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, আমাদের একালের পৃথিবীতে এই আন্দোলনের ভূমিকা আর তাৎপর্য কী বিরাট পরিমাণে বেড়ে গেছে।

৩। বিশ্ব বিপ্লবের অঙ্গ-উপাদান

আমাদের একালে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন নাকি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকায় এসে গেছে, তার একটা তত্ত্বগত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টায় হাতসাফাইয়ের জোরে ইদানীং হরেক রকমের ধারণা দাঁড় করানো হয়েছে — তাই, পৃথিবীজোড়া বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াটার মধ্যে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিষয়গত ভূমিকা আর কাজটা ঠিক কী সেটা নির্ধারণ করা এখন খুবই উপযোগী হবে। এইসব নতুন ঢঙের ধারণার রচয়িতা হল নয়া-ত্রৎস্কিপন্থীদের থেকে একেবারে অতি-বামপন্থী সুবিধাবাদীরা অবধি — তারা সংগ্রামরত জাতিগুলির জাতীয়তাবাদী মনোভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে ইচ্ছাকৃতভাবেই জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের ভূমিকা আর তাৎপর্যটাকে বাড়িয়ে দেখাচ্ছে এবং আমাদের একালের অন্যান্য বৈপ্লবিক শক্তিগুলি থেকে এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা করছে।

ত্রৎস্কিপন্থীদের তথাকথিত চতুর্থ আন্তর্জাতিকের সরকারী নথিপত্রে

এই দৃষ্টিভঙ্গিটাকে বেশ সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়েছে। নিম্নলিখিত অংশটা নেওয়া হয়েছে তাদের একটা প্রস্তাব থেকে:

'পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধোত্তর বৈপ্লবিক জোয়ার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধোত্তর ধর্মঘটের পর থেকে শ্রমিক আন্দোলনে এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে এই আন্দোলনের সামনে বিষয়গত পরিস্থিতিক্ষেত্রে বড় বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। মার্কসবাদী এবং অমার্কসবাদী দু'রকমেরই অর্থনীতিবিদদের প্রত্যাশিত সম্ভাবনার উল্টোটা ঘটেছে: জাপান সমেত অগ্রসর শিল্পোন্নত দেশগুলির পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির যে সম্প্রসারণ ঘটেছে এমনটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, অর্থাৎ, প্রায় অর্ধ-শতকের মধ্যে হয় নি। বিকল্প বৈপ্লবিক নেতৃত্ব না থাকায়, এই রকমের আর্থনীতিক ক্রমবৃদ্ধি এবং পশ্চিম ইউরোপে প্রচলিত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতক সুবিধাবাদী কর্মনীতি আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে ইউরোপে পুঁজিতন্ত্রের সাময়িক আপেক্ষিক সুস্থিতি সম্ভব হয়েছে। তার ফলে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র আপাতত সরে গেছে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে।'*

একই ধারণা অনুরূপভাবেই প্রকাশিত হয়েছে চীনের সরকারী নথিপত্রে। 'জেন-মিন জি-পাও' এবং 'হং কি'তে প্রকাশিত একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে: 'এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় বিভিন্ন বিস্তৃত অঞ্চলই সমসাময়িক পৃথিবীর বিভিন্ন দ্বন্দ্বের রশ্মিকেন্দ্র, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের সবচেয়ে ক্ষীণ যোগসূত্র, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাটাকে এখন টলাচ্ছে যেসব বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝা সেগুলির প্রধান অঞ্চল... কাজেই, এক অর্থে, সমগ্রভাবে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবের লক্ষ্য শেষপর্যন্ত নির্ভর করছে এইসব অঞ্চলের অধিবাসী জাতিগুলির বৈপ্লবিক সংগ্রামের উপর, এরা হল পৃথিবীর লোকসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।'**

এই যুক্তি থেকে আসছে সেই কল্পনা যাতে বলা হয় যে, 'বিশ্ব গ্রামাঞ্চল', অর্থাৎ জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন 'বিশ্ব শহরাঞ্চলকে', অর্থাৎ পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়াকে পরিবেষ্টিত করে বিনষ্ট করছে। তথাকথিত 'জনযুদ্ধ তত্ত্বের' অন্যতম সক্রিয় প্রবক্তা লিন পিআও লিখেছেন: 'গোটা ভূগোলকটাকে

---

* *Fourth International*, Special Number, October-December 1963, No. 17, Colombo, Ceylon, p. 16.

** 'জেন-মিন জি-পাও', ২২ অক্টোবর, ১৯৬৩।

ধরে দেখলে, উত্তর আমেরিকা আর পশ্চিম ইউরোপকে যদি বলা যায় 'পৃথিবীর শহর', তাহলে এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকাকে নিয়ে হয়েছে 'পৃথিবীর গ্রামাঞ্চল'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উত্তর আমেরিকা আর পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রলেতারীয় বৈপ্লবিক আন্দোলন নানা কারণে সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আছে, আর এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রবল বৃদ্ধি ঘটছে। এক অর্থে, সমসাময়িক বিশ্ব বিপ্লবেও গ্রামাঞ্চলগুলিকে দিয়ে শহরগুলি পরিবেষ্টিত হবার চিত্র ফুটে উঠছে।'*

নয়া-ত্রৎস্কিপন্থীদের আর চীনের অতি-বামপন্থী সুবিধাবাদীদের মতাভিন্নতার একটা স্পষ্ট দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া গেল। ১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে নয়া-ত্রৎস্কিপন্থীরা বলেছিল, ঔপনিবেশিক বিপ্লব হল বিশ্ব বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী, ঔপনিবেশিক বিপ্লব অন্যান্য কাজ ছাড়াও অগ্রসর দেশগুলিকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবার প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করছে, তারা বলেছিল, বিষয়গতভাবে ঔপনিবেশিক বিপ্লবই বিশ্ব বিপ্লবের চালিকাশক্তি। আর ১৯৬৩ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বলেছিল, 'এখন যে প্রধান শক্তি যথার্থই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে সেটা হল এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব।'**

নয়া-ত্রৎস্কিপন্থীরা আর অতি-বামপন্থী সুবিধাবাদীরা এই মত পোষণ করছে যে, বিশ্ব বিপ্লবের রশ্মিকেন্দ্র জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে। এ বক্তব্যের মধ্যে নতুন কিছু নেই। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়েই এই মত প্রকাশিত হয়েছিল যে, পশ্চিমের পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার দখলে যদি অমন বিপুল বিস্তৃত ঔপনিবেশিক রাজ্য না থাকত, তাহলে ঐ ব্যবস্থাটা নিজের ভারেই ভেঙে পড়ত অনেক আগেই, ঐসব ঔপনিবেশিক রাজ্য তাদের চাই পণ্যের বাজার আর কাঁচামালের যোগানদার হিসেবে। এই মত অনুসারে আরও বলা হত যে, নিজ দৃঢ় দুর্গে নয় — সাম্রাজ্যবাদ পরাস্ত হবে তার উপনিবেশগুলিতে, যে উপনিবেশগুলি হল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে ভেদ্য অংশ, তার সবচেয়ে দুর্বল স্থল।

---

* 'পিকিং রিভিউ', ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫, পৃঃ ২৫।

** 'জেন-মিন জি-পাও', ২২ অক্টোবর, ১৯৬৩।

এই মতের ব্যাখ্যাতারা বিশ্ব বিপ্লবে জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের ভূমিকাটাকেও বাড়িয়ে দেখাত, তবু তারা ধরে নিত যে, নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয় মুক্তির জন্যে সংগ্রামে নেতৃত্ব করবে শ্রমিক শ্রেণী আর তার পার্টি, আর জাতীয় বুর্জোয়ারা হবে বহির্ভূত কিংবা অসাড়। কিন্তু, আমাদের একালে যারা তথাকথিত 'তিন-মহাদেশীয়' তত্ত্বের ওকালতি করছে তারা মনে করে অ-প্রলেতারীয়দের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন হল বিশ্ব বিপ্লবের প্রধান শক্তি। এখানেই মার্কসবাদীদের সঙ্গে এ বিষয়ে তাদের পার্থক্য, মার্কসবাদীরা সব সময়েই বিশ্ব বিপ্লবের রশ্মিকেন্দ্রের স্থানান্তরিত হওয়াটাকে প্রলেতারিয়েতের পরিচালিত সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখে আসছেন, তাতে কোন ব্যতিক্রম নেই।

তবে, ঐ দুটো মতের মধ্যে একটা অভিন্ন উপাদানও আছে। আপনা থেকে সাম্রাজ্যবাদের পতন সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা হল ঐ দুটো মতেরই বনিয়াদ, ঐ পতন নাকি ঘটতে পারে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে জনগণের সংগ্রাম ছাড়াই, বিশেষত ঐসব দেশে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম ছাড়াই — স্বাধীনভাবে, ঔপনিবেশিক পশ্চাৎপ্রদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন দিয়েই।

বিশ্ব মুক্তি আন্দোলনের বিবরণীতে দেখা যায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্ব বিপ্লবের রশ্মিকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়েছে সাধারণ পরিস্থিতির বিভিন্ন পরিবর্তন অনুসারে। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে' মার্কস এবং এঙ্গেল্‌স্ লিখেছিলেন: 'কমিউনিস্টরা মনোযোগ দেয় প্রধানত জার্মানির দিকে, তার কারণ এই দেশটি বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রাক্কালে পেঁছেছে, এই বিপ্লব অবশ্যই নিষ্পন্ন হবে ইউরোপীয় সভ্যতার অধিকতর অগ্রসর অবস্থার মধ্যে, আর তাতে প্রলেতারিয়েত হবে সতর শতকের বৃটেন কিংবা আঠার শতকের ফ্রান্সের প্রলেতারিয়েতের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। কাজেই জার্মানিতে বুর্জোয়া বিপ্লব হবে অবিলম্বে আগত প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রস্তাবনা।'*

কিন্তু পরে, প্যারিস কমিউনের পতনের পরে পৃথিবীজোড়া মুক্তি আন্দোলনের রশ্মিকেন্দ্র ক্রমে রাশিয়ায় স্থানান্তরিত হতে থাকল, রাশিয়ায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের জোয়ার আরম্ভ হচ্ছিল। ১৮৮২ সালে এঙ্গেলস লিখেছিলেন: 'সবে জেগে উঠতে আরম্ভ করেছিল যে প্রলেতারিয়েত তাদের

---

* Marx and Engels, *Selected Works*, Vol. I. Moscow, 1962, p. 65.

হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময়ে শুধু ইউরোপীয় নৃপতিরা নয়, ইউরোপীয় বুর্জোয়ারাও রুশী হস্তক্ষেপকে দেখেছিল একমাত্র উপায় হিসেবে। ইউরোপে প্রধান প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে উদ্ঘোষিত হয়েছিল জার। আজ তিনি বিপ্লবের যুদ্ধবন্দী—গাৎচিনায়, আর রাশিয়া হয়েছে ইউরোপে বৈপ্লবিক কার্যকরণের সর্বাগ্রভাগ।'*

এঙ্গেলসের চিন্তাধারাটিকে আরও বিকশিত করে লেনিন ১৯০২ সালে 'কী করিতে হইবে?' বইখানিতে রাশিয়ায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের সম্ভাব্য ভাবী চিত্রের বর্ণনা দিয়েছিলেন এইভাবে: 'ইতিহাস এখন আমাদের একটা আশু করণীয় কাজের মুখোমুখি এনে দিয়েছে; যেকোন দেশে প্রলেতারিয়েত যত আশু করণীয় কাজের মুখোমুখি হয়েছে তার মধ্যে **সবচেয়ে বৈপ্লবিক** হল এই করণীয় কাজটি। এই করণীয় কাজ — কেবল ইউরোপীয় নয়, (এখন বলা যেতে পারে) এশীয় প্রতিক্রিয়াশীলতারও সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দুর্গটাকে ধ্বংস করার কাজ — নিষ্পন্ন হলে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত হবে আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতের সর্বাগ্রভাগ।'**

পরে, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে লেনিন ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন, কেন বৈপ্লবিক প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকে নেতৃত্ব গেল রুশীদের হাতে, ঠিক যেমন উনিশ শতকের বিভিন্ন কালপর্যায়ে সেটা গিয়েছিল ইংরেজদের থেকে ফরাসীদের এবং জার্মানদের হাতে। অন্যান্য কথার মধ্যে লেনিন লিখেছিলেন: 'যে দেশে — যেভাবে এঙ্গেলস কথাটা বলেছিলেন — বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া অভিজাত মহলের পাশাপাশি তৈরি করেছে প্রলেতারিয়েতের খুবই বুর্জোয়া একটা উপর-স্তর, তার আদর্শ নমুনা ছিল বৃটেন। কয়েক দশক যাবত এই অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশটি প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক আন্দোলনে পিছিয়ে পড়ে ছিল। ফ্রান্স যেন প্রলেতারিয়েতের শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ১৮৪৮ আর ১৮৭১ সালের শ্রমিক শ্রেণীর দুটো বীরত্বপূর্ণ বিদ্রোহে, যে দুটো বিদ্রোহের খুবই বিস্তর অবদান হয়েছিল বিশ্ব-ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের আন্তর্জাতিকে নেতৃত্ব তখন গেল জার্মানির হাতে;

---

* Marx and Engels, *Selected Works,* Vol. I, Moscow, 1962, p. 23.
** V. I. Lenin, *Collected Works,* Vol. 5, p. 373.

সেটা হল ঊনিশ শতকের অষ্টম দশকে, যখন জার্মানি অর্থনীতিগতভাবে ব্রিটেন আর ফ্রান্সের পিছনে পড়ে ছিল। কিন্তু জার্মানি যখন ঐ দুই দেশকে অর্থনীতিগতভাবে পিছনে ফেলে গেল, অর্থাৎ, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাত, তখন জার্মানির মার্কসবাদী শ্রমিক পার্টির শীর্ষে — সারা পৃথিবীর পক্ষে আদর্শ এই পার্টির শীর্ষে — দেখা গেল একদল ডাহা পাজি-বদমাশকে...'*

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের রচনা থেকে আগেকার উদ্ধৃতিগুলি দেখলে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, তাঁদের মতে, বিশ্ব বিপ্লবের রশ্মিকেন্দ্রের স্থানান্তরিত হওয়াটা প্রলেতারিয়েতের চালানো সংগ্রামের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কোন একটা দেশে জয়যুক্ত হওয়া অবধি পুঁজিতান্ত্রিক দ্বন্দ্বগুলির প্রধান কেন্দ্রবিন্দু এবং জনগণের মুক্তি-আন্দোলনের রশ্মিবিন্দু সমস্থানিক হয়, এটা সম্ভাবনীয়। এক কিংবা একাধিক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের পরে, যে বিশেষ সমাজতান্ত্রিক দেশটি সামাজিক আর আর্থনীতিক দিক দিয়ে বেশি অগ্রসর এবং রাজনীতিক, আর্থনীতিক আর সামাজিক ক্ষেত্রে সাধনগুলির কারণে সারা পৃথিবীতে সামাজিক প্রগতিক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে সেই দেশেই স্থানান্তরিত হয় পৃথিবীজোড়া মুক্তি-আন্দোলনের কেন্দ্রটা, এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। এটা খুবই বোধগম্যও বটে — কেননা, যেসব দেশে সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হয়েছে সেই দেশগুলি তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে, তাদের আর্থনীতিক কর্মনীতি দিয়ে এবং পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতায় তাদের বাস্তব সাধনগুলি দিয়েই বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার উপর তাদের প্রধান প্রভাব খাটায়।

একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হবার সম্ভাব্যতা সংক্রান্ত তত্ত্বটিকে (যা সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে চমৎকারভাবে বাস্তবায়িত হল) প্রত্যয়জনকভাবে উপস্থাপিত করে লেনিন এই সম্ভাবনা দেখেছিলেন যে, রাশিয়ায় জয়যুক্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পুঁজিতান্ত্রিক পশ্চিমে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়যুক্ত সমারোহের সূচনা করবে। এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকাকে দেখা হত, প্রধানত, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংরক্ষিত শক্তি হিসেবে। কিন্তু বাস্তব ঘটনে দেখা গেল, অগ্রসর পুঁজি-

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 29, p. 309.

তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে এবং অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলিতেও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের কারণে তার সম্প্রসারণ ঘটল।

এই পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সামনে যেমন তত্ত্বগত তেমনি ব্যবহারিক সমস্যাবলি এসে গেল। শুধু তাই নয়: এর অর্থ হল — যে সমাজতান্ত্রিক দেশ (কিংবা দেশগুলি) কমিউনিজমের বনিয়াদ গড়ার কাজে অন্যান্য দেশ থেকে অনেক এগিয়ে যাবে, সম্ভবত সেখানেই বিশ্ব বিপ্লবের রশ্মিকেন্দ্রটি থাকবে বেশ কিছু কাল যাবত। এই রশ্মিকেন্দ্র হঠাৎ স্থানান্তরিত হবে এমনটা সম্ভাবিত নয় — কেননা, কমিউনিস্ট সম্পর্ক দৃঢ়মূল হবে একমাত্র যখন অত্যাবশ্যকীয় বৈষয়িক-টেকনিকাল ভিত্তি তৈরি হয়ে যাবে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যাক্ষেত্রে বিভিন্ন অসাধারণ সাফল্য অর্জিত হবে, যখন সাংস্কৃতিক মাত্রা আর বৈষয়িক দ্রব্যসামগ্রীর দিক দিয়ে জীবন আরও বেশি সমৃদ্ধিশালী হবে, আর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এসবের জন্যে লাগে দশকের পর দশক।

প্রথম যে দেশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়েছে সেখানেই আজকের বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনের রশ্মিকেন্দ্র চিরকাল থাকবে না নিশ্চয়ই। বিশ্ব বিপ্লবের রশ্মিকেন্দ্র স্থানান্তরিত হবার সম্ভাবনাটাকে লেনিন সংশ্লিষ্ট করেছেন পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বল স্থলে পরবর্তী ভাঙনের সঙ্গে ততটা নয়; যেসব দেশ আর্থনীতিক উন্নয়নের ব্যাপারে রাশিয়াকে অনেকটা ছাড়িয়ে গেছে এবং, কাজেই, সামাজিক ক্ষেত্রেও রাশিয়াকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, এমনসব দেশে জয়যুক্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাব্যতার সঙ্গেই লেনিন সেটাকে সংশ্লিষ্ট করে দেখিয়েছেন।

বিশ্ব বিপ্লবের রশ্মিকেন্দ্র স্থানান্তরিত হবার কথা বলার অর্থ হল — শ্রমিক শ্রেণী এবং কমিউনিস্ট সমাজ গড়ায় ব্যাপৃত সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে সেটা ক্রমাগত বেশি মাত্রায় এসে যাচ্ছে। আমাদের একালে কোন দেশ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কেন্দ্র হবার অর্থ হল সেই দেশটি থাকে মানবজাতির সামাজিক প্রগতির সর্বাগ্রভাগে।

বিশ্ব বিপ্লবের রশ্মিকেন্দ্র জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের অঞ্চলে সরে গেছে এই মর্মের তর্কগুলোর ভিত্তি হল একটা জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ, অধিকন্তু, রশ্মিকেন্দ্রটা অনেক আগেই পিকিংয়ে সরে গেছে বলে যারা মনে করে তাদের আধিপত্যের দাবি লুকবার জন্যে ঐসব তর্ক ব্যবহৃত হয়। এইসব তর্ক তোলার উদ্দেশ্য হল বর্তমান যুগের চরিত্রবর্ণনের মার্কসীয় পদ্ধতিটাকে

খণ্ডন করা এবং আমাদের একালের মূল দ্বন্দ্বটাকে ভিন্ন রূপে দেখানো; এই মূল দ্বন্দ্ব হল সমাজতন্ত্র আর পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে, তার বদলে বলা হয় সেটা যেন নিপীড়িত জাতিগুলি আর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে; আর এই দ্বন্দ্বটাকে প্রায়ই 'ধনী' এবং 'গরিব' জাতিগুলির মধ্যে, 'ধনী উত্তর' এবং 'গরিব দক্ষিণের' মধ্যে দ্বন্দ্বের সঙ্গে এক করে দেখানো হয়। প্রকৃতপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক জাতিগোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালাচ্ছে সেটাকে এইসব ধারণায় পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়, তার তাৎপর্য খাটো করে দেখানো হয়। ঐসব ধারণা চলতি যুগের শ্রেণীগত ব্যাখ্যার পক্ষে সম্পূর্ণ বিজাতীয়। একাশিটি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির বিবৃতিতে বলা হয়েছে: 'আমাদের যুগ, যার প্রধান মর্মবস্তু হল পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবে যার সূচনা, এ যুগ হল পরস্পরবিরোধী দুই সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের যুগ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের যুগ, সাম্রাজ্যবাদের ভাঙ্গনের যুগ, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বিলোপের যুগ, আরও বেশি বেশি জাতির সমাজতান্ত্রিক পথে উত্তরণের যুগ, পৃথিবীজোড়া পরিসরে সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের বিজয় অভিযানের যুগ।'*

দুই বিপরীত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বই প্রধান দ্বন্দ্ব, যা পৃথিবীর বিকাশের প্রক্রিয়াটাকে নির্ধারণ করছে, এ সিদ্ধান্ত লেনিনের — তিনি লিখেছিলেন: 'সোভিয়েত আন্দোলনের বিরুদ্ধে, এবং পুরোভাগে সোভিয়েত রাশিয়াকে নিয়ে যে সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলি সেগুলির বিরুদ্ধে ছোট একজোট সাম্রাজ্যবাদী দেশের পরিচালিত সংগ্রাম দিয়ে জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্রভাবে বিশ্ব রাজনীতিক ব্যবস্থা নির্ধারিত হচ্ছে। সেটা যদি আমরা মনে না রাখি তাহলে আমরা একটাও জাতীয় কিংবা ঔপনিবেশিক সমস্যা নির্ভুলভাবে তুলে ধরতে পারব না — সে সমস্যা যদি পৃথিবীর অতি উপান্তবর্তী কোন অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় তবুও। সভ্য এবং পশ্চাদ্বর্তী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সমভাবেই যদি এই স্বীকার্যটাকে ধরে অগ্রসর হয় একমাত্র তবেই তারা বিভিন্ন রাজনীতিক সমস্যা নির্ভুলভাবে তুলে ধরে সেগুলির সমাধান করতে পারে।'**

---

* The Struggle for Peace, Democracy and Socialism, Moscow, 1963, p. 38.

** V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 31, p. 241.

আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর এবং জাতীয়-মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে মিশে একই অভিন্ন প্রবল বৈপ্লবিক স্রোত সৃষ্টি ক'রে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা ঐতিহাসিক বিকাশের প্রধান ধারাটাকে নির্ধারণ করছে। বর্তমান যুগের প্রধান দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে লেনিনের থিসিসটিকে চলতি ঘটনাবলির আলোকে বিকশিত ক'রে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন তার বিভিন্ন কর্মসূচিস্বরূপ দলিলে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছে যে, সমাজতন্ত্রের পৃথিবীজোড়া জয়ের জন্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংগ্রাম পৃথিবীর সামাজিক বিকাশের ভারকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক পার্টিগুলির ১৯৬০ সালের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমাদের যুগের কেন্দ্রীয় উপাদান হল আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী আর তার প্রধান সৃষ্টি — সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা।'*

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান প্রবল আর্থনীতিক, রাজনীতিক এবং সামরিক ক্ষমতার বুনিয়াদে গড়ে উঠেছে মানবসমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্বের ভূমিকা। পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকটা নতুন সমাজতান্ত্রিক জয়ের অর্থ হল প্রগতির অনুকূলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিসাম্যের আর একটা পরিবর্তন, এমন প্রত্যেকটা জয় বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিকাশের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় একটা নেতৃত্বের উপাদান, এই বাস্তব সত্যটাকে ধ'রে বিশ্ব বিপ্লবের অন্যান্য অঙ্গ-উপাদানগুলির, যেমন, নিপীড়িত জাতিগুলির লড়াইয়ের গুরুত্বকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা চলবে না। বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার এই সমস্ত উপাদানই ঘনিষ্ঠ এবং নিরবচ্ছিন্ন পারস্পরিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, একই অভিন্ন প্রবল স্রোতে মিলেমিশে এগুলি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিগুলোকে বিনষ্ট করছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সাধন যতই বেশি, আর অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকদের লড়াই যতই প্রচণ্ড, এশিয়া আর আফ্রিকার জাতিগুলির জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন বিকাশের সম্ভাবনা ততই বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আর অভিন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লক্ষ্যক্ষেত্রে তাদের অবদানও হয় ততই বেশি।

---

* The Struggle for Peace, Democracy and Socialism, Moscow, 1963, p. 44.

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিষয় উঠলে চীনের সরকারী মুখপাত্ররা একেবারে ভাবে গদগদ হয়ে পড়েন। বিশ্ব বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁদের মার্কসবাদবিরোধী ধারণাগুলো অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত (এ কথা এখন বলা যায়) হবার পর থেকে তাঁদের বচন আরও বিশেষভাবে উপচে পড়ছে। এখনও তাঁরা জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন আঁকড়ে ধরে সেটাকে অন্যান্য বৈপ্লবিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছেন।

উপরে-উল্লেখিত ধারণাগুলোকে আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের 'সপক্ষে' তাঁদের 'অতি-বৈপ্লবিক' বাগাড়ম্বর দিয়ে তাঁরা আসলে এশিয়া আর আফ্রিকায় যেসব বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে সেগুলি সম্বন্ধে নিজেদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভাবটাকে গোপন করেন। কিন্তু, নিপীড়িত জাতিগুলির সাহসী সংগ্রামের কল্যাণে ডজন ডজন রাষ্ট্র রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে তো বটে, অথচ, চীনা তত্ত্বওয়ালারা বাস্তব ঘটনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এখনও দৃঢ়োক্তি করে চলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপর প্রাক্তন ঔপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশ-গুলির নির্ভরশীলতা না কমে বরং বেড়েছে। তাঁদের ছক অনুসারে, কোন কোন মুক্তি-পাওয়া দেশে 'পুরন উপনিবেশভোগীরা নতুন উপনিবেশভোগীতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তাদের নিজেদের হাতে লালিত দালালদের মারফত ঔপনিবেশিক আধিপত্য বজায় রেখেই চলেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, পুরন উপনিবেশভোগীদের জায়গায় এসেছে আরও বেশি ক্ষমতাশালী এবং ভয়ঙ্কর মার্কিন উপনিবেশভোগীরা।'*

সমস্ত নতুন জাতীয় রাষ্ট্রকেই এইভাবে নয়া-উপনিবেশবাদের দালালের শ্রেণীতে ফেলে দেখলে যেসব দেশ সামাজিক প্রগতির পথ বেছে নিয়েছে, কিংবা যেসব দেশ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছে তারা আর কোন জায়গা পায় না। বলা যায়, এই ছকটা বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে চীনের সরকারী প্রতিনিধিদের এইসব কথা খাপ খেতে পারে -- যেমন, 'আফ্রিকা বিপ্লবের জন্যে পরিপক্ক হয়েছে', কিংবা, 'এশিয়া এবং আফ্রিকার উপর দিয়ে বয়ে যাবে একটা নতুন, আরও বিশাল, আরও শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের ঢেউ' এবং ঐ রকমের আরও সব কথা।

---

* 'জেন-মিন জি-পাও', ২৩শে অক্টোবর, ১৯৬৩।

চীনা তত্ত্ববাগীশদের 'জনযুদ্ধের' থিসিস্ এবং 'মধ্যবর্তী অঞ্চল' তত্ত্ব, এই দুইয়েরই মধ্যে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে চীনা ধারণার বৈশিষ্ট্যসূচক পল্লবগ্রাহিতা এবং স্ববিরোধিতা সাধারণত পুরোদস্তুরভাবে প্রতিফলিত হয়। এই 'জনযুদ্ধ'কে বলা হয় বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় প্রেরণা যোগাবার* সেরা, এবং, বস্তুত, একমাত্র উপায়। আর, আজকের পৃথিবী সম্বন্ধে অধ্যয়নে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যানের বনিয়াদে এসেছে 'মধ্যবর্তী অঞ্চল' সংক্রান্ত তত্ত্ব, -- একদিকে, সমাজতান্ত্রিক পরিবারের রাষ্ট্রগুলি, এবং অন্যদিকে, আক্রমণের কর্মনীতিসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি, এই দুইয়ের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য এই তত্ত্বে একেবারে মুছে দেওয়া হয়েছে।

চীন তার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী কিংবা শভিনিস্টিক স্বার্থে কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করলে সেটাকে মূলত ঐ 'মধ্যবর্তী অঞ্চল' তত্ত্ব দিয়ে ন্যায্য প্রতিপন্ন করা যায়।

যেসব ভুয়ো-বৈপ্লবিক তত্ত্ব আর ধারণার স্বরূপ খুলে ধরে সেগুলিকে ভ্রান্ত বলে বর্জন করা হয়েছিল, সেগুলিকে জীইয়ে তোলা হয়েছে এই কর্মনীতির ফলে, আর শুধু তাই নয়। এশিয়ায় আর আফ্রিকায় জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন উদ্দীপিত করতে এক সময়ে বেশ প্রভাবশালী ছিল এশিয়ার এই বৃহৎ শক্তিটি - এখন দৃঢ় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সেই শক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে বলে নিশ্চিত হয়ে নয়া-ত্রৎস্কিপন্থীরা, সমস্ত ছোপের বামপন্থী সুবিধাবাদীরা, চরমপন্থীরা, ইত্যাদি তাদের নাশকতামূলক কার্যকলাপ দ্বিগুণ করে তুলেছে। কোন কোন চীনা তত্ত্ববাগীশ মার্কসীয় কথাবার্তা দিয়ে নিজেদের স্বরূপ গোপন করার জন্যে যতই চেষ্টা করুন না কেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে নিজেদের বিচ্যুতিটাকে আড়াল করা তাঁদের পক্ষে ক্রমাগত বেশি কঠিন হয়ে পড়ছে। লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন: 'মার্কসবাদ খুবই প্রগাঢ় এবং বহুমুখী মতবাদ। কাজেই, যারা মার্কসবাদ পরিত্যাগ করে তাদের 'যুক্তি'র মধ্যে মার্কস থেকে টুকরোটাকরা উদ্ধৃতি --

---

* হাইড্রোজেন বোমার যুদ্ধ দিয়ে সংঘটিত বিশ্ব বিপ্লবের খেয়ালী ধারণাটাকে চীনা নেতারা প্রকাশ করেছিলেন ১৯৬০ সালেই — এতে সোজা বলে দেওয়া হয়েছিল যে, অবশ্যম্ভাবী নিদারুণ জীবনহানির 'খেসারত পাওয়া যাবে', 'জয়যুক্ত জনগণ অভূতপূর্ব অল্প সময়ের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তূপের উপর পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতার চেয়ে হাজারগুণে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা সৃষ্টি করতে পারবে, আর গড়বে তার নিজস্ব আশ্চর্য সুন্দর সমাজ'। ('লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক', পিকিং, ১৯৬০, পৃঃ ২৩ দ্রষ্টব্য।)

বিশেষত যখন উদ্ধৃতি দেওয়া হয় অনুপযোগী — সব সময়েই দেখা যায়, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'*

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বরাবরই জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনকে একই অভিন্ন পৃথিবীজোড়া বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটা গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান বলে গণ্য করে আসছেন, এই প্রচণ্ড শক্তিটি আঘাতের পর আঘাত হেনে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থাগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা নিজেদের কাজের জন্যে এটা ধরে নেন যে, আজকের পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক শক্তি রয়েছে তিনটে — সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এবং বিভিন্ন জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব। জাতীয় মুক্তি এবং সামাজিক প্রগতির জন্যে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে জয়ের জন্যে এই তিনটি শক্তির ঐক্য এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আর সহযোগিতায় তাদের কাজ অবশ্যপ্রয়োজনীয়। এই তিনটি শক্তির ঘনিষ্ঠ মৈত্রী স্থাপিত হলে এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতে নারাজ হলে পৃথিবীজোড়া মুক্তি আন্দোলন জয়যুক্ত হবে।

জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলি ইতোমধ্যে সাম্রাজ্যবাদের উপর কঠোর আঘাত হেনেছে। এশিয়া এবং আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রগুলি এখন পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান আরও দুর্বল হয়ে পড়বে, এবার সেটা হবে আরও গুরুতরভাবে।

তবে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তি নয় যা কেবল নিজের প্রচেষ্টায়ই সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে পারে। সিংহলের কমিউনিস্ট প্যার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত একটা প্রস্তাবে ঠিকই বলা হয়েছে যে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনগুলি 'শ্রেণীগত করণীয় কাজের চেয়ে বরং সাধারণ গণতন্ত্রসম্মত করণীয় কাজই সম্পাদন করে। জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনগুলি সাম্রাজ্যবাদের উপর প্রচণ্ড প্রচণ্ড আঘাত হানছে এবং ঔপনিবেশিক দাসত্বের ব্যবস্থাটাকে ভেঙে ফেলছে। কিন্তু, এই সবকিছু সত্ত্বেও, যে সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা থেকে সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি সেটাকে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন নিজেই পরাস্ত করতে পারে না — সেটা হল উপনিবেশভোগী দেশগুলিতে একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র। উপনিবেশগুলি চলে যাবার ফলে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আর সাম্রাজ্যবাদীরা অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে,

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 26, p. 212.

কিন্তু আপনা থেকেই তাদের পতন ঘটে না। সে কাজ করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীকে।'*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রায় সমস্ত উপনিবেশই চলে গিয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব বজায় রয়েছে — সেটা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জনগণের পক্ষে মহা ক্ষতিকর। তবু, পৃথিবীতে যে নতুন শ্রেণীগত সম্পর্ক এসেছে, যেটা, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনেরও অর্জিত সাফল্যগুলির ফল, তার সুযোগ নিয়ে একমাত্র ঐসব দেশের জনগণই মার্কিন, বৃটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাতে পারে।

এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে, শেষ পর্যন্ত জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, খাস এই আন্দোলনের ভিতরে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং আমাদের যুগের সমস্ত বৈপ্লবিক শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী স্থাপন করাই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া থেকে, বিশেষত সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী থেকে জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার যেকোন চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে লাভজনক, তাতে সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট দুর্বল হয় — সে চেষ্টা যেকোন মহল থেকে করা হোক না কেন।

---

* *Information Bulletin*, No. 3, Prague, 1963, p. 7.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের চালিকাশক্তি

এশিয়া এবং আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির লোকসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষিজীবী। সম্পত্তিগত অবস্থা অনুসারে এই কৃষিজীবীরা তিন রকমের: অপেক্ষাকৃত ধনী এবং সংখ্যায় সবচেয়ে কম কৃষিজীবী, যাদের মোটারকম জমি আর প্রয়োজনীয় খামারের সরঞ্জাম আছে; আর যাদের জমি আছে কম, এই কৃষকেরাই অধিকাংশ; আর বহু কৃষক, তারা প্রধানত যে জমিতে চাষ করে তার মালিক তারা নয়, তারা ধানী জমির মালিকদের কাছ থেকে খাজনা দিয়ে জমি পায়, জমির এই মালিকেরা সাধারণত সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী স্তর। কৃষকদের হাতে জমির পরিমাণ অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। তবে, এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে কৃষকদের মধ্যে একটা জিনিস অভিন্ন: তাদের জমির পরিমাণ কম, কৃষি-কৌশল আদিম ধরনের, কাজেই, উৎপাদন খুবই কম। শস্যের ফলন সাধারণভাবে শিল্পপ্রধান দেশগুলির চেয়ে অনেক কম।

প্রায়ই, অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক মালিকের হাতে অন্যায়ভাবে জমি পুঞ্জীভূত হবার দরুন জমির অভাবের ফলে গ্রামগুলিতে খেতমজুরের আধিক্য ঘটে, খেতমজুরেরা যথেষ্ট কাজ পায় না। এর ফলে কৃষিজীবীদের প্রধান অংশের জীবনযাত্রার মান ধারাবাহিকভাবে নেমে যায়, এদের জীবনযাত্রার মান এমনিতেই নিচু। দুর্বৎসরে (ফসল খারাপ হয় প্রায়ই — কেননা, সার কিনবার, কিংবা ভূমি-উন্নয়ন, জলসেক ইত্যাদি বাবত দেবার মতো পয়সা কৃষকের নেই) এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় বহু অতি জনাকীর্ণ এলাকায় দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ, মড়ক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিপর্যয়।

কৃষক জমির অন্যায্য বিলির অবসান ঘটাতে চায়: তারা চায় যারা চাষ করে তাদের প্রত্যেকের নিজের জমি। এশিয়া এবং আফ্রিকার কোন কোন

দেশে বড় বড় জমিদারদের উদ্বৃত্ত জমির একাংশ কিংবা সবটাই সরকার কেড়ে নিয়ে (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খেসারত দিয়ে) যাদের জমি কম তাদের এবং খেতমজুরদের দিয়েছে। এই রকমের সংস্কার স্পষ্টতই কাজের: এতে গ্রামাঞ্চলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় এবং বিশেষসুবিধাভোগী বড় বড় জমির মালিকদের প্রভাব কমে; আর্থনীতিক ক্ষমতা থাকবার ফলে জমির এই মালিকেরা কৃষকদের, বিশেষত প্রজা কৃষকদের উপর অবাধে জুলুম চালাতে পারে (যেমন, তারা খুশিমতো খাজনা বাড়ায়, বকেয়া খাজনার দরুন জমি থেকে উচ্ছেদ করে, ইত্যাদি)।

তবে, বিশেষসুবিধাভোগী জমির মালিকেরা প্রকাশ্যে কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে এইসব সংস্কারের তীব্র বিরোধিতা করছে, বেশ কিছু জোত শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে থেকে যায়। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কৃষকদের মধ্যে বিলি করবার জন্যে সরকারের হাতে যত জমি আসে সেটা যাদের জমি দরকার তাদের সবার চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, যেসব কৃষক জমি পায় তাদের খামারের সরঞ্জাম, ইত্যাদি কিনবার পয়সা থাকে না — ফলে, যেভাবে চাষবাস করা দরকার সেভাবে তারা করতে পারে না।

এইভাবে, কৃষকের আর্থনীতিক দুর্গতি লাঘব হয় না। অনেকেই দেনদার, তারা জমির বড় বড় মালিক, সুদখোর আর হরেক রকমের মুনাফাবাজদের উপর কম-বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়েই থাকে; এইসব জমির মালিক, সুদখোর, ইত্যাদি কৃষকের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর উপায়ে খামারে উৎপন্ন জিনিস কেনা-বেচা করে।

কৃষক তার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে আকুল আকাঙ্ক্ষা না করে পারে না। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তারা লোকসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (যা আগে বলা হয়েছে) হবার ফলে তারা একটা বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ শক্তি।

রাষ্ট্রসত্তা দৃঢ়তর করার এবং সমস্ত রাজনীতিক আর আর্থনীতিক ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করার সংগ্রামে কোন দেশ জয়লাভ করতে পারে — একমাত্র যদি এই সংগ্রামকে কৃষক সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। কোন সরকার গুরুত্বসহকারে কাজ হাতে নিলে কৃষকের সবার্থ তার বিবেচনায় থাকা চাই, কৃষকের অবস্থার উন্নতি ঘটাবার উপায় তার পাওয়া চাই। কোন দেশের সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের মাত্রাটাই বহুলাংশে কৃষকের অবস্থা দিয়ে নির্ধারিত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতীয় আয় মুখ্যত কৃষি-উৎপাদনের

অবস্থার উপর নির্ভর করে। জাতীয় শিল্পের বিকাশ চলতে থাকার সম্ভাবনা নির্ভর করে দেশীয় বাজারের সামর্থ্যের উপর, সেটা আবার নির্ভর করে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী কিনবার জন্যে কৃষকের ক্ষমতার উপর। লোকসংখ্যার প্রধান অংশের, অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের লোকসংখ্যার সাক্ষরতা দিয়ে বহুলাংশে দেশের সাংস্কৃতিক মান নির্ধারিত হয়।

কোন দেশের ভবিষ্যৎ এবং প্রগতিশীল বিকাশের ধারা আর হার দেশের কৃষকের ভবিষ্যতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একথা প্রশ্নাতীত হলেও, কৃষকই সমাজের প্রগতিশীল অগ্রগতির প্রধান শক্তি এমন সিদ্ধান্ত তার থেকে করা ভুল হবে। সংখ্যায় বেশি হবার ফলে কৃষক আপনা থেকে সেই ভূমিকা পেয়ে যায় না: ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। তার কতকগুলি কারণ আছে, সেগুলি বিচার-বিবেচনা করে দেখা দরকার।

প্রথমেই বলা দরকার, কৃষি-উৎপাদনের প্রকৃতির দরুন কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যা দেশের সর্বত্র ছড়ানো, তারা কোথাও এমন যথেষ্ট সংখ্যায় কেন্দ্রীভূত নয় যাতে তারা একীভূত সামাজিক সত্তা হিসেবে চলতে পারে। অবিলম্ব, নিছক জাগতিক স্বার্থের দরুন কৃষক তার জমিখামারের সঙ্গে বাঁধা। প্রাথমিক ধরনের যন্ত্রসম্পত্তি না থাকায় কৃষকের কাজ কঠোর শ্রমসাধ্য, যথেষ্ট খেতে না পেলে এই শ্রম তাকে অবসন্ন করে ফেলে। ব্যাপক পরিসরে যোগাযোগের উপায়-উপকরণ মোটেই না-থাকা কিংবা যথেষ্ট না-থাকার দরুন কৃষক তার স্থানীয় স্বার্থ অনুসারেই বাইরের ঘটনাবলি এবং বিভিন্ন ব্যাপারের (যেমন, চলতি জাতীয় রাজনীতিক ঘটনাবলি) ব্যাখ্যা করে, ফলে তার মানসিক দিগন্ত খুবই গণ্ডিবদ্ধ।

এশিয়া আর আফ্রিকার প্রায় সমস্ত দেশেই কৃষক শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত যেকোন রাজনীতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, তারা থেকেছে কোন না কোন চক্রতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে, তার অর্থ হল হয় সামন্ততন্ত্রীদের, নইলে উপজাতীয় গোষ্ঠীপতিদের আধিপত্য, কিংবা কোন কেন্দ্রীকৃত স্বৈরশাসন। সুদীর্ঘ বছরের পর বছর বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য সে পরিস্থিতি বদলাবার জন্যে বিশেষ কিছুই করে নি। সাধারণত, উপনিবেশবাদীরা জমির বড় বড় মালিকদের বিশেষসুবিধাভোগী স্তরটাকে অক্ষতভাবে বজায় রেখেছে — এই স্তরটা কৃষকের উপর নিষ্ঠুর শাসন চালায়; এবং, শুধু তাই নয়, এই স্তরটাকে নিজেদের সমাজের স্তম্ভ হিসেবে ব্যবহারও করেছে। কৃষকদের অবমানিত অবস্থা বহুলাংশে তাদের আত্মিক

বিকাশে বিলম্ব ঘটিয়েছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর কুপ্রভাব বিস্তার করেছে, তাদের নানা অন্ধবিশ্বাস, আদিম ভাব-ধারণা আর কুসংস্কারের শিকার করেছে, আধিপত্যকারীরা এগুলিকে পোষণ করেছে, এতে উৎসাহ দিয়েছে সুপরিকল্পিতভাবেই। এইভাবে অধিকাংশ কৃষকই নিরক্ষর, জড়-পিণ্ড হয়ে থেকে গেছে।

তার পরিণতিগুলো এখনও দেখা যাচ্ছে: উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রাজনীতিক চেতনা এবং সাধারণ সংস্কৃতির মান শহরের মানুষের চেয়ে কৃষকের ক্ষেত্রে ঢের নিচু। এটা মনে রাখা দরকার।

তবে, এ কথাও বলতে হবে যে, কৃষক সম্পূর্ণতই নিষ্ক্রিয় থেকেছে এমন কোন সময় যায় নি। বিশেষসুবিধাভোগীর হাতে অসহ্য শোষণ আর জুলুমের মুখে কৃষকদের গণবিদ্রোহের বহু দৃষ্টান্তই ইতিহাসে রয়েছে। সামন্ততন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান কখনও কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং চলেছে বিভিন্ন বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। এমনই সব ঘটনা হল চীন, ভারত, ইরান এবং আরব দেশগুলিতে বিভিন্ন কৃষক যুদ্ধ—সেগুলির প্রবল প্রভাব পড়েছিল এইসব দেশের সাধারণ বিকাশের উপর। তবে, জমির প্রতি কৃষকের যে আসক্তি, কৃষকের এই বিশিষ্ট সামাজিক প্রবণতার দরুন এইসব কৃষক বৈপ্লবিক আন্দোলন সাধারণত জাতীয় স্বার্থ, অর্থাৎ কিনা, সমগ্র জনগণের স্বার্থ প্রকাশ করতে পারে নি। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে যারা কৃষকের নিঃস্বতা আর দারিদ্র্যের জন্যে দায়ী তাদের বিরুদ্ধে, প্রধানত স্থানীয় সামন্ততন্ত্রী, আমলা-ফয়লা আর সুদখোরদের বিরুদ্ধেই এইসব আন্দোলন সাধারণত পরিচালিত হয়েছে। একবার কোথাও কোন নিছক স্থানীয় সাফল্য অর্জিত হলেই এই কৃষক বিদ্রোহ নিঃশেষ হয়ে আসতে আরম্ভ করত: বিদ্রোহীরা ঘরের পথ ধরতে আরম্ভ করত। তাতে শোষকেরা সুযোগ পেয়ে যেত; তারা আরও ভালভাবে সংগঠিত, সামরিক দিক দিয়ে অধিকতর শক্তিশালী, সরকারী যন্ত্র তাদের হাতে -- তারা জড়ো হয়ে কৃষক আন্দোলন চূর্ণ করত।

যেসব বিরল ক্ষেত্রে কৃষক-যুদ্ধে জয় হয়েছে, তার নেতারা নতুন রাষ্ট্র সংগঠন স্থাপন করেছেন,* সে রাষ্ট্র পরে ভেঙ্গে পড়েছে -- তার কারণ

---

* এর একটা বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হল চীনের তাই-পিং রাষ্ট্র (তাই-পিং তিয়েন কুও)। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চীনের মধ্য প্রদেশগুলিতে এই রাষ্ট্র বজায় ছিল কয়েক বছর।

কৃষকেরা ব্যস্ত থেকেছে নিছক স্থানীয় বিষয়াবলি নিয়েই, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের চেয়ে সেদিকেই তাদের পাল্লা ভারি হয়েছে।

তার উপর, কৃষক রাষ্ট্রের উপর-মহল অচিরেই সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সংগঠনের স্বভাবসিদ্ধ অনাচারগুলিতে জড়িয়ে পড়েছে, তারা জনগণের প্রধান অংশ থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা গড়ে তুলেছে আমলাতান্ত্রিক চক্রতন্ত্র, তার মাথায় একজন সর্বোচ্চ নেতা, এই নেতা নিজের হাতে রাজার মতো কাজকর্ম নিয়ে নিজের উপর দেবত্বারোপ ক'রে সর্বসাধারণের পূজো আদায় করত। এইভাবে কৃষকদের নেতারা — সামন্ততন্ত্রীদের উপর এই স্বল্পস্থায়ী বিজেতারা -- নিজেরাই সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শে ডুবে যেতেন, সেটাকে তাঁরা জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে অগ্রসর হতেন, জমি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের মালিকানা সমান-সমান করার প্রচেষ্টাটাকে তাঁরা এইভাবে নিজেদের হাতেই পন্ড করতেন, যদিও, ঐ সমান-সমান করার ভাব-ধারণাই ছিল কৃষক বৈপ্লবিক যুদ্ধের প্রধান চালিকাশক্তি।

তাই-পিং বিদ্রোহের নেতারাও ব্যতিক্রম হলেন না। তাঁরা শেষপর্যন্ত সামন্ততন্ত্রীতে পরিণত হয়ে নতুন বনিয়াদে নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন সেইসব সামাজিক সম্পর্ক যেগুলোকে বিনষ্ট করার জন্যে কৃষক এগিয়েছিল। কাজেই, সবচেয়ে প্রবল ক্ষমতাশালী এই কৃষক আন্দোলন যে শেষে চূর্ণ হল তাতে তেমন আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কৃষক জনগণ একটা বিরাট বৈপ্লবিক শক্তি। তবে, এই শক্তিকে যথার্থ গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হলে পৃথক হয়ে থাকা চলবে না, -- সমাজের যে অংশের ঐক্য আর আভ্যন্তরিক সংগঠন আরও উঁচু মাত্রার, সবার অভিন্ন স্বার্থকে যারা স্থানীয় স্বার্থের উপরে তুলে ধরে, আন্দোলনের জাতীয় লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়, তাদের সঙ্গে একযোগে এবং তাদের পরিচালনাধীনে ঐ শক্তিকে চলতে হবে। অর্থাৎ কিনা, কৃষককে শহরের নেতৃত্ব মানতে হবে।

বলা যায়, কৃষককুল এমন একটা বাহিনী যা জয়ী হতে পারে একমাত্র সুযোগ্য পরিচালনাধীনে, সেই পরিচালক সাধারণত হয় অন্য একটা সামাজিক অংশ।

আবারও বিশেষ জোর দিয়ে বলা দরকার যে, এশিয়া আর আফ্রিকার কৃষক মধ্যযুগের বিভিন্ন অবশেষ আর আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার শিকার --- সেটা এইসব দেশের সাম্প্রতিক ঔপনিবেশিক অতীতের প্রত্যক্ষ

পরম্পরাগত উপাদান — কিন্তু, এই কৃষক সম্ভাবনাময় বৈপ্লবিক কর্মশক্তির একটা বিশাল ভান্ডার। এই কর্মশক্তি কিভাবে ব্যবহৃত হবে সেটা এখনও দেখবার বিষয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শহরের লোকসংখ্যা গ্রামাঞ্চলের লোকসংখ্যার চেয়ে অনেক কম। এর অনেক দেশেই শহরগুলো যেন নিঃসীম মরুভূমির মধ্যে ছোট ছোট মরূদ্যান। তবে, সারা দেশ থেকে আহরিত বৈষয়িক আর সাংস্কৃতিক দ্রব্যসামগ্রী এবং মূল্য জড়ো হয় এই শহরগুলিতেই। বহুল পরিমাণে যন্ত্রে-উৎপাদন গড়ে ওঠে আর বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রীভূত হয় শহরগুলিতেই, এইসব শিল্প হল কারিকরদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মশালা থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামে সজ্জিত শিল্পায়তন অবধি, যদিও, স্বভাবতই, ঐ ছোট কর্মশালাগুলোই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। কৃষকের কৃষি উৎপাদনের বেশ মোটা একটা অংশ বিক্রি হয় শহরে। আর এই শহরের বাজারেই কৃষকেরা এবং লোকসংখ্যার বাদবাকি অংশও কেনে ভোগ্যপণ্য এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

বিভিন্ন কাজে আর পেশায় লোককে ট্রেনিং দেবার বিদ্যালয়গুলি শহরেই। শেষে, শহরগুলিই রাজনীতিক কেন্দ্র — শহরেই থাকে স্থানীয়, শহরের প্রশাসনকেন্দ্র এবং সন্নিহিত, প্রায়ই বেশ বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলগুলিরও প্রশাসনকেন্দ্র।

সমগ্র ইতিহাসে শহর আর শহরে লোকসংখ্যা গড়ে ওঠা একটা প্রগতিশীল প্রক্রিয়া, দেশে দেশে মানুষের আর্থনীতিক আর রাজনীতিক জীবনে পরিবর্তনগুলি তাতে প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন দেশের বিকাশের ক্ষেত্রে একীকরণের উপাদান হল শহরগুলি — বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র হল শহরগুলি: ঐসব অঞ্চলের বাসিন্দাদের উৎপন্ন বৈষয়িক দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় এবং বিভিন্ন রাজনীতিক, দার্শনিক আর ধর্মীয় ভাব-ধারণার বিনিময় নিশ্চিত করে শহরগুলি।

সন্নিহিত এবং অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী এলাকাগুলির সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করার বিবেচনা অনুসারেই শহরগুলির ভৌগোলিক অবস্থান সাধারণত নির্ধারিত হয়। গোড়ায় বিনিময় বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল এমন অনেক শহরই দেশের অভ্যন্তরভাগের সঙ্গে যোগপথের চৌমাথায় দুদিক জুড়ে অবস্থিত। যেসব শহরের সাগরের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় আছে, কিংবা গুরুত্বসম্পন্ন নাব্য নদীর ধারে যেসব শহর অবস্থিত, সেগুলির বিকাশের মাত্রা হয়েছে

উচ্চতর, তার কারণ হল পণ্য চলাচলের অধিকতর সুযোগসুবিধা, কিংবা, সংশ্লিষ্ট শাসকদের ইচ্ছা অনুসারে, শাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রশাসনের উদ্দেশ্যে কিংবা নতুন নতুন ভূভাগ জয় করবার জন্যে সৈন্য কিংবা আমলা-ফয়লাদের গতিবিধির সুবিধা।

ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, পরদেশ-বিজেতারা তাদের সামরিক অভিযানের গোড়ায় দখল করেছে বিভিন্ন শহর -- কেননা, দেশটির বাদবাকি অংশের মুখোমুখি শহরের অবস্থান নিয়ন্ত্রণের পক্ষে উপযোগী। এইভাবে দখল-করা শহরগুলি অনেক সময়ে দীর্ঘকাল যাবত বিজেতা শক্তির প্রধান ঘাঁটি হয়ে থেকেছে — যেমন হয়েছে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের দখল করা এশিয়া আর আফ্রিকার প্রায় সমস্ত দেশে।

তবু, জাতীয় মুক্তির জন্যে লড়াইয়ের গোপন প্রস্তুতি চালাবার সামাজিক শক্তিগুলি দানা বেঁধে উঠেছে বিজাতীয় শাসনের অবস্থায়ও শহরগুলিতেই। তার সবচেয়ে বড় কারণ হল শহরের জীবনের বাস্তব অবস্থার ফলে স্থানীয় লোকসংখ্যার সবচেয়ে ঘনবিন্যস্ত, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত স্তর থাকে শহরগুলিতে। বিজাতীয় দখলের লৌহমুষ্টির মধ্যেও শহরগুলি জনগণের আত্মিক সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে থেকেছে। ঔপনিবেশিক কিংবা অন্য কোন রকমের বৈদেশিক শাসনের জুলুম শহরবাসীর অনুভূত হয় সর্বক্ষণ — এই শহরবাসীরাই সবচেয়ে লক্ষণীয় উপায়ে বিজাতীয় শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের সক্রোধ ঘৃণার অভিব্যক্তি ঘটাতে পেরেছে।

শহরে লোকসংখ্যার বৈষয়িক এবং আত্মিক জীবনযাত্রার বাস্তব অবস্থার ফলে শহরগুলিই কোন দেশে মানুষের জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার কাজে পথপ্রদর্শক শক্তি হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্যে শহরের লোকসংখ্যার কোন একটা স্তরকে কৃষক জনগণের উপর নেতৃত্ব করবার দায়িত্ব নিতে হয়।

শহরের লোকসংখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন স্তর কী, এবার সেটার নিশানদিহি করার চেষ্টা করা যাক।

শহর হল শিল্পোৎপাদন আর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র -- তাই, শহরের লোকসংখ্যা হল, প্রধানত, একদিকে, কারবারিরা -- অর্থাৎ, বড়, মাঝারি এবং ছোট ছোট শিল্প আর ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকেরা, আর অন্যদিকে, বৈষয়িক দ্রব্যসামগ্রী যারা বাস্তবে উৎপন্ন করে, অর্থাৎ কিনা, বিভিন্ন বর্গের শ্রমিক

এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত কর্মচারীরা। (শহুরে লোকসংখ্যার অন্যান্য স্তর নিয়ে এই রচনার একটা পরবর্তী অংশে বিচার-বিবেচনা করা হবে।)

শহরের লোকসংখ্যার ঐ দুটো স্তর বা শ্রেণীকে বলা হয় যথাক্রমে বুর্জোয়া আর শ্রমিক শ্রেণী।

বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে কৃষককুলের সঙ্গে শহুরে লোকসংখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন এই দুটি স্তর বুর্জোয়া আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সব সময়ে যোগাযোগ আর আদান-প্রদান চলে।

এখানে যেভাবে ব্যবহার তাতে 'বুর্জোয়া' বলতে বুঝানো হয়েছে যাকে বলা হয় স্থানীয় জাতীয় বুর্জোয়া, অর্থাৎ কিনা, স্থানীয় পুঁজিতান্ত্রিক কারবারিরা যারা শিল্প, বাণিজ্য কিংবা অর্থ ক্ষেত্রে কারবার করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়ারা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত সামাজিক সত্তা নয়। তাদের মধ্যে আছে সমাজের বিভিন্ন উপ-স্তর, এর প্রত্যেকটা উপ-স্তরের নিজস্ব বিশেষ গ্রুপ-স্বার্থ আছে, — সমগ্র সমাজে ঐ গ্রুপগুলির আর্থনীতিক এবং সাধারণ প্রতিষ্ঠা অনুসারে ঐ স্বার্থ নির্ধারিত হয়।

একটা সমগ্র সত্তা হিসেবে দেখলে, জাতীয় বুর্জোয়ারা জাতীয় (যা বৈদেশিক বুর্জোয়া থেকে পৃথক) শিল্প আর ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে — সেগুলি বড়, মাঝারি এবং ছোট। এদের স্বার্থ কিন্তু কোনক্রমেই সব সময়ে অভিন্ন নয়।

বড় বুর্জোয়াদের নিয়ে রয়েছে দক্ষিণপন্থী এবং সবচেয়ে রক্ষণপন্থী গ্রুপ; বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এবং দেশে জমির বড় বড় মালিকের সঙ্গে আপস করার দিকেই তাদের ঝোঁক। বড় বুর্জোয়ারা সাধারণত চড়া মুনাফা কামায় — এটাই কারণ যার ফলে বিদ্যমান রাজনীতিক এবং সামাজিক অবস্থায় কোন বদল সম্বন্ধে তারা উদাসীন হয়। তবে, এই বড় জাতীয় বুর্জোয়ারাও বিদেশী পুঁজির কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে ইচ্ছুক নয়। তাদের পরিকল্পনায় চাহিদা হল — 'নিয়মমাফিক' পুঁজিতান্ত্রিক ধারায় জাতীয় উন্নয়ন, শিল্পায়তনগুলির উপযুক্ত আধুনিকীকরণ এবং প্রাক্তন উপনিবেশভোগী দেশ সমেত বিভিন্ন পুঁজিতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে অংশীদারি। তারা যেকোন মূলগত সংস্কারের ঘোর বিরোধী, এমন সংস্কারকে তারা নিজেদের স্বার্থের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিপদ বলে মনে করে। যেসব গণতান্ত্রিক সামাজিক শক্তি সমাজতান্ত্রিক

কর্মসূচি ধরার পক্ষে তাদের বৃদ্ধি দেখলে বড় বুর্জোয়ারা আরও বিশেষভাবে আতঙ্কবোধ করে। ব্যক্তিগত কারবারের স্বাধীনতার গরজে তারা এই আওয়াজ তুলে জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়া কিংবা সেটাকে আরও জোরদার করা সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব দেখায়। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় অর্থনীতির কোন কোন শাখায় বড় বুর্জোয়াদের একচেটিয়া কায়েম করার দিকে ধারা দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ কিনা, শিল্পোৎপাদনের কোন কোন শাখায় কয়েকটি প্রবল ক্ষমতাশালী পুঁজিতান্ত্রিক ট্রাস্টের হাতে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত করার দিকে ধারা।

ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্পক্ষেত্রে মাঝারি জাতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে পরিস্থিতিটা ভিন্ন। তাদের ঐ একই মাত্রার আর্থনীতিক সুস্থিতি নেই। এর দরুন বিদেশী পুঁজি এবং আর্থনীতিক নির্ভরশীলতার অমঙ্গলগুলোর চাপে তারা অপেক্ষাকৃত বেশি ভেদ্য। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তাদের ঢের বেশি সক্রিয় ভূমিকার (বড় বুর্জোয়াদের সঙ্গে তুলনায়) কারণ সেটাই। লোকসংখ্যার (প্রধানত কৃষকের) বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কম ক্রয়ক্ষমতার দরুন দেশী বাজার অপেক্ষাকৃত গণ্ডিবদ্ধ ব'লে মাঝারি জাতীয় বুর্জোয়ারা বিভিন্ন ভূমিসংস্কার কর্মসূচি সমথর্ন করতে প্রবৃত্ত হয়। বড় বুর্জোয়াদের মতো নয়, মাঝারি আর ছোট বুর্জোয়ারা জাতীয় অর্থনীতির মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ার পক্ষে — যে-পরিমাণে সেটা তাদের আশু আর্থিক স্বার্থ ক্ষুন্ন না-করে কিন্তু দেশের জাতীয় স্বাধীনতা শক্তিশালী করতে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

তবে, স্পষ্টতই, বড় আর মাঝারি জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে কোন দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল নেই। বড়দের মতো মাঝারি বুর্জোয়ারাও সবাই পুঁজিতান্ত্রিক মূলনীতিগুলিকে মজবুত করে তোলার পক্ষে, তেমনি, কোন সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচিতে তাদেরও লেশমাত্র আগ্রহ নেই। কাজেই, অপেক্ষাকৃত বেশি রক্ষণপন্থীদের নিরন্তর চাপে পড়া অবস্থায় তাদের দোদুল্যমানতার প্রবণতা আরও বেশি। একটা সমগ্র সত্তা হিসেবে তারা প্রগতিশীল সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কারের কোন মূর্ত কর্মসূচির সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপায়ণে অপারগ।

শহুরে পেটি বুর্জোয়াদের আর্থনীতিক পরিস্থিতি খুবই অস্থির। প্রধানত দোকানদার আর ছোটখাটো কর্মশালার মালিকদের নিয়ে এই পেটি

বুর্জোয়ারা বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে সংখ্যার দিক দিয়ে লোকসংখ্যার একটা গুরুত্বসম্পন্ন স্তর। কাজেই, এই শহুরে পেটি বুর্জোয়ারা কখনও কখনও বিভিন্ন এবং প্রায়ই পরস্পরবিরোধী সামাজিক শক্তির প্রভাবে পড়তে পারে। অন্যদিকে (মাঝারি বুর্জোয়াদের মতো নয়) লোকসংখ্যার মেহনতী আর অভাবীদের স্তরের সঙ্গে পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিয়ত যোগাযোগ থাকে, এই যোগাযোগ ঘনিষ্ঠই। এর ফলে তারা বিভিন্ন মূলগত-সংস্কারের ভাবগ্রহণ করতে পারে, কখনও কখনও তারা নিজেরাই বিভিন্ন প্রগতিশীল মতামতের সঙ্গে অন্যান্যের পরিচয় ঘটাতে আরম্ভ করে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের সমগ্র ক্ষেত্রে তারা রাজনীতিগতভাবে উচ্চ-মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন মূলগত সামাজিক সংস্কার, ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক কারবারী ক্রিয়াকলাপের উপর বাধানিষেধ, মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ এবং গণতন্ত্রসম্মত ভূমি সংস্কারের পক্ষে অবিচলিতভাবে দাঁড়ায় এমন বহু পেটি বুর্জোয়া। শহুরে পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে বুদ্ধিজীবীরা, ছোট কর্মচারীরা, ফৌজী অফিসারেরা আর ছাত্ররা।

স্থানীয় জাতীয় পুঁজির অবাধ কারবারী ক্রিয়াকলাপের পথে একটা বাধা হল উপনিবেশবাদ; বাস্তব ঘটনাবলি দিয়ে চালিত হয়ে সমগ্র জাতীয় বুর্জোয়া ঐ বাধা হিসেবে উপনিবেশবাদের বিনাশের পক্ষে দাঁড়ায়। সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হলেই জাতীয় বুর্জোয়া আর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বগুলোর মীমাংসা হয়ে যায় না — কেননা, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অর্থনীতিক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান বজায় রাখা এবং সম্প্রসারিত করার জন্যে বিদেশী পুঁজি যেকোন চরম ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে পারে। বিভিন্ন চলতি রাজনীতিক পরিবর্তন অনুসারে বিদেশী পুঁজি অনেক সময়ে তাদের কর্মকৌশল বদলায়, তা ঠিক। স্থানীয় কারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে, সহযোগিতায় তাদের আগ্রহান্বিত করার জন্যে বিদেশী পুঁজি চেষ্টা করে। বিদেশী পুঁজি খুবই ভরসা করে বিভিন্ন মিশ্র কোম্পানির উপর, অর্থাৎ কিনা, যেসব কোম্পানিতে জাতীয় আর বিদেশী দু'রকমের পুঁজিই অংশগ্রহণ করে। কখনও কখনও বিদেশী পুঁজি স্থানীয় জাতীয় পুঁজির ভেক ধরে কাজ চালায়। এমনসব ক্ষেত্রে, এমন নির্ভরযোগ্য আবরণের আড়ালে থেকে কাজ চালাতে পেয়ে বিদেশী পুঁজি অন্যান্য অবস্থায় যা তার চেয়ে অনেক কম ভেদ্য বলে নিজেদের মনে করে।

জাতীয় বুর্জোয়াদের সহযোগী করে তুলবার চেষ্টার মধ্যে বিদেশী একচেটিয়া কারবারগুলো একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ব্যবহার করে: গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বৃদ্ধি ঘটলে, আর শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের জোয়ার এসে গেলে, আর অবস্থান্তর ঘটে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের ধারা যদি এসে যায়, তাহলে কী কী পুঁজিতন্ত্রবিরোধী পরিণতি ঘটতে পারে সেই জুজুটাকে তারা তুলে ধরে স্থানীয় কারবারিদের সামনে। জাতীয় বুর্জোয়াদের 'বন্ধু' হিসেবে ভান ক'রে এইসব বিজাতীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির সম্মিলিত কার্যকরণ রোধ করার চেষ্টা করে এবং ঐ শক্তিগুলিকে দুর্বল করে ফেলবার জন্যে প্ররোচনা দিয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্ন আভ্যন্তরিক সংঘাত বাধিয়ে দেয়, এতে তাদের চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন একমাত্র মতলব হল, একেবারে পুরন ধাঁচের না হলেও, অন্য যেকোন রূপে ঔপনিবেশিক শাসন পুনঃপ্রবর্তিত করার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা।

জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে যাদের রাজনীতিক দূরদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশি তারা ঐ সাম্রাজ্যবাদী 'বন্ধু'দের ছলাকলার মধ্যে নিহিত বিপদটা বুঝতে পারে: সাম্রাজ্যবাদীদের ছলাটাকে তারা ধরে ফেলে — কাজেই, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতার ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও তাদের সবাইকে সাম্রাজ্যবাদের মিত্র কিংবা দুষ্কর্মে শাগরেদ হিসেবে একই পংক্তিভুক্ত করা নিশ্চয়ই ভুল। সমাজের খুবই প্রভাবশালী এই অংশটার বিভিন্ন মনোভাব বিভিন্ন বিষয়গত উপাদান দিয়ে নির্ধারিত হয়। তবে, উন্নয়নশীল দেশগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি যতই কৌশলে ঢাকা-ঢোকা হোক না কেন, সেগুলি মূলত লুটেরাই থেকে যায়। যেসব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধেই ঐসব কর্মনীতি পরিচালিত হয়। সেগুলি আরও পরিচালিত হয় জাতীয় শিল্প, বাণিজ্য, আর্থ আর ক্রেডিট্ ব্যবস্থার স্বাধীন বিকাশের বিরুদ্ধে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে, এইসব সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি জাতীয় বুর্জোয়াদেরও মৌলিক স্বার্থের উপর বহুলাংশে হানা দেয়।

জাতীয় বুর্জোয়াদের বৈপ্লবিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্ভাবনাটাকে বেশি বড় করে দেখানো — বলা যেতে পারে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা — আর সমস্ত জাতির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে রাখা, এই দুইই সমানই অবিমৃষ্যকারিতা।

আলোচ্য দেশগুলির জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন এবং প্রগতিশীল বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা হল **শ্রমিকদের** ভূমিকা। এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন, কিন্তু এই শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা আর তাৎপর্য সংখ্যা ছাড়া অন্যান্য উপাদান দিয়ে নির্ধারিত হয়।

যখন রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয় নি, অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক আমলে, এশিয়া আর আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশে সমাজের যে অংশ জাতীয় আর সামাজিক এই ডবল উৎপীড়নের জ্বালা ভোগ করেছে অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশি, সেটা হল শ্রমিক শ্রেণী। 'দেশীয়' শ্রমিকদের অবস্থা আর্থনীতিক এবং আইনগত প্রতিষ্ঠা এই দু'দিক থেকেই উপনিবেশভোগী দেশগুলির সবচেয়ে কম দক্ষ এবং সবচেয়ে কম মজুরি পাওয়া শ্রমিকদের চেয়ে এত খারাপ ছিল যার কোন তুলনাই চলে না। উপনিবেশগুলিতে গোড়ার দিককার শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য কারবারের পুঁজিতান্ত্রিক মালিক ছিল সাধারণত বিদেশীরা। উপনিবেশগুলিতে নিজেদের কর্তৃত্বের অবস্থার সুযোগ নিয়ে এইসব পুঁজিপতি ডাহা ঔপনিবেশিক কায়দায়ই কারবার চালাত। উৎপাদনে ম্যানেজার, চেয়ারম্যান, আর উচ্চ মাত্রায় দক্ষ শ্রমিক হত সাধারণত শ্বেতাঙ্গরা। তারা ছিল 'মনিব'। তাদের মাইনে হত অপেক্ষাকৃত বেশি, তারা কোন কোন বিশেষসুযোগসুবিধা পেত। বাদবাকি শ্রমিক, অর্থাৎ শ্রমিকদের প্রধান অংশটাকে নেওয়া হত স্থানীয় লোকসংখ্যার ভিতর থেকে — তারা হত গরিব ছোট কারিকর, কিংবা ক্ষুধার তাড়নায় গ্রাম-ছাড়া স্থানীয় কৃষক। যেসব দেশে ঔপনিবেশিক রাজ ছিল বিশেষভাবে নৃশংস সেসব দেশে উপনিবেশবাদীরা স্থানীয় গরিবদের ধরে নিয়ে কারখানায় কাজে লাগাত, তাদের থাকতে দিত জেলখানার মতো খুপরিতে। তাদের মজুরি হত বিদেশীদের মজুরির ভগ্নাংশ মাত্র, তাদের দৈনন্দিন কার্যকাল হত মালিকের মর্জিমাফিক, কাজে নিরাপত্তা বলে কিছু থাকত না।

এইভাবে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে শ্রমিকেরা ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন, শোষণ আর সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত অবস্থার রূঢ় অভিজ্ঞতা লাভ করত দ্রুত। এই অবস্থায়, সদ্যোজাত দেশীয় শ্রমিক শ্রেণী দেশকে ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করবার জরুরী প্রয়োজন বোধ না করে পারত না।

শ্রমিক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে আপসহীন অবস্থানে দাঁড়ায়

তার উপর কোন ব্যক্তিগত মালিকানার স্বার্থ কিংবা মালিকানার মনোবৃত্তির পিছুটান থাকে না। বাস্তবিকই, শ্রমিকদের হারাবার মতো থাকে শুধু অসমতার শৃঙ্খল আর নৃশংস শোষণ। সামাজিক মুক্তির জন্যে করণীয় কাজ জাতীয় মুক্তির জন্যে করণীয় কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিল্পে, পরিবহনে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা কেন্দ্রীভূত; তাদের স্বার্থের অভিন্নতা, সংহতি আর পারস্পরিক সহায়তার মনোভাব অপেক্ষাকৃত দ্রুত গড়ে ওঠার জন্যে সেটা সহায়ক। শিল্পোৎপাদন সেইভাবে শ্রমিক সংগঠনের পথ সুগম করে, শ্রেণী-চেতনা গড়ে তোলে। কাজেই, এশিয়া আর আফ্রিকার অনেক দেশে শ্রমিক শ্রেণী যে পরিস্থিতির বলেই জাতীয় স্বার্থের সবচেয়ে অবিচলিত এবং অকপট রক্ষক হয়ে ওঠে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

প্রসঙ্গত, এইসব শ্রমিকদের অনেকেই খেত-বাগিচা এবং বড় বড় জমিদারির মজুর। যেসব কৃষককে নিজেদের ছোট ছোট জমিতে চাষবাস করা ছাড়াও দারিদ্র্যের তাড়নায় জন-খাটতে হয় তারা অনেকটা ওদেরই মতো।

শিল্পক্ষেত্রের জন্যে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয় প্রধানত কৃষকদের ভিতর থেকে — এই কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শহুরে শ্রমিকেরা গ্রামাঞ্চলের মানুষ এবং তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ বজায় রাখে; সামাজিক প্রগতি এবং অধিকতর স্বাধীনতার দেশী-বিদেশী শত্রুদের সহায়ক সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন অবশেষের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রামে সাহায্য করতে তারা সাধারণত সদাপ্রস্তুত।

পরিসংখ্যানের তথ্য নির্ভরযোগ্য নয়, তার উপর, নিরিখও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন — তাই, এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে যথাযথ অঙ্ক উল্লেখ করা কঠিন। তবে, সংখ্যাটা যে সাম্প্রতিক কয়েক বছরে বেড়ে আসছে সেটা অনস্বীকার্য।

এশিয়ায় সবচেয়ে বড় একটা দেশ ভারত — এখানে শিল্পে, পরিবহনে এবং বাগিচাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা এক কোটির বেশি (১৯৬৫ সালের হিসাব)। মোট লোকসংখ্যার সঙ্গে তুলনায় সংখ্যাটা তেমন বেশি নয়, কিন্তু যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি থেকে দেখা যায়, বহুলাংশে জাতীয় অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বৃদ্ধির ফলে সংখ্যাটা সমানে বেড়ে চলেছে।

এশিয়ায় আর আফ্রিকায় বেশির ভাগ জন-খাটা শ্রমিক কাজ করে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট কলে-কারখানায়। এর দরুন তাদের সংগঠিত হতে

অসুবিধা হয়, তাদের জীবনযাত্রার মানও মোটের উপর অনেক নিচু। যারা ছোট ছোট এবং নগণ্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তারা দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকার দরুন রেওয়াজী-অস্ত্র ধর্মঘটের সাহায্যে ন্যায্য মজুরি এবং কম দৈনন্দিন কার্যকালের জন্যে লড়াই করা তাদের পক্ষে আরও কঠিন হয়। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের উপরও এর হানিকর ক্রিয়া ঘটে।

তবে, মোটের উপর, এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে ধর্মঘট আন্দোলন বাড়বার ধারাই লক্ষ্য করা যায়। শিল্পোৎপাদন বাড়াবার জন্যে ব্যক্তিগত কারবারিরা সাধারণত শ্রমিকের মজুরি একেবারে ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে নিজেদের মুনাফা বাড়াবার চেষ্টা করে, তারা অকথ্য দুরবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করে, নারী এবং নাবালকদের শ্রম ব্যবহার করে।

শিল্পে-অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েতের যে বৈশিষ্ট্যনির্দেশক উঁচু মাত্রার সংহতি রয়েছে তার কাছাকাছি কোথাও পেঁছয় নি আলোচ্য দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী। এ কথা বিশেষত শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের পক্ষে খাটে। এর বেশির ভাগ দেশেই অন্যান্য সামাজিক সমষ্টির সঙ্গে তুলনায় শ্রমিক শ্রেণী এখনও সংখ্যায় খুব কম। আফ্রিকার কোন কোন দেশে মেহনতী জনগণের একটা স্পষ্ট-নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে শ্রমিক শ্রেণী গড়ে উঠেছে সবেমাত্র; এটা হল এইসব দেশের সামাজিক-আর্থনীতিক অনগ্রসরতা এবং উৎপাদন-শক্তিগুলির অপ্রতুল বিকাশের একটা নির্দেশক উপাদান। বিভিন্ন সেকেলে সামাজিক সম্পর্কের (উপজাতীয়তা, সামন্ততন্ত্র) যেসব অবশেষ টিকে রয়েছে সেগুলি শহরগুলির বিকাশ এবং শিল্পোৎপাদনবৃদ্ধি ব্যাহত করে। এইসব দেশে শ্রমিক শ্রেণীর বিশেষ ধরনের গড়নের কারণ সেটাই। শিল্প প্রতিষ্ঠানে না হয়ে বিভিন্ন কৃত্যক প্রতিষ্ঠানে আর কৃষিতেই বেশির ভাগ শ্রমিক নিযুক্ত হয়। শ্রমিক শ্রেণীর বেশ বড় একটা অংশ বাগিচা শ্রমিক। মরশুমী কাজ খুবই ব্যাপক, শ্রমিকেরা কিছুকাল অন্তর-অন্তর শহর থেকে গ্রামে ফিরে যায়। বহু শ্রমিক কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, সেটা তাদের কৃষক থেকে উদ্ভবের সূত্রে শুধু নয়, তাদের পরিবার গ্রামেই থাকে এবং চাষবাস করে। মরশুমী নিয়োগ আর শ্রমিকের স্থানপরিবর্তন — সাধারণভাবে এই দুইয়েরই কারণ হল এই যে, স্থানীয় শ্রমিকদের কোন নির্দিষ্ট কাজে বিশেষ ট্রেনিংয়ের অভাব

আছে। এরা বেশির ভাগই বিশেষ বিশেষ ঠিকাদারদের অধীনে কঠোর কায়িক শ্রম করে: শ্রমিকদের কাজে তাড়া লাগাবার জন্যে এবং শাস্তি দেবার জন্যে এইসব ঠিকাদার বিভিন্ন অমানুষিক ব্যবস্থা করে, চাবুকও মারে।

শ্রমিকদের উপর আধা-সামন্ততান্ত্রিক প্রণালীর শোষণ এশিয়া আর আফ্রিকার বহু দেশের বৈশিষ্ট্যমূলক। এর একটা প্রণালী হল আড়কাঠি মারফত শ্রমিক সংগ্রহ করা — এই আড়কাঠিরা লোককে কাজ জুটিয়ে দেবার বাবত তার যা আছে সমস্ত টাকাপয়সা নিয়ে নেয়, আবার, যতখানি সম্ভব সস্তায় শ্রমিক পাইয়ে দেবার জন্যে মালিকদের কাছ থেকে বেশ মোটা রকমের দস্তুরি পায়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ আর মড়কে দুর্গত এলাকাগুলিতে গরিবদের নিদারুণ দুর্দশার সুযোগে ঐ আড়কাঠিরা অপ্রাপ্তবয়স্কদের, বিশেষত অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদেরও তাদের বাপ-মায়েদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে শহরে কলে-কারখানায় কাজে লাগায়, সেখানে তারা নৃশংসভাবে শোষিত হয়, আর জেলখানার মতো অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়। তাদের উপর যে-শোষণ চলে সেটা সামন্ততান্ত্রিক শোষণেরই মতো: যেমন, তাদের পুরো মাইনে দেওয়া হয় না, তাদের কাজের যা প্রকৃতি তাতে তাদের উপর সামাজিক বৈষম্য চলে, সব মিলিয়ে তাদের দুর্দশা আরও বেড়ে যায়। সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত অবস্থায় তারা পায় অতি নিষ্ঠুর আচরণ। যেকোন রকমের প্রতিবাদ হলে আসে সাজা। নারী আর অপ্রাপ্তবয়স্কদের শ্রম নিয়োগ করা হয় ব্যাপকভাবে, তার ফলে অবস্থা হয় আরও খারাপ। মজুরি সাধারণত খুব কম -- তার উপর, নারী আর অপ্রাপ্তবয়স্করা পায় আরও কম, এইভাবে সস্তা শ্রম পাবার সুযোগে পুঁজিপতিরা মজুরির হার আরও কমাতে পারে, আর শ্রমিকদের যেকোন মুহূর্তে বরখাস্ত করার আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখতে পারে।

এই সবকিছুর দরুন এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে নেতৃস্থানীয় সামাজিক শক্তির ভূমিকায় আসা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে কঠিন হয়, শ্রমিক শ্রেণীর সংহত হবার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। অন্য দিকে, ঐসব কারণেই মেহনতী জনগণের মনে ন্যায্য ক্রোধ এবং ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি হয়, ঐগুলি পুঞ্জীভূত সামাজিক প্রতিবাদের উৎস হয়ে ওঠে। এই প্রতিবাদ প্রথমে হয়ত নিছক স্বতঃস্ফূর্ত হলেও, সেটা কালে ক্রমাগত বেশি মাত্রায় বিভিন্ন সংগঠিত রূপ ধারণ করে। এশিয়া আর আফ্রিকার বহু দেশে

বৈশিষ্ট্যসূচক পাশবিক শোষণ আর অধিকারবিহীনতা আর সামাজিক বৈষম্যের এই ধরনধারনের ফলে শ্রমিকদের যেকোন প্রতিবাদে সুনির্দিষ্ট রাজনীতিক ছোপ এসে যায়। আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতির জন্যে লড়াই চালাতে গিয়ে শ্রমিকেরা বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন দাবি করে — সেসব সামাজিক অবস্থা তাদের উপর শোষণের অতি জঘন্য উপাদানগুলোর জন্যে দায়ী; যে সামাজিক ব্যবস্থার দিন ফুরিয়ে গেছে সেটা বিলুপ্ত করার দাবি তোলে শ্রমিকেরা। এশিয়া আর আফ্রিকার প্রায় সমস্ত দেশেই সামাজিক আর রাজনীতিক অনগ্রসরতার মূল রয়েছে উপনিবেশবাদের মধ্যে — তাই, সংখ্যা আর সংগঠনের দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও শ্রমিকেরা সব সময়েই জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের আর তাদের স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুরোভাগে থেকেছে, যা আমরা আগেই দেখেছি।

সংগঠন আর সম্মিলিত কার্যকরণই শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান অস্ত্র। শ্রমিকদের পরম্পরাগত কর্মকৌশল হল ধর্মঘট: শ্রমিকদের দাবি মেটাতে মালিকদের বাধ্য করার জন্যে তাদের উপর চাপ দেবার এই সংগঠিত যুক্ত কার্যকরণ।

সুনির্দিষ্টভাবে প্রলেতারীয় এই কর্মকৌশল যে এশিয়ায় আর আফ্রিকায় ক্রমাগত ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারের মধ্যে দেখা যায়। এইসব দেশে শ্রমিকদের আর্থনীতিক অবস্থা কৃষকদের চেয়ে অনেক ভাল, এই রকমের একটা ভুল ধারণা আছে কোন কোন মহলে। সম্পূর্ণ অমূলক এই ধারণা যারা পোষণ করে তারা কখনও কখনও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত করে বসে যে, অবস্থা আরও খারাপ বলেই কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর চেয়ে বেশি বৈপ্লবিক শক্তি। এই তত্ত্বটাও সম্পূর্ণ অমূলক।

শ্রমিকের আর্থনীতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, এমনটা ধরে নিয়ে ঐ তত্ত্ব খাড়া করা হয়। কিন্তু, ঠিক কিভাবে শ্রমিকের অবস্থা আরও ভাল? সবচেয়ে গরিব কৃষকেরও একটা জমি আছে, সেখানে সে চাষবাস করে। শ্রমিক কিন্তু কোন উৎপাদনের উপকরণের মালিক নয়। বেঁচে থাকবার জন্যে তার কাজ করার ক্ষমতা বিক্রি করতে হয়, এই ক্ষমতাই তার একমাত্র সম্পত্তি। সে এমন একটা পরিস্থিতির উপর সম্পূর্ণতই নির্ভরশীল যেটাকে সে বদলাতেও পারে না, তার উপর অন্য উপায়ে প্রভাব বিস্তার করতেও

পারে না। কাজ পাবার আগে তার কাজ করার ক্ষমতার জন্যে চাহিদা থাকা চাই, তাই কাজের বাবত পয়সা দিতে ইচ্ছুক ক্রেতা থাকা চাই। কিন্তু, সে যে কাজ করে তার জন্যে মাইনের হার, আর যে অবস্থায় সে কাজ করে, এই সবই স্থির করে সম্পূর্ণতই তার মনিব, কারবারি — এসব শ্রমিক স্থির করে না।

কখনও কখনও কথা তোলা হয় যে, কোন কোন দেশে শ্রমিকের আসল মজুরি কৃষকের আয়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু কথাটা ঠিকই একমাত্র যখন কোন দেশে কিংবা অঞ্চলে শ্রম-শক্তির জন্যে মোটারকম চাহিদা থাকে, যেটা নিতান্ত সাময়িক হতে পারে, কিংবা কৃষকের সামান্য আয়ের চেয়ে বেশি মজুরির জন্যে দাবিদার শ্রমিক যখন উঁচু মাত্রায় সংগঠিত থাকে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে একমাত্র সম্ভাব্য নির্ভুল সিদ্ধান্ত হবে এই যে, শ্রমিকেরা কৃষকদের চেয়ে বেশি সক্রিয় সামাজিক শক্তি।

দেশের পূর্ণ মুক্তির জন্যে, সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্যান্যের চেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংগ্রামশীল সামাজিক শক্তি হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর অনেকগুলি স্পষ্টপ্রতীয়মান বিশেষক উপাদান থাকা সত্ত্বেও, বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণী এখনও নেতা হয়ে ওঠে নি, তার কয়েকটা কারণ আছে। এশিয়ার কোন কোন দেশে শ্রমিক শ্রেণী এখনও রয়েছে গড়ে ওঠার পর্বে, একথা আফ্রিকার ক্ষেত্রে আরও বেশি খাটে। অন্যান্য যেসব দেশে শিল্পোন্নয়নের মাত্রা এমন হয়েছে যাতে সংখ্যার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত শ্রমিক শ্রেণী রয়েছে সেসব দেশেও অনেক সময়ে এখনও শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় মাত্রায় সংগঠন এবং অভিজ্ঞতা আর সুযোগ্য নেতৃত্ব নেই। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা পড়তে কিংবা লিখতেও জানে না। সমগ্রভাবে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রমিকদের হাতে নেবার পথে এই সমস্ত উপাদান গুরুতর অন্তরায়।

জাতীয় বুর্জোয়াদের এবং বুদ্ধিজীবিসমাজের উঁচু মাত্রায় রাজনীতিক সক্রিয়তার কথা এ ব্যাপারে বিবেচনায় থাকা দরকার, এদের কর্মিদলও আছে, রাজনীতিক অভিজ্ঞতাও আছে, কাজেই, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতির সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে তারা যেমন বেশি ইচ্ছুক, তেমনি আরও বেশি যোগ্য। জাতীয় বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতার প্রবণতা আছে, সেটা একবার বলা হয়েছে। এই প্রবণতার দরুন তাদের নেতৃত্বের গুণ ক্ষুণ্ণ হয়; এই

নেতৃত্বে যথোপযুক্ত দৃঢ়তা এবং একনিষ্ঠতা থাকে না। এই কারণেই এশিয়া আর আফ্রিকার কোন কোন দেশে রাজনীতিক নেতৃত্ব গেছে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের হাতে, তারা জাতীয় বুর্জোয়াদের চেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী কর্মনীতি অনুসরণ করে, আর তার উপর, অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের যথেষ্ট স্পষ্ট জাতীয় কর্মসূচিও তারা তুলে ধরতে পেরেছে। কোন উন্নয়নশীল দেশে শ্রমিক শ্রেণী এখনও সমগ্র জাতির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রণ্টের নেতা হয়ে উঠতে না পারলেও, ভবিষ্যতে সে নেতৃত্ব তাদের গ্রহণ করা বন্ধ হয়ে যায় না।

এশিয়া আর আফ্রিকার বেশ কয়েকটা দেশে শ্রমিক শ্রেণী অংশগ্রহণ না করলে এবং উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে তারা যে দৃঢ়সংকল্প লড়াই চালিয়েছিল সেটা না হলে রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জিত হত না, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবার মতো পর্যাপ্ত বাস্তব প্রামাণিক তথ্যাদি রয়েছে। কৃষককুল জাতীয়-ঔপনিবেশিক বিপ্লবের প্রধান শক্তি, তাদের কার্যকরণ চলে নিজেদের উদ্যোগে, কিংবা সমাজের অন্যান্য স্তরের পরিচালনাধীনে, তেমনি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংগ্রামী বৈপ্লবিক বাহিনীর দুঃসাধ্যসাধক শক্তি হয় শ্রমিক শ্রেণী, তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি, কিন্তু তাদের সাহসী প্রচেষ্টা ছাড়া জয়লাভ করা যায় না।

এশিয়ার বেশির ভাগ দেশে এবং আফ্রিকার অনেক দেশে একটা সম্প্রসারণশীল স্তর হল কারিকর আর ছোট দোকানদাররা। আগেই বলা হয়েছে যে, শহুরে পেটি বুর্জোয়াদের বলা যায় জাতীয় বুর্জোয়াদের সবচেয়ে বামপন্থী অংশ, তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে মেহনতীদের সঙ্গে। উদ্ভবের দিক দিয়ে দেখলে, এই শহুরে পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হল **বুদ্ধিজীবিসমাজ।**

শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার, ছোটখাটো কর্মকর্তা, ছাত্র আর ফৌজী অফিসারদের নিয়ে বুদ্ধিজীবিসমাজ। লোকসংখ্যার এই অংশটার যথেষ্ট স্পষ্ট কোন শ্রেণী-স্বার্থ নেই, এরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে খুবই সক্রিয়। সেটা কেন হয় তা সহজেই বোঝা যায়। ঔপনিবেশিক রাজের অধীনে স্থানীয় জাতীয় বুদ্ধিজীবীরা হয় নিজেদের দক্ষতা খাটাবার অতি সীমাবদ্ধ সুযোগ পায়, নইলে স্বাধীন জীবনযাত্রা চালাতেই পেরে ওঠে না। রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জিত হবার আগে সরকারী যন্ত্রে প্রধানত উপনিবেশভোগী দেশ থেকে ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ

করা হত। সিভিল সার্ভিসে ছোটখাটো পদ পেয়েই স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের সন্তুষ্ট থাকতে হত।

জাতীয় বুদ্ধিজীবিসমাজ যে মুক্তি-সংগ্রামে খুবই সক্রিয় অংশগ্রহণ করল এটা স্বাভাবিকই: উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে জয় হলে এবং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হলে, একমাত্র তবেই বুদ্ধিবৃত্তি খাটাবার ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্মীরা ব্যাপক পরিসরে কাজ পেতে পারে, তাদের জীবিকা নিশ্চিত হয়।

কতকগুলি দেশে জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটা ঘটনা হল -- এই প্রথম **সামরিক বুদ্ধিজীবীরা** (অফিসারেরা) বিশিষ্ট ভূমিকায় এল। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সামরিক অফিসারদের প্রধান অংশটা উপনিবেশভোগী দেশে সামরিক শিক্ষা পাওয়া লোক। বহু অফিসারের রাজনীতিক সহানুভূতি আর মেজাজ কিছু পরিমাণে সেই প্রভাবে গড়ে ওঠে। তবে, বৈদেশিক পরিচালনাধীনে ঔপনিবেশিক সৈন্যবাহিনীতে সামরিক কাজের একটা দ্বৈত, স্ববিরোধী প্রভাব পড়ে।

দেশীয় অফিসারেরা নিজেদের কম সুযোগসুবিধা পাওয়া অবস্থা সম্বন্ধে প্রখরভাবে অবহিত ছিল, তাদের হুকুম নিতে হত বিদেশীদের কাছ থেকে, ঐ বিদেশীরা অবজ্ঞার মনোভাব গোপন করার চেষ্টাও করত না। বৈদেশিক ঔপনিবেশিক সৈন্যবাহিনীতে এই দেশীয় অফিসারদের কাজে অগ্রসর হবার কোন সুযোগ-সম্ভাবনা ছিল না— তার কারণ, পরিচালনার সমস্ত উচ্চতর পদ আর অনুযায়ী মর্যাদা কেবল উপনিবেশবাদীদের জন্যেই পৃথক করা থাকত।

শেষে, সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতির একটা হাতিয়ার হিসেবে ঔপনিবেশিক সৈন্যবাহিনীগুলিকে ব্যবহার করার ঘটনাটাই দেশীয় অফিসারদের মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়েছে। দুটো বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বসম্পন্ন অংশকে তাদের স্বদেশভূমি থেকে বহু দূরবর্তী বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাঠানো হয়েছিল। অবশ্য এটাও অফিসার আর সৈনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃততর করতে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল --- কেননা, অন্যান্য দেশে মানুষের জীবন কেমন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কোথায় শক্তিশালী, আর কোথায় তারা ভেদ্য, এসব দেখবার সুযোগ তাদের হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আপত্তি বেড়ে উঠছিল — তাতে এই অফিসারেরা অংশীদার না হয়ে পারে নি। বিভিন্ন গুপ্ত চক্র সংগঠিত

হল, সেখানে বিভিন্ন রাজনীতিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হত, জাতীয় মুক্তির জন্যে লড়াই করবার প্রয়োজনবোধ প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকল।

সামরিক সংগঠনের ব্যবস্থাটাই ষড়যন্ত্রের অনুকূল, সেটা বিপ্লব-মনোভাবাপন্ন অফিসারদের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা আর যোগাযোগের অনুকূল হল।

এশিয়া আর আফ্রিকার অনেক দেশে সামরিক বুদ্ধিজীবীদের গুপ্ত দেশপ্রেমিক চক্রগুলি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে ফলপ্রদ রূপে সংগঠিত কেন্দ্র হয়ে উঠল।

অন্য দিকে, অফিসারদের এইরকমের সংগঠনগুলি অনিবার্যভাবেই কিছুটা অমিশুক ছিল, সাধারণত লোকসংখ্যার অন্যান্য সমষ্টির সঙ্গে তাদের উপযুক্ত যোগাযোগ থাকত না। ফলে, তাদের ক্রিয়াকলাপ প্রায়ই হত নিছক ষড়যন্ত্রমূলক ধরনের। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কিংবা স্থানীয় বিশেষসুবিধাভোগী স্তরগুলির মধ্যে তাদের দালালদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কার্যকরণের পরিকল্পনা তৈরি করবার ব্যাপারে জনগণকে জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামে আকৃষ্ট না করে এই অফিসারেরা নিজেদের সামর্থ্যেরই উপর নির্ভর করত। এর দরুন কখনও কখনও এইরকমের বৈপ্লবিক কার্যকরণের ব্যর্থতা আগেই অবধারিত হয়ে যেত — কেননা, ষড়যন্ত্রকারীদের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাল্পতার ফলে তাদের পরাস্ত করা সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে সহজ হত। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এইরকমের সামরিক গুপ্ত চক্রান্ত যখন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তখনও জনগণের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি আর দোদুল্যমানতা দেখা দিয়েছে। জয়যুক্ত বিপ্লবী অফিসারেরা সঙ্গে সঙ্গে প্রবল স্থানীয় সামাজিক সমর্থন পায় নি, যা তাদের দরকার ছিল, তারা নানা গুরুতর বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছিল; নিঃসন্দেহে এই সবকিছুই সাম্রাজ্যবাদীদের আর তাদের দালালদের সুবিধা করে দিয়েছে এবং ঔপনিবেশিক রাজ আবার কায়েম হবার বিপদ দেখা দিয়েছে।

এশিয়া আর আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হবার পরে জাতীয় সশস্ত্র বাহিনী গড়ার কাজ আরম্ভ হলে অফিসারদের ভূমিকা এক অর্থে আরও বেশি গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠল। উঁচু উঁচু পদে বিদেশীদের জায়গায় ক্রমে দেশীয় অফিসারেরা নিযুক্ত হতে থাকল — যখন ঐসব বিদেশী বাহাল থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করল সেসব ক্ষেত্রেও।

এইভাবে ফৌজ হয়ে উঠল জাতীয় সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ

অবলম্বন। তখন থেকে এই অবলম্বনের নির্ভরযোগ্যতার উপর অনেককিছু নির্ভর করতে থাকল।

জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা আর প্রকৃতি এবং এই রাষ্ট্রের বিকাশের সম্ভাবনার বিষয়ে অফিসারদের মধ্যে মনোভাব বিভিন্ন ছিল নিশ্চয়ই। যেসব অফিসার বৃত্তিগত ট্রেনিং পেয়েছিল উপনিবেশবাদীদের অধীনে, শুধু তাই নয়, উপনিবেশবাদীদের কোন কোন রাজনীতিক মতামত আর মনোবৃত্তিও গ্রহণ করেছিল, তারা রক্ষণপন্থী অবস্থানে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের যেকোন গণতন্ত্রীকরণের এবং সরকারী কাজে জনগণের অবাধ অংশগ্রহণের বিরুদ্ধাচরণ করল। অফিসারদের এই অংশটা স্বভাবতই আগে থেকেই বর্ণ-সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যের মনোভাবাপন্ন ছিল, তাদের মনোভাব আরও প্রবল হয়েছিল, তার কারণ সামাজিক উদ্ভবের সূত্রে তারা বড় বড় জমিদার, উঁচু কর্মকর্তা, অভিজাত, ইত্যাদি বিশেষসুবিধাভোগীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল।

এই বিশেষসুবিধাভোগী শ্রেণীগুলি নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিজেদের অবিসংবাদিত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে বদ্ধপরিকর ছিল, কাজেই, ফৌজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্যে তারা দৃঢ়সংকল্প ছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা ঐসব অফিসারের মধ্যে গণতন্ত্রবিরোধী মনোবৃত্তিতে উৎসাহ দিয়েছিল, তারা জনগণ আর জনগণের বিভিন্ন রাজনীতিক পরিমেল আর প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শক্তিকে দাঁড় করিয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে, এশিয়া আর আফ্রিকার কোন কোন দেশে যে এইসব অফিসারদের পরিচালিত ফৌজ প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তিগুলির হাতে একটা হাতিয়ার হয়ে বিশেষসুবিধাভোগী সংখ্যালঘুদের স্বার্থে বিভিন্ন গণতন্ত্রবিরোধী ষড়যন্ত্র চালাল, এতে তেমন আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তবে, অফিসারদের একটা অংশ গণতন্ত্রবিরোধী মনোবৃত্তি গ্রহণ করে নি, তার কারণ বহু অফিসারই উপরে-উল্লেখিত বিশেষসুবিধাভোগী গ্রুপগুলির লোক নয়। শহুরে আর গ্রামাঞ্চলের মেহনতিদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তারা অনেকেই। এইসব দেশভক্ত অফিসার জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ছিল; আগামী বছরের পর বছর তাদের দেশ সামাজিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনগ্রসর হয়ে পড়ে থাকবে এমন ভবিষ্যৎ মেনে নেবার কোন অভিপ্রায় তাদের ছিল না। জাতীয় রাষ্ট্রটিকে আরও

শক্তিশালী করার এবং রাষ্ট্রের প্রগতিশীল বিকাশ ত্বরান্বিত করার উপায়-উপকরণ সম্বন্ধে তারা অনেকেই বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিল।

জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের অন্য যেকোন অংশের চেয়ে বেশি সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত বলে কতকগুলি দেশে অফিসারেরাই বিশেষসুবিধাভোগী গ্রুপগুলির লালসায় ধিক্কার দিয়ে বিভিন্ন সুদূরপ্রসারী সামাজিক এবং আর্থনীতিক সংস্কার আরম্ভ করল। জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণত উদাসীন বড় বুর্জোয়াদের মোকাবিলা করার জন্যে এবং পুরন আমলাকুলের মধ্যে দুর্নীতি নির্মূল করার জন্যে অপেক্ষাকৃত বেশি মূলগত সংস্কারকামী অফিসারেরা জরুরী ব্যবস্থাবলি অবলম্বন করার দাবি জানাল। কোন কোন ক্ষেত্রে, ব্যাপক জনগণের সমর্থিত কিংবা সেই সমর্থন ছাড়াই অফিসারদের এইরকমের কার্যকরণের ফলে বিভিন্ন তীব্র আভ্যন্তরিক রাজনীতিক সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। প্রামাণিক বিবরণীতেই লিপিবদ্ধ আছে যে, এশিয়া আর আফ্রিকার কোন কোন দেশে যেসব রাষ্ট্রনায়ক সন্দেহভাজন হয়ে পড়েছে, কিংবা যথেষ্ট কর্মশক্তি দেখাতে পারে নি, তাদের উচ্ছেদ করে দেশ শাসনের পূর্ণ রাজনীতিক দায়িত্ব হাতে নিতে অফিসারেরা দ্বিধা করে নি। এইসব ক্ষেত্রে, জাতীয় রাষ্ট্রের প্রগতিশীল বিকাশে যাতে কোন লালসাগ্রস্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রতিবন্ধ হতে না পারে তারই জন্যে দৃঢ়সংকল্প হয়ে জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি হিসেবে অফিসারেরা কাজ করেছে।

একটা সত্তা হিসেবে অফিসারেরা জাতীয় বুদ্ধিজীবিসমাজের একটা বিশেষ অংশ, জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের অন্যান্য অংশের চেয়ে তারা বেশি সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত, কিন্তু, তারা যেমন অবস্থায় আছে তাতে তারা কোন বেশি সময় ধরে স্বাধীনভাবে জাতীয় কর্মনীতি রচনা করতে পারে না। যেকোন ফৌজ কোন গুরুত্বসম্পন্ন সামাজিক স্তর কিংবা শ্রেণীর কর্মনীতির হাতিয়ার হয়ে পড়ে, এটা অনিবার্য। এর থেকে বোঝা যায়, ঘটনাক্ষেত্রে কেন ফৌজ কোন কোন দেশে হল সক্রিয় বৈপ্লবিক উপাদান, আর অন্যান্য দেশে হল একটা প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তি।

দেশভক্ত, বিপ্লবী ফৌজের যেসব নেতা আরও বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তারা পুরোপুরি জানে যে, ফৌজ একলাই বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনীতিক লক্ষ্য সাধন নিশ্চিত করতে পারে না। জনগণের মধ্যে, লোকসংখ্যার মেহনতী স্তরে ফৌজের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া চাই, তাদের সক্রিয় সাহায্য

ছাড়া দেশের পূর্ণ রাজনীতিক স্বাধীনতা আর সামাজিক প্রগতির জন্যে সংগ্রামে ফৌজ কোন লক্ষণীয় ফল পেতে পারে না। মিসরী আরব প্রজাতন্ত্র, বর্মা এবং আরও কোন কোন দেশের অভিজ্ঞতা তার দৃষ্টান্ত।

এশিয়ায় আর আফ্রিকায় এখন যেসব প্রগাঢ় সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে সেগুলির উপযুক্ত মূল্যায়ন করতে হলে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় থাকা দরকার। মূল সামাজিক শ্রেণীগুলি -- কৃষক, বুর্জোয়া এবং শ্রমিকের মতো যথাযথভাবে নির্দিষ্ট শ্রেণী নয় বলে জাতীয় বুদ্ধিজীবিসমাজ (তার মধ্যে সামরিক বুদ্ধিজীবীরাও) কোন একই মতাদর্শে চিরকালের মতো অবিচলিত থাকে না। তাদের রাজনীতিক আর মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গিতে কখনও কখনও বড়রকমের পরিবর্তন ঘটতে পারে, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির চাপে তাদের মধ্যে নতুন নতুন ঝোঁক দেখা যায়।

যেমন, আমরা দেখেছি, মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে আগে থেকেই ফৌজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত প্রগতিশীল নেতাদের ক্রমে দৃঢ়প্রত্যয় এসেছিল যে, জাতীয় বুর্জোয়ারা* তাদের লালসার প্রবৃত্তিগুলোকে সামলাতে পারে না। ধন-সম্পদের জন্যে আকাঙ্ক্ষা, রাষ্ট্রের স্বার্থ কিংবা জাতীয় অর্থনীতি দৃঢ়তর করবার প্রয়োজন সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে যতখানি সম্ভব আত্মসাৎ করার এই তাগিদ গুরুত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগত পুঁজির ক্রিয়াকলাপের বিশেষক উপাদান ছিল। বহু ক্ষেত্রেই, স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে নিজেদের পুরন কর্তৃত্বের অবস্থানে আবার কায়েম হবার উদ্দেশ্যে এই রাষ্ট্রের আর্থনীতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নাশকতামূলক কার্যকলাপের সঙ্গে হাতধরাধরি করে চলেছিল জাতীয় বুর্জোয়াদের ঐ আচরণ। এইসব ঘটনার মধ্যে দেখা গেল, জাতীয় বুর্জোয়ারা চূড়ান্ত মাত্রায় অস্থিত, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মহলগুলি রাষ্ট্র আর জনগণের জরুরী প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্যে নিজেদের মালিকানার বিশেষাধিকারগুলি ত্যাগ করতে নিশ্চিতভাবেই নারাজ, তখন, দেশের যেসব নেতা সামাজিক প্রগতির তরফে তাদের সঙ্গে যুক্ত প্রচেষ্টা সম্ভব হবে বলে গোড়ায় স্পষ্ট-নির্দিষ্ট আশা পোষণ করেছিলেন তাঁরা

---

* বিশেষত, এই জাতীয় বুর্জোয়াদের সবচেয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী দক্ষিণপন্থী অংশ, যাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় বড় বড় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির মতাবস্থান।

নিরাশ হলেন, এটা খুবই বোধগম্য ব্যাপার। তার পরে মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্বের রাজনীতিক এবং সাধারণ দার্শনিক ধারণাগুলির ক্রমবিকাশ ঘটল।

জাতীয় অর্থনীতি গড়ার কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যে মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্ব মেহনতী জনগণের উদ্দেশে, শ্রমিক আর কৃষকদের উদ্দেশে আহ্বান জানাল। লোকসংখ্যার ব্যাপক অংশের ইচ্ছা প্রতিফলিত করতে পারে এমন একটা রাজনীতিক সংগঠন স্থাপন করার অত্যাবশ্যকতা দেখা দিল। সামাজিক গঠনকাজের ক্রমাগত অধিকতর মূর্ত-নির্দিষ্ট, স্পষ্ট কর্মসূচির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্বের রাজনীতিক চিন্তাধারায় একটা গুরুত্বসম্পন্ন পরিবর্তন ঘটে গেছে, এই পরিবর্তন সম্পূর্ণতই দেশের জাতীয় স্বার্থ এবং জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী।

এখানে একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল যেখানে ক্রমে ক্রমে কিন্তু নিষ্পত্তিমূলক পরিবর্তন ঘটেছে সঠিক দিকে — বলা যেতে পারে, আরও ভালর দিকে। তবে, ঐতিহাসিক বিবরণী থেকে দেখা যাচ্ছে, পশ্চাদগামী প্রক্রিয়াও সমানই সম্ভব — তাতে আগে-ঘোষিত প্রগতিশীল মতামতের জায়গায় এসে যায় প্রতিক্রিয়াপন্থী ধরনের মতামত। যখনই শাসক মহলগুলির মধ্যে আসে জনগণ থেকে নিজেদের পৃথক করে রাখার ঝোঁক, আর একমাত্র সমাজের বিশেষাধিকারভোগী স্তরগুলির উপর নির্ভর করার ঝোঁক, তখনই, কার্যত এমন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, রাজনীতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক মতামত পরিবর্তিত হয় — যাতে, বলা যেতে পারে, মোড় ঘুরে যায় আরও খারাপের দিকে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণত, গণতন্ত্রীদের জোর করে দমন করা হয়, প্রগতিশীল সংগঠনগুলি নিষিদ্ধ হয়, এইসব সংগঠনের নেতাদের উপর নির্যাতন চলে। যেমন ইন্দোনেশিয়ায় — রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াপন্থী ধারাটা জয়লাভ করলে রাজনীতিক প্রতিপক্ষীয়দের নৃশংসভাবে পাইকারী হারে নিশ্চিহ্ন করা হল, নিষেধাজ্ঞা জারি হল প্রগতিশীল প্রকৃতির সামাজিক-আর্থনীতিক সাহিত্যের উপর শুধু নয়, উপন্যাসের উপরও, তার মধ্যে এমনসব চিরায়ত সাহিত্য যেগুলি ক্ষমতাসীন শাসক মহলগুলির মতে মতাদর্শের দিক দিয়ে 'নাশকতামূলক'।

ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে, সামাজিক প্রগতির জন্যে চাই প্রশাসনের রাজনীতিক আর সামাজিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ এবং সরকারী কাজে

ব্যাপকভাবে জনগণের অংশগ্রহণ। সামাজিক প্রগতি জনগণের স্বার্থের অনুযায়ী। কাজেই, জনগণের অংশগ্রহণ করা ছাড়া, জনগণের থেকে আড়ালে কোন সামাজিক প্রগতি হতে পারে না।

গণতন্ত্রীকরণ নিষ্পন্ন হবে কিভাবে, সেটা অবশ্য অন্য জিনিস। কোন দেশের বিদ্যমান অবস্থা, সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের মাত্রা এবং লোকসংখ্যার সাক্ষরতার উপর সেটা নির্ভর করে। এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক শাসনতন্ত্র খুবই বিভিন্ন। কোন কোন দেশে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি রাজনীতিক জীবনে সক্রিয় উপাদান হতে পারে, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করতে পারে, কিংবা তার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব খাটাতে পারে। আবার, অন্য কোন কোন দেশে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির অমন ক্রিয়াকলাপের সুযোগ আছে সামান্যই কিংবা একেবারেই নেই। জনসাধারণের মধ্যে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা অনৈক্যই জাতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপদ ঘটায়, এটা প্রতিপন্ন হয়েছে; যেখানেই রাজনীতিক নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত গণ্ডিবদ্ধ সামাজিক গ্রুপের একচেটিয়া দখল বসে সেখানেই ঐ অনৈক্য থাকে। ক্ষমতা এইভাবে কেন্দ্রীভূত হলে একটা সংখ্যালঘু অংশ বিশেষাধিকার পেয়ে যায়, তার ফলে ঐ অংশটা কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে; সামাজিক প্রগতি ঘটাবার জন্যে জনগণের মধ্যে নিহিত সৃজনশীল কর্মশক্তির পূর্ণতম মাত্রায় সদ্ব্যবহারের সম্ভাবনা রহিত হয়ে যায়।

উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতীয় সংহতি রোধ করার জন্যে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন আভ্যন্তরিক বিরোধের দরুন নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, এইসব বিরোধ অনেক সময়ে আভ্যন্তরিক ব্যাপারে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সুবিধাজনক অজুহাত হয়।

সমাজের বিভিন্ন অসমসত্ত্ব স্তরের বিশেষ বিশেষ স্বার্থ যখন প্রায়ই পরস্পরবিরোধী, যখন সেইসব স্বার্থের মধ্যে সংঘাতের প্রবণতা থাকে, সেক্ষেত্রে সমস্ত জাতীয় শক্তির ঐক্য আসতে পারে কতখানি, আর সে ঐক্যের রকমই বা কি হতে পারে? এই প্রশ্নটাকে খুঁটিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার।

এই সব বিভিন্ন সামাজিক স্তরের পৃথক পৃথক রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক স্বার্থের যাবতীয় বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সবারই থাকে একটা

অভিন্ন স্বার্থও, সেটা তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়ক হয়, এটা তো বাস্তব ব্যাপার।

সেটা হল, সর্বোপরি, জাতীয় স্বাধীনতা বজায় রাখা এবং দৃঢ়তর করার কামনা। ঔপনিবেশিক শাসন আবার কায়েম হতে দেওয়া চলবে না, এটা জনগণের, সমস্ত মেহনতী মানুষের (কৃষক, শ্রমিক, কারিকর, বুদ্ধিজীবী) স্বার্থেই কেবল নয়; কোন কোন বাস্তব কারণে সেটা জাতীয় বুর্জোয়াদেরও স্বার্থে, তার থেকে বাদ যায় অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন দুর্নীতিপরায়ণ একাংশ, যারা বৈদেশিক পুঁজির সঙ্গে সরাসরি বাঁধা। এরই সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বতঃপ্রতীয়মান যে, জাতীয় স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে একমাত্র যদি রাষ্ট্রক্ষমতার বনিয়াদ হয় জনসমর্থন, এই জনসমর্থনের মাত্রা যেকোন ক্ষেত্রে এতখানি হওয়া চাই যাতে বাইরের কোন বিপদের মুখে, যেকোন, স্বৈরাচরণের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কিনা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কোন বিপদ সৃষ্টি করলে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র রুখে দাঁড়াতে পারে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক বিচারে বিসদৃশ বিভিন্ন সামাজিক শক্তিও কোন কর্মসূচি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, এই কর্মসূচির বনিয়াদ হল জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, তেমনি, জনসমর্থনের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে যে রকমের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে প্রগতিশীল কর্মনীতি অনুসরণ করা হয় সেই রকমের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতি সমর্থনের প্রয়োজনটাকে মেনে নেওয়াও সেই কর্মসূচির বনিয়াদ।

এই রকমের রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রকৃতি নির্ধারণ করার সময় এলে — ব্যাপক জনগণের চাহিদা এবং ইচ্ছা মেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রগতিশীল ব্যবস্থাবলির পরিধি নির্ধারণ করার সময় এলে অবশ্য মতভেদ দেখা দেবেই।

তবু, অভিন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মতাবস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মধ্যে কিছু পরিমাণ সহযোগিতার কাঠামের মধ্যে ঐসব সমস্যা নিয়ে আলোচনাদি চলতে পারে। ব্যক্তিগত কারবার এবং শোষণের স্বাধীনতার পুঁজিতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রতি যাবতীয় অনুরাগ সত্ত্বেও জাতীয় বুর্জোয়াদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতারা এটা না দেখে পারেন না যে, নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির আর্থনীতিক অনগ্রসরতা অতিক্রম করতে হলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। পুঁজিতান্ত্রিক বাজারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রধান প্রধান একচেটিয়া কার্টেলগুলির নির্দেশেই

কাজ চলে, তারাই কার্যত সবকিছু চালায়, — উন্নয়নশীল দেশগুলি যতকাল এই পুঁজিতান্ত্রিক বাজারের অরাজকতার পরিধির মধ্যে থাকে ততকাল তাদের নবার্জিত স্বাধীনতা কখনও বিপদ থেকে মুক্ত হয় না। রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিল্পোৎপাদনের গড় বার্ষিক বৃদ্ধি বেশকিছুটা সম্প্রসারিত হলেও, ঐ প্রসার বর্তমান হারে চললে শিল্পোৎপাদনের মোট পরিমাণের দিক দিয়ে প্রধান প্রধান পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নাগাল ধরতে তাদের সময় লাগবে গোটা এক শ' বছর। এমন সুদীর্ঘকাল ধরে পিছিয়ে পড়ে থাকলে প্রকৃতপক্ষে তার অর্থ দাঁড়াবে উন্নয়নশীল দেশগুলির সমানে সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকা, কিন্তু, কি মেহনতী জনগণ, কি বিত্ত-সম্পদশালী শ্রেণীগুলি, অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়ারা, কেউই সেই অদৃষ্ট মেনে নিতে কখনও রাজি হবে না। এইভাবে দেখা যাচ্ছে, ঐ ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া এবং আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আরও বেশি কার্যকর, আরও বেশি দ্রুতগামী উপায় বের করবার চেষ্টা হবার বিভিন্ন বাস্তব কারণ রয়েছে। আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কর্মসূচি রূপায়িত করার জন্যে সহযোগিতার বাস্তব সম্ভাবনাও রয়েছে।

আবারও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা দরকার যে, সামাজিক বিচারে বিসদৃশ বিভিন্ন দেশপ্রেমিক স্তরগুলি যদি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হয় একমাত্র তবেই তাদের মধ্যে সুফলপ্রসূ সহযোগিতা চলতে পারে, এই গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সমস্ত অংশীদারের যথার্থ সমানাধিকার; যেকোন রকমের হুকুমদারি, রাজনীতিক ক্ষমতায় যেকোন রকমের একচেটিয়া বাতিল হওয়া চাই।

এর অর্থ হল দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির একটা কোআলিশন বা সম্মিলনী, যারা দীর্ঘস্থায়ী রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্যে জনগণের সৃজনশীল উদ্যোগ ব্যবহার করতে সক্ষম। এটা তো বোঝাই যায় যে, বিভিন্ন অসদৃশ সামাজিক শক্তির এই রকমের মৈত্রী এর কোন একটা শক্তির একনায়কত্ব হতে পারে না, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের কোন স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রশ্নই উঠতে পারে না।

অন্যদিকে, বিভিন্ন প্রগতিশীল জাতীয় কর্মনীতির বিরুদ্ধে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির ভিতরে তাদের প্রতিক্রিয়াপন্থী দালালদের (প্রাক্তন সামন্ততন্ত্রীরা, বিভিন্ন দুর্নীতিপরায়ণ

অংশ, ইত্যাদি) দাঁড়াবার যে প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে সেটাও বিবেচনায় থাকা দরকার। কাজেই, চক্রান্ত-বলে ক্ষমতাদখল সমেত বিভিন্ন নাশকতামূলক কার্যকলাপের আশঙ্কা সর্বক্ষণই রয়েছে, এই অবস্থার সম্মুখীন রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বকে প্রবল ক্ষমতা খাটানো দরকার এবং অমন যেকোন কার্যকরণ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্যে প্রস্তুত থাকা দরকার। শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক প্রকৃতি যত প্রবল হবে, স্বভাবতই, ঐ শাসনব্যবস্থা জনসমর্থন জাগিয়ে তুলে ততই বেশি যোগ্যতার সঙ্গে যেকোন প্রতিক্রিয়াশীল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এখনকার **প্রতিক্রিয়াপন্থী বিরোধিতা** সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে, সেটা কাদের সমর্থনের উপর নির্ভর করে সেইসব সামাজিক শক্তির নিশানাদিহি করার চেষ্টা করা দরকার। ঐসব শক্তি বিভিন্ন হলেও, এর বেশির ভাগ দেশে কৃষিসংস্কারের ফলে বিশেষাধিকারভোগী জমিদারী মালিকানার পুরন ব্যবস্থাটার বিপর্যয় ঘটেছে: কার্যত সর্বত্রই জমিদারেরা আর কর্তৃত্বশালী শক্তি নয়। এতে একমাত্র ব্যতিক্রম হল অল্প কয়েকটা রাষ্ট্র, যেমন, সৌদী আরবদেশ, এই রাষ্ট্রগুলিতে ধর্মের দোহাই দিয়ে পরিচালিত সামন্ততান্ত্রিক রাজগুলি তাদের তৈলক্ষেত্রগুলিতে মার্কিন একচেটিয়া কারবারগুলিকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে, তারা বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে প্রকাশ্যে জোটবদ্ধ হয়েছে।

তবে, জমিদারেরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি, অন্যান্য সামাজিক স্তরের মধ্যে তারা মিলেমিশেও যায় নি। বহু দেশে এখনও বিভিন্ন প্রাকপুঁজিতান্ত্রিক ধরনের ভূমিসত্ব রয়েছে — যদিও আগের চেয়ে কম পরিসরে। ভূমিসংস্কার আইনগুলিতে সাধারণত কোন ব্যক্তি যে পরিমাণ জমির মালিক হতে পারে তার সর্বোচ্চ মাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে এই সর্বোচ্চ মাত্রাটা কৃষকের জোত-জমির গড় পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি, এতে ছোট এবং মাঝারি আয়তনের জমিদারি, তালুক, ইত্যাদি বজায় থেকে যায়। যেমন, ফিলিপাইনে ব্যক্তিগত-মালিকানাধীন জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধা হয়েছিল ৭৫ হেক্টর, কিন্তু সেখানে কৃষকের জোত-জমির গড় পরিমাণ ৩ হেক্টর।

এর অর্থ হল জমিদারি রয়েছে। তবে, তাদের আর্থনীতিক গুরুত্ব কমে গেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে, জমিদার শ্রেণী তার বিশেষ রাজনীতিক অধিকারগুলো হারিয়েছে, এইভাবে, আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়ার শক্তির প্রধান

অবলম্বন হিসেবে জমিদার শ্রেণীর যে ভূমিকা ছিল সেটা আর নেই। এশিয়া এবং আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশে সরকারগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রাধান্য থাকার ফলে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ঐভাবে দুর্বল হয়ে পড়া জমিদার শ্রেণীর উপর আর্থনীতিক চাপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে: জমিদারদের বুর্জোয়া ধরনের কারবারিতে রূপান্তরিত করাই ঐ চাপ দেবার উদ্দেশ্য। অনেক উন্নয়নশীল দেশে বহুলাংশে আধা-সামন্ততান্ত্রিক পুরন ভূমি ব্যবস্থার জায়গায় আসছে বুর্জোয়া অর্থনীতি, এটা বহুলাংশে পুঁজিতান্ত্রিক, এতে মজুর খাটানো, উৎপাদনের জন্যে অর্থের যোগান এবং খামারজাত দ্রব্যসামগ্রীর কেনা-বেচা হয় ঠিক পুঁজিতান্ত্রিক কায়দায়।

শহরেও এবং গ্রামাঞ্চলেও জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক অবস্থান আরও মজবুত করতে এটা সহায়ক হয়। কৃষকদের উপর তার প্রভাব ক্রমাগত বেশি বেশি মাত্রায় অনুভূত হচ্ছে; সামাজিক স্তরবিভাগের প্রক্রিয়া চলেছে কৃষকদের মধ্যে। সচ্ছল কৃষকদের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি বুর্জোয়াদের রাজনীতিক প্রভাব সম্প্রসারণের সহায়ক।

জমিদারদের (আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমির মালিক) গুরুত্ব কমে চলার পাশাপাশি দক্ষিণপন্থী জাতীয় বুর্জোয়াদের, অর্থাৎ কিনা, বড় বুর্জোয়াদের গুরুত্ব বাড়ছে, এই বড় বুর্জোয়ারা হয়ে উঠছে মূল প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তি, এদের চারপাশে যাবতীয় সমাজতন্ত্রবিরোধীরা, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত গণতন্ত্রবিরোধীরা। ভারত তার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত — এখানে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রকাশ্য পক্ষপাতী দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক জোটগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণতই জাতীয় বড় বুর্জোয়াদের অবস্থানের অনুযায়ী; এই বড় বুর্জোয়ারা যেকোন মূলগত সামাজিক সংস্কারের বিরোধিতা করে।

যেসব দেশে — বিশেষত আফ্রিকা মহাদেশে — শ্রেণীগত স্তর-ভেদ এখনও যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, সেসব দেশের সামনে পরিস্থিতিটা ভিন্ন। এইসব দেশে, আগেরই মতো, সেকেলে ধরনের সামাজিক সম্পর্কের প্রতিনিধিরা প্রগতিতে বিলম্ব ঘটায় — তারা হল, যেমন, প্রাক্তন উপজাতীয় মোড়লেরা, উপনিবেশবাদীদের প্রতি পুরন আনুগত্যসম্পন্ন পুরন সরকারী আমলারা, বিদেশীদের সঙ্গে কাজ-কারবারে দালালি ক'রে জীবিকানির্বাহ করে এমন হরেক রকমের মুনাফাবাজ, ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক উপনিবেশবাদ

এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাতিন আমেরিকার যুদ্ধোত্তর ঘটনাবলি সম্বন্ধে বিভিন্ন রচনায় মাঝে মাঝে একটা ঝোঁক দেখা যায় — তাতে 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা' আর 'উপনিবেশবাদ' এই দুটো কথার মধ্যে পার্থক্য ধরা হয় না, এই দুটো জিনিসকে একই বলে ধরা হয়। বলা হয়, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেই একই নিরিখে উপনিবেশবাদের অস্তিত্বও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন বলতে কোনক্রমেই উপনিবেশবাদের অবসান বুঝায় না। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জনগণ দেখেছে, তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে, তাদের সদ্য-অর্জিত রাজনীতিক স্বাধীনতা এবং ঔপনিবেশিক রাজগুলির অবসানের ঘটনা বৈদেশিক শোষণ কিংবা আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ধারানিবদ্ধ এবং প্রায়ই অতি রূঢ় ধরনের বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে পারে নি। সাম্রাজ্যবাদীরা যেসব প্রণালীতে এই শোষণ চালায়, এই হস্তক্ষেপ করে, সেগুলিকে তারা এখনকার আন্তর্জাতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, — এই শোষণ এবং এই হস্তক্ষেপ হল সমসাময়িক উপনিবেশবাদ কিংবা নয়া-উপনিবেশবাদের মর্মবস্তু।

এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জনগণের পয়লা নম্বরের শত্রু ছিল এবং এখনও রয়েছে উপনিবেশবাদ, অর্থাৎ, অন্যান্য দেশ এবং জাতিকে অধীনস্থ এবং শোষণ করার কর্মনীতি।

আলোচ্য দেশগুলি যখন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার শক্ত ফাঁসে বাঁধা ছিল তখনকার সঙ্গে তুলনায় এখন উপনিবেশবাদের বিভিন্ন লক্ষ্য আর প্রণালী বেশ খানিকটা বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। এখন কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি

অন্য কোন দেশে আর সরাসরি রাজনীতিক কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারে না, কোন লক্ষণীয় খেসারত ছাড়া ঐ দেশের বৈষয়িক সম্পদ প্রকাশ্যে অপহরণ করতে পারে না। অন্যান্য দেশের রাজনীতিক, আর্থনীতিক এবং আত্মিক জীবনের উপর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ নিয়েই সমসাময়িক উপনিবেশবাদকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে এখন যেসব মূলগত সামাজিক প্রগতি ঘটছে তার বিকাশটাকে সমসাময়িক উপনিবেশবাদের মতলবের পক্ষে উপযোগী খাতে পরিচালিত করার জন্যে তারা চেষ্টা করে। এইভাবে, চিরাচরিত উপনিবেশবাদের সঙ্গে নয়া-উপনিবেশবাদের পার্থক্য হল এই যে, এর বিভিন্ন রকম-ধরন আর পদ্ধতি আরও বহুতর, এর মর্মবস্তু আরও বেশি জটিল।

তবু, এই দুইই মূলত একই। নয়া-উপনিবেশবাদীরা কেন সবসময়েই তাদের অগ্রবর্তীদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে সেটা এর থেকে বোঝা যায়। পালাক্রমে এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জাতীয় স্বার্থ আর সার্বভৌমত্বের উপর সামনাসামনি হিংস্র হানা, আর নমনীয় কুশলী চাল-চলন এবং দালাল নিয়োগ, যা নয়া-উপনিবেশবাদের বিশেষক উপাদান — অর্থাৎ কিনা, ঔপনিবেশিক দেশজয়ের সময়কার অতি ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলিরই পুনরাবৃত্তি।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটা সাধারণভাবে ভেঙে পড়ছে — তবু, এখনও এমনসব এলাকা রয়ে গেছে যেখানে জনসাধারণের জাতীয় স্বাধীনতা নেই, তারা বৈদেশিক শাসনের জোয়াল বয়ে চলেছে। এই অবশিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশগুলির আয়তন এখন মোট ৫০,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার কিংবা পৃথিবীর মোট আয়তনের ৪ শতাংশ, সেগুলিতে লোকসংখ্যা ৩,৭০,০০,০০০ — পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার ১·১ শতাংশ। এই অবশিষ্ট উপনিবেশগুলি পৃথিবীর সর্বত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, — সন্নিহিত বিভিন্ন দেশ আর অঞ্চলে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে উপনিবেশবাদীদের সংগ্রামে এগুলি ঘাঁটি হিসেবে কাজ দেয়।

পাঁচ শতকের বেশি হল পর্তুগাল ঔপনিবেশিক জাতিগুলির উপর লুটতরাজ আর উৎপীড়ন চালিয়ে আসছে। পর্তুগালের উপনিবেশগুলির মোট আয়তন ২০,০০,০০০ বর্গকিলোমিটারের বেশি -- এটা হল খাস পর্তুগালের আয়তনের চেয়ে ২০ গুণ বেশি। ১৯৫১ সালে পর্তুগালের

১ নং সারণী

পুরন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলির বিভিন্ন অবশেষ*

উপনিবেশভোগী শক্তি	উপনিবেশগুলি	
	লোকসংখ্যা (হাজারের হিসেবে)	আয়তন (হাজার বর্গকিলোমিটার হিসেবে)
বৃটেন	১৩,৫০২	২,০৩২·৯
ফ্রান্স	১,৩৬০	১৪৩·৪
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২,৭৬৮	১৩·২
হল্যান্ড	৪৮৬	১৪৪
পর্তুগাল	১২,৯২২	২,০৮৬
স্পেন	৪৮০	২৯৫ · ৭
দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র . .	৫৩৪	৮২৪
অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যান্ড এবং 'যুক্ত-শাসনাধীন'** . . .	২,০৬৪	৪৯০·৩
মোট	৩৪,১১৬	৬,০২৯·৫

* ১৯৬৫ সালের শেষাশেষি যা আয়তন ছিল; লোকসংখ্যা ১৯৬০—১৯৬৪'র হিসেব অনুসারে।

** অর্থাৎ কিনা, দুটো উপনিবেশভোগী শক্তির পারস্পরিক সমঝোতা অনুসারে যুক্তভাবে শাসিত এলাকা।

সংবিধানে একটা সংশোধন করে এই সমস্ত উপনিবেশকে পর্তুগালের বিভিন্ন 'সাগরপারের প্রদেশে' পরিণত করা হয়।

উপনিবেশগুলির উপর ঐতিহাসিক 'অধিকারের' কথা বলতে পর্তুগালের উপনিবেশবাদীরা বড় ভালবাসে। পর্তুগালের একটা উপনিবেশের বড়লাট বৃটিশ সাংবাদিক জন ফিলিপ্‌স্‌কে বলেছিলেন: 'আমরা পর্তুগীজরা আফ্রিকায় আছি খুবই বিশেষ একটা অবস্থানে: ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে প্রথম আমরাই আফ্রিকায় বাস্তু গড়েছি -- ছেড়ে যাব আমরাই সবার

শেষে — তার কারণ, শতকের পর শতক ধরে আমাদের অনেক রক্ত মিশেছে আফ্রিকার রক্তের সঙ্গে। আমরা আফ্রিকার অঙ্গীভূত, আফ্রিকার এই অংশগুলি আমাদের।'*

লিসবন সরকারের চাপা রাখবার চেষ্টা সত্ত্বেও আঙ্গোলা আর মোজাম্বিক, 'পর্তুগীজ' গিনী, সান তোমে আর প্রিন্সিপে'তে আসল হাল সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যাদি একটু একটু করে বেরিয়ে পড়ছে। ১৯০৫ সালে জনৈক বৃটিশ সাংবাদিক নেভিনসন 'পর্তুগীজ' আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। তাঁর লেখা *A Modern Slavery* নামে বইয়ে ব্যাপক পরিসরে জবরদস্তি করে লোক খাটাবার তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় — যে অবস্থার মধ্যে সেটা চলে, ক্রীতদাসত্ব থেকে তার পার্থক্য পাওয়া ভার।** তার পঞ্চাশ বছর পরে আফ্রিকা সম্বন্ধে আরও একজন অধ্যয়নকারী বাসিল ডেভিডসন ঐ রকমেরই সফর করার পরে ১৯৫৫ সালে যে বই প্রকাশ করেছিলেন তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন, পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে স্থানীয় অধিবাসীদের দুর্দশা মূলত অপরিবর্তিতই ছিল। তিনি লিখেছিলেন, আঙ্গোলায় মেহনতী লোকবলের (৩,৭৯,০০০ লোক) প্রায় অর্ধেককে খাটানো হয় জবরদস্তি করে।***

উপনিবেশগুলিতে শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্যে পর্তুগালের সরকার পাঠিয়েছিল হেনরিকে গালভাওকে — তাঁর একটা বিবরণ থেকে নিম্নলিখিত অংশটা বৃটিশ সাপ্তাহিক *New Statesman* পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়েছিল: 'কোন কোন দিক থেকে পরিস্থিতিটা (আঙ্গোলায় — এই লেখকেরা) ডাহা ক্রীতদাসত্বের চেয়ে নিকৃষ্ট। যা-ই হোক না কেন, ক্রীতদাসপ্রথায় স্থানীয় অধিবাসীকে কিনে নেওয়া হয়, যেমন কেনা হয় পশু: ঘোড়া কিংবা বলদের মতো সেও উপযুক্ত অবস্থায় থাকে সেটাই তাদের মালিক চায়। তবে, এখানে স্থানীয় অধিবাসীকে কিনে নেওয়া হয় না — তাকে রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভাড়ায় নেওয়া হয়, যদিও তাকে বলা হয় স্বাধীন ব্যক্তি। তাকে একবার কাজে লাগানো হলে, সে অসুস্থ হয়ে

---

* John Phillips, *Kwame Nkrumah and the Future of Africa*, London, 1960, p. 200.

** Anthony Sampson, *Common Sense About Africa*, New York, 1960. p. 136 দ্রষ্টব্য।

*** Basil Davidson, "The African Awakening": *New Statesman*, Aug. 11, 1961, p. 176.

পড়ল, না, মরে গেল, সেসব মনিব গ্রাহ্য করে না — কেননা, সে অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা মারা গেলে তার মনিব চাইবে আর একজনকে, ব্যস্।'*

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙন আর পতনের নিয়মানুবর্তী প্রক্রিয়াটা থেকে নিজেদের শাসনাধীন ভূখণ্ডগুলিকে সুরক্ষিত করে রাখার চেষ্টায় পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ দমন-পীড়ন, সন্ত্রাস, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা এবং পরিকল্পিতভাবে জোর করে আত্তীকরণের বিভিন্ন হিংস্র ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। তবে, ক্রীতদাসপ্রথা আর বর্বরতা বজায় রাখার জন্যে তাদের চেষ্টা নিষ্ফল হবে সেটা অবধারিত · · কেননা, পর্তুগালের উপনিবেশগুলিতে আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে মনে হয় 'শান্ত অবস্থা' সেটা শেষ হয়ে আসছে। আঙ্গোলায় এবং পর্তুগালের অন্যান্য উপনিবেশে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন প্রবলতর হয়ে উঠছে: উপনিবেশবাদীরা দেশটাকে চালাতে চায় নিজেদের ইচ্ছামতো — তারই পাল্টা-কার্যকরণ হিসেবে ব্যর্থকাম জনগণ ঐ পথ ধরছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের যাকিছু অবশিষ্ট আছে সেটাও দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যেগুলিকে বলা হয় গৌণ উপনিবেশ, কার্যত কেবল সেগুলিই প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসনে রয়েছে — সেগুলিতে মোট লোকসংখ্যা মোটামুটি ১ কোটি ৭০ লক্ষ। মাঝে মাঝে বলপ্রয়োগের জোরে এখনও বৃটেনের কর্তৃত্বে রয়েছে ওমান, বাহ্‌রেন এবং দক্ষিণ আরবদেশের আরও কয়েকটা ছোট নৃপতিশাসিত রাজ্য। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এবং বিভিন্ন সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন কাঁচামালে সমৃদ্ধির জন্যে এই ভূখণ্ডগুলি বিভিন্ন বিমানঘাঁটি এবং নৌঘাঁটির কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতিও বৃটিশ শাসনাধীন ছিল এডেন -- এই এডেন প্রায়ই ব্যবহৃত হত দক্ষিণ আরবদেশে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের উপর আঘাত করার জন্যে। ওমানে সশস্ত্র হানা

* *New Statesman*, Aug. 11, 1961, p. 176. ঐ বিবরণে আরও বলা হয়েছিল যে, 'বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে যথার্থই রেহাই পায় কেবল মৃতেরা... আফ্রিকানদের দশা হয়। ক্রীতদাসত্বের চেয়ে অনেক খারাপ... কোন কোন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মধ্যে মৃত্যু-হার এমনকি ৩০ শতাংশ, কিন্তু একের বদলে অন্য শ্রমিক সংগ্রহ করতে কোন অসুবিধা নেই।' ১৯৬৭ সালের ২৯শে জানুয়ারি তারিখের *The Observer* দ্রষ্টব্য। খুবই সমালোচনামূলক এই বিবরণ প্রচার করার জন্যে ক্যাপ্টেন হেনরিকে গালভাও-এর উপর তিন বছরের কারাদণ্ডাদেশ হয়েছিল। অ্যান্টনি স্যাম্পসনের উল্লেখিত রচনায় পৃঃ [illegible] দ্রষ্টব্য।

এবং ইয়েমেনের বিরুদ্ধে বিপদ সৃষ্টি করে রাখার একটা ঘাঁটি হিসেবে এটা কাজ দিত; আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার বাজে অজুহাত দেখিয়ে কেনিয়া, টাঙ্গানাইকা এবং উগান্ডায় ফৌজ পাঠানো হত এখান থেকে।

বিভিন্ন ঔপনিবেশিক শক্তির বিভিন্ন কর্মনীতি এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্যের অস্তিত্ব সংক্রান্ত বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে বৃটিশ ঔপনিবেশিক কর্মনীতিগুলি উল্লেখিত হয়েছে। আর. জে. হ্যারিসন চার্চ লিখেছেন: 'পশ্চিম আফ্রিকায় বৃটিশ রাজনীতিক লক্ষ্যগুলি স্পেন, পর্তুগাল এবং ফ্রান্সের লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ অসদৃশ। এই তিনটি শক্তি তাদের অঞ্চলগুলিকে উপনিবেশভোগী দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক সম্মিলনে যুক্ত করতে চেয়েছে। পর্তুগালের অঞ্চলগুলি হল পর্তুগালের সাগরপারের প্রদেশ, ফরাসী অঞ্চলগুলি হল ফ্রান্সের সাগরপারের প্রদেশ। এইসব উপনিবেশভোগী দেশের সংস্কৃতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি এমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত যাতে আফ্রিকার যত বেশি সম্ভব মানুষ শাসক শক্তিটির আত্তীকৃত হয়ে যেতে কিংবা, অন্তত, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং অভিন্ন হতে পারে।'*

বিভিন্ন ঔপনিবেশিক শক্তির কর্মনীতিগুলির মধ্যে কোন কোন পার্থক্য আছে সেটা স্বীকার্য। উপরে উল্লেখিত লেখক খুব ঠিকই বলেছেন যে, ফরাসী উপনিবেশবাদীরা আফ্রিকার মানুষকে ফরাসী করে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। আলজিরিয়ার মানুষকে ফরাসীতে এবং আলজিরিয়াকে ফ্রান্সের একাংশে পরিণত করার জন্যে তারা সাড়ে সাত বছর ধরে আলজিরিয়ায় সর্বাত্মক বিধ্বংসী যুদ্ধ চালিয়েছিল। এটা মূলত সেই একই আত্তীকরণের কর্মনীতি, যা রয়েছে তথাকথিত 'ফরাসী গোষ্ঠীর' মূলে, — এই 'গোষ্ঠী'র উদ্দেশ্য ছিল পুরন ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যটাকে নতুন রাজনীতিক ভেক ধরানো। অন্যদিকে, বৃটেন তার উপনিবেশগুলির সঙ্গে বিস্তৃত আর্থনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর আরও বেশি জোর দিয়েছিল এবং স্থানীয় অধিবাসীদের কোন কোন অংশকে নিজের সমর্থক করে তুলে স্থানীয় শাসকদের কিছু পরিমাণ স্বাধীনতা দিয়েছিল — সেটা ছিল বৃটেনের 'পরোক্ষ শাসনের' কর্মনীতি অনুযায়ী।

---

* R. J. Harrison Church, *West Africa. A Study of the Environment and of Man's Use of It.* London, New York, Toronto, 1957, p. 181.

বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঔপনিবেশিক কর্মনীতির মধ্যে পার্থক্য এবং বিশেষ উপাদানগুলি কেবল বিভিন্ন পৃথক দফার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট — প্রধান সারবস্তু কিংবা মর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

এই যুদ্ধোত্তর কালপর্যায়ে পুরন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলো অবিরত ভেঙে পড়ছে — তার থেকেই কিন্তু এমনটা দাঁড়াচ্ছে না যে, এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় ক্ষমতা আর প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর কিংবা তার লাগাও বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন মজবুত কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করছে না। এদিক দিয়ে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র — তার ফলে কতকগুলি দেশ এখনকার মার্কিন উপনিবেশবাদীদের দখলাধীন অঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তার কয়েকটা নমুনা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

ইন্দোচীনের জাতিগুলির একনিষ্ঠ জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐ অঞ্চলে ফরাসী ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অবসান ঘটেছিল। ইন্দোচীন সংক্রান্ত ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তিতে ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান বিধিবদ্ধ হল — অন্যান্যের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামেও। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আগে থেকেই সেখানে হাজির ছিল, — ভিয়েৎনামী জনগণের বিরুদ্ধে 'নোংরা যুদ্ধে' ফরাসী উপনিবেশ-বাদীদের সাহায্য করার পরে; ফ্রান্সের পরাজয়ের সুযোগে তারা অন্যান্য সমস্ত শক্তিকে বাদ রেখে সেখানে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করল। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষের উপর চাপিয়ে দেওয়া সামরিক সহায়তার বিভিন্ন গুরুভার চুক্তির জোরে বন্যাস্রোতের মতো এল 'মার্কিন উপদেষ্টারা' — তারা দেশটার ফৌজ, প্রশাসন এবং অর্থনীতির মূল অবস্থানগুলিতে গিয়ে অধিষ্ঠিত হল।

১৯৫৫ এবং ১৯৬২ সালের মধ্যে ওয়াশিংটন দক্ষিণ ভিয়েৎনামী কর্তৃপক্ষের তহবিলে দিয়েছিল মোটামুটি ২৫০ কোটি ডলার, তার চার-পঞ্চমাংশের বেশি খরচ করা হয়েছিল স্থানীয় ফৌজ গড়ে তুলে সেটাকে সজ্জিত করার বাবত, এই ফৌজ ছিল আমেরিকানদের হুকুমবরদার। ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি সময় নাগাত দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সশস্ত্র শক্তিতে যোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪,০০,০০০, যেখানে মোট লোকসংখ্যা ছিল ১,৪০,০০,০০০! এমন পরিসরে সামরিকীকরণ বইবার ক্ষমতা সে দেশের অর্থনীতিতে ছিল না — কাজেই, এই সাক্ষীগোপাল রাষ্ট্র অচিরেই প্রায়

সমস্ত দিক থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ষোল-আনা নির্ভরশীল হয়ে পড়ল।

ইন্দোচীন উপদ্বীপে মার্কিন কার্যকলাপ হল বস্তুত ঔপনিবেশিক 'হাতানোর' একটা আধুনিক ঢঙ। আমাদের একালে এই রকমের উপনিবেশবাদী কার্যকলাপের পরিণতি কি দাঁড়ায় সেটা পরবর্তী ঘটনাবলিতে দেখা গেল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গেড়ে বসেই সে দেশে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল, পরে সেটা হল আন্তর্জাতিক উত্তেজনার প্রধান উৎস।

চীনে জনগণের বিপ্লবে উচ্ছেদ হয়ে চিয়াং কাই-শেক চক্র তাইওয়ানে পালিয়ে গেলে এই পলায়নের ঘটনাটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দ্বীপটাকে দখল করে বসল — যদিও দ্বীপটা চীনেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। চিয়াং চক্রটির ভরণপোষণের ভার নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ান দ্বীপটাকে একটা সামরিক শিবিরে পরিণত করল, সেটা হল চীনা প্রতিবিপ্লবের একটা প্রধান অবলম্বন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির একটা চৌকির মতো।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দক্ষিণ কোরিয়াকে নিজেদের ঘর-বাড়ি করে নিয়েছে। আর্থনীতিক সম্প্রসারণ এবং ৬০,০০০ সৈনিকের মার্কিন ফৌজের উপস্থিতি, এই দুইই এখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্যের বনিয়াদ। দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষাধিকারের 'আইনগত' বনিয়াদ হল একটা 'পারস্পরিক প্রতিরক্ষা' সন্ধিচুক্তি; ১৯৫৩ সালে কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরেই সিওলের সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ওয়াশিংটন ঐ সন্ধিচুক্তি করেছিল। আমেরিকানদের হাতে সজ্জিত এবং ট্রেনিং পাওয়া ৬,০০,০০০ সৈনিকের দক্ষিণ-কোরীয় ফৌজ পেণ্টাগনের কামানের খোরাকের যোগানদার। ওয়াশিংটনের হুকুম অনুসারে দক্ষিণ-কোরীয় ফৌজের বিভিন্ন ইউনিট পাঠানো হয় দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, এইসব ইউনিট সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিংস্র ঔপনিবেশিক যুদ্ধে লড়ে।

তবে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও বিবেচনায় না রেখে পারে না — কাজেই, উপরে উল্লেখিত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের জয় করা দেশগুলিতে তারা স্থানীয় সরকার বজায় রাখতে বাধ্য হয়। ঝাণ্ডা থাকে সেই একই, কিন্তু এইসব দেশের মানুষের পক্ষে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী জোয়ালটার ভার তাই বলে একটুও লাঘব হয় না।

উপরে বিবৃত তথ্য এবং ঘটনাবলি দেখে মনে প্রশ্ন জাগে -- তবে কি, কোনক্রমে, পুরেন আইনগতক্রমে বিধিবদ্ধ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলোর জায়গায় -- এই এখনকার পৃথিবীতে -- আসছে নতুন 'অদৃশ্য' সাম্রাজ্যগুলো? অর্থাৎ কিনা, এও কি সম্ভব যে, বিভিন্ন ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের বিলুপ্তির ব্যাপারটা একরকমের ঔপনিবেশিক আধিপত্যের জায়গায় অন্য রকমের ঔপনিবেশিক আধিপত্য কায়েম করা ছাড়া কিছু নয়?

এর সঠিক উত্তর পেতে হলে স্মরণ করা দরকার এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় চলতি পরিস্থিতির নির্ধারক ঐতিহাসিক শক্তিগুলি ঠিক কি। এই তিন মহাদেশে যখন সাম্রাজ্যবাদের অবিসংবাদিত আধিপত্য ছিল তখন কোন উপনিবেশভোগী শক্তির কবল কিংবা প্রভাব চলে গেলে তার অর্থ দাঁড়াত সে জায়গায় এসে কায়েম হবে অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদী লুটেরা। যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তাইই ঘটেছিল: পরাস্ত জার্মানির উপনিবেশগুলোকে হাতে নিয়েছিল বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি। তেমনি, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলি বজায় থাকা কালেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা এমন মাত্রায় পেঁছেছিল যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সম্প্রসারিত হয়ে চলা বাণিজ্য আর পুঁজি রপ্তানির জোরে বিভিন্ন উপনিবেশ আর পরাধীন দেশে বিভিন্ন খুবই মজবুত অবস্থান গ্রাস করতে পেরেছিল -- সেগুলিকে তারা মার্কিন উপনিবেশবাদের ঘাঁটি করে তুলেছিল, যদিও সেখানে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঝাণ্ডা উড়ায় নি।

কিন্তু আজকাল সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন আন্তর্জাতিক উপাদান হয়ে উঠছে, এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় বিকাশের ধারাগুলিকে নির্ধারণ করছে — এখন পরিস্থিতিতে মূলগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। কোন ঔপনিবেশিক শক্তি উচ্ছেদ হলে তারা নিজেদের অবস্থানগুলিকে তুলে দিয়ে যাবে অন্যান্য উপনিবেশবাদীদের হাতে, এমন কোন প্রশ্ন এখন আর নেই। জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন উপনিবেশবাদকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করছে — তার অর্থ হল, পৃথিবীজোড়া পরিসরে উপনিবেশবাদীদের ক্ষমতা আর প্রভাব-প্রতিপত্তির অধঃপতন ঘটছে। তার উপর, ঔপনিবেশিক রাজগুলোর হাতে যত অবস্থান, যত ক্ষমতা, যত সুযোগসুবিধা ছিল সেই সবই একেবারে ষোল-আনাই এসে যাচ্ছে নয়া-উপনিবেশবাদের হাতে, অর্থাৎ উপনিবেশবিহীন উপনিবেশবাদের হাতে, এমনটা কল্পনা করা ভুল।

তবে, যেমন সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে, তেমনি ইতিহাসের মল্লভূমিতে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির মধ্যে সংঘাতের ক্ষেত্রেও সাধারণ পশ্চাদপসরণ সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রচন্ড আত্মরক্ষামূলক লড়াই, কোন কোন পার্শ্বদেশীয় কুশলী গতিবিধি, এমনকি সাময়িক পাল্টা-আক্রমণও ঘটতে পারে। পশ্চাদপসরণ করতে করতে উপনিবেশবাদ এই সমস্ত কর্মকৌশলই প্রয়োগ করছে। আর কিছুতেই পরিত্রাণ নেই, এটা বুঝে, এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় অবস্থানগুলি আঁকড়ে ধরে সেগুলিকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টায় কি উপায়-উপকরণ অবলম্বন করবে সে সম্বন্ধে উপনিবেশবাদের কোন বিবেকের সংযম নেই। আমরা আগেই দেখেছি, উপনিবেশবাদীদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ দূর করা, অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক রাজ উচ্ছেদ করা শুধু নয়, সেটা ছাড়িয়েও এগোতে চায় এখনকার জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন: উপনিবেশবাদের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের বনিয়াদটার অবসান ঘটানো, অর্থাৎ, আর্থনীতিক অধীনতার অবসান ঘটানোই এখন লক্ষ্য, এক্ষেত্রে উপনিবেশবাদ আজকাল রাজনীতিক কিংবা রাজনীতিক-সামরিক চাপ কিংবা আধিপত্য ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতিও প্রয়োগ করছে: প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে তারা বিভিন্ন সূক্ষ্ম এবং কুশলী আর্থনীতিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে; সদ্য-মুক্ত দেশগুলিতে মতাদর্শগত সম্প্রসারণের অভিযান চালায়—কখনও কখনও আদবকায়দাদুরস্ত এবং সূক্ষ্ম উপায়ে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রকাশ্যে স্থূলভাবেই পৃথক পৃথক নেতাকে, এমনকি গোটা গোটা সামাজিক-আর্থনীতিক সম্প্রদায়কেই ঘুষ দিয়ে বশীভূত করে। পরদেশ গ্রাস করা এবং আয়ত্তে-আনা দেশে রাজনীতিক আধিপত্য বজায় রাখার মতো পদ্ধতিগুলি সমসাময়িক উপনিবেশবাদীদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন। আমাদের একালে এখনও কিছু কিছু উপনিবেশ এবং উপনিবেশবাদীদের দখল করা কিছু কিছু অঞ্চল থাকলেও, সমসাময়িক উপনিবেশবাদের কার্যকলাপের প্রধান ক্ষেত্র এখনও এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায়, পার্থক্য শুধু এই যে, এই তিন মহাদেশে কার্যত সমস্ত দেশই এখন সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র, এটা আজ উপনিবেশবাদীরা বিবেচনায় রাখতে বাধ্য হয়।

বুর্জোয়াদের আজকালকার বিভিন্ন রচনায় পরস্পরসংযুক্ত দুটো উপস্থাপনা বেশ স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়; নয়া-উপনিবেশবাদের মতাদর্শবিদেরা যেসব ধারণা খাড়া করে সেগুলির মধ্যে ঐ দুটো উপস্থাপনা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। তারা প্রমাণ করতে চাইছে, প্রথমত, ঐতিহাসিক বিচারে, উপনিবেশবাদ

যেন একটা অনিবার্য ব্যাপার, আর ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন জাতিগুলির আর্থনীতিক এবং সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে পশ্চিমী শক্তিগুলি যেন একটা গুরুত্বসম্পন্ন সভ্যকরণের ভূমিকা পালন করেছে; আর, দ্বিতীয়ত, উপনিবেশবাদ যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদও, আর তার জায়গায় যেন এখন এসেছে প্রাক্তন উপনিবেশভোগী শক্তিগুলি এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমানতার সম্পর্ক।

উপনিবেশগুলিতে শাসনের আমলে উপনিবেশবাদীদের সমস্ত 'ইতিবাচক' অবদানের কথা বুর্জোয়া লেখকদের বিভিন্ন বইয়ে এবং প্রবন্ধে সযত্নে বিশদভাবে বিবৃত করা হয়। যেমন, কেনেথ্ ব্র্যাড্লি লিখেছেন: 'বৃটিশ শাসক এবং মিশনারিরা যখন উপস্থিত হয়েছেন, পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলের গোটা এলাকা ছাড়া সর্বত্রই তাঁদের সভ্যতা গড়তে আরম্ভ করতে হয়েছিল আর্থনীতিক এবং সামাজিক শূন্যতার মধ্যে।' তবু, তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, 'এখন মধ্য আফ্রিকার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পশ্চিম ইউরোপের জীবনযাত্রার মানের তুলনা করলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে আফ্রিকার মানুষ গরিব এবং অশিক্ষিত।'* এই পরিস্থিতির যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের চেষ্টায় তিনি বলেছেন, আফ্রিকার দেশগুলির সামাজিক-আর্থনীতিক অবস্থা তুলনা করতে হবে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বর্তমান অবস্থার সঙ্গে নয় (এই রাষ্ট্রগুলির সমৃদ্ধি ঘটেছে বহুলাংশে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের ফলে), তুলনা করতে হবে এই রাষ্ট্রগুলির ষাট বছর আগেকার অবস্থার সঙ্গে।

ডেভিড হ্যাপগুডের মতামতে খোলাখুলি কৈফিয়তের সুর — তিনি মনে করেন, 'বহির্জগতের জন্যে মহাদেশটাকে খুলে দিয়ে ইউরোপীয়রা এনেছিল নতুন জীবনযাত্রাপ্রণালী, নতুন নতুন জিনিস আর নতুন নতুন ভাব-ধারণা... বেশির ভাগ ইউরোপীয়রা বলবে, ঐ শেষের বছরগুলিতে তারা ক্ষতির চেয়ে ভালই করেছে বেশি। আফ্রিকার অনেকে তার সঙ্গে একমত নয়, কেউ কেউ বলে, 'আমাদের যাবতীয় কষ্ট ঘটেছে উপনিবেশবাদের দরুন।' ...আর, ইউরোপীয়রা যদি কখনও না আসত তাহলে আফ্রিকায় যে কী ঘটত সেটা তো কেউ জানতে পারে না।'** হ্যাপগুডের মতে আফ্রিকার উপনিবেশগুলি বিশেষত বৃটেন এবং ফ্রান্সের পক্ষে কখনও বিশেষ লাভজনক কিংবা খুব গুরুত্বসম্পন্ন ছিল না। অধিকন্তু, তিনি বলেন,

* Kenneth Bradley, *Britain's Purpose in Africa*, p. 6.

** David Hapgood, *Africa*, Boston, 1965, p. 28.

'একটা আর্থনীতিক অর্থে, আফ্রিকার অনেকটাই রাজনীতিক স্বাধীনতা পাবার আগে যা ছিল তার চেয়ে এখন কম স্বাধীন... আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার পর থেকে এই অধীনতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বেড়েছে।'*

জাম্বিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত আর. গুড তো আরও অনেক এগিয়ে বলেছেন, 'ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি তাদের অস্তিত্বের জন্যে উপনিবেশবাদের কাছে ঋণী।' উপনিবেশবাদকে সুন্দর করে দেখাবার মহা আগ্রহে অন্য কোন কোন লেখকও ঐ মত পোষণ করেন। নয়া-উপনিবেশবাদের কোন কোন হীন প্রবক্তার মতে, উপনিবেশবাদীরা পরদেশ গ্রাস করতে গিয়েছিল, তার একমাত্র কারণ হল এই যে, তারা ক্রীতদাসপ্রথার অবসান ঘটাতে, এবং জীবনযাত্রার খৃস্টীয় প্রণালী প্রচার করে অনগ্রসর জাতিগুলিকে সভ্যতার কক্ষে আনতে চেয়েছিল। উগান্ডায় প্রাক্তন বৃটিশ লাট স্যর অ্যান্ড্রু কোহেন অন্যান্য কথার মধ্যে বলেছেন, 'পশ্চিম এবং পূর্ব আফ্রিকায় ইউরোপীয় কোম্পানি এবং দেশগুলির আর্থনীতিক স্বার্থ বাস্তবতার অন্তর্ভুক্ত হলেও সেটা প্রধান প্রেরণা ছিল না, সেটা ঘটনাক্ষেত্রে প্রথমও ছিল না; তা ছিল, এমনটা মার্কসবাদী ইতিহাসবেত্তাদের যাবতীয় যুক্তিও আমাকে বিশ্বাস করাতে পারে না। ক্রীতদাসপ্রথার বিলোপসাধন, ক্রীতদাস-ব্যবসার প্রতি বিতৃষ্ণা, আফ্রিকার মানুষের প্রতি কর্তব্যপালনের মনোবৃত্তি — এইগুলিই ছিল পশ্চিম এবং পূর্ব উভয় আফ্রিকায় বৃটেনের প্রবেশের সময়কার প্রথম প্রেরণা।'** হ্যারি আর. রুডিন প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ইউরোপের তখনকার দিনের সমস্যাবলিতে পরদেশ গ্রাস করা ছাড়া উদ্ধারের অন্য কোন পথ ছিল না। তিনি লিখেছেন, 'এটা উপলব্ধি করা বিশেষ দরকার যে, উনিশ শতকের ইউরোপ দেখেছিল, তার প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধান ছিল ইউরোপের বাইরে, তার সীমান্ত ছাড়িয়ে বহু দূরে; অন্য কোন 'বাদের' চেয়ে এই রকমের আর্থনীতিক আন্তর্জাতীয়তাবাদই (অর্থাৎ, উপনিবেশবাদ — এই লেখকেরা) ইউরোপের জন্যে বেশি সাধিত করেছে।'***

---

* David Hapgood, *Africa: From Independence to Tomorrow*, New York, 1965, p. 76.

** Andrew Cohen, *British Policy in Changing Africa*, London, 1956, p. 13.

*** Harry R. Rudin, "The History of European Relations with Africa", *Africa in the Modern World*, Chicago, 1955, p. 22.

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পররাষ্ট্রনীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত *The Idea of Colonialism* নামে বইয়েও উপনিবেশবাদের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের অনুরূপ ধারণা রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে: 'ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি যেসব জায়গায় শাসন চালিয়েছে সেসব জায়গায় তারা অনেক সুযোগসুবিধা এনে দিয়েছে — আইনগত এবং প্রশাসনিক সংস্কার, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, শিল্পায়নের সূচনা এবং পরিবহনের উন্নতি।'* ঐ বইয়ের লেখকেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, 'উপনিবেশবাদ' এই কথাটা এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট 'সাম্রাজ্য' আর 'সাম্রাজ্যবাদ' সংক্রান্ত ধারণা গত কয়েক দশকে সম্পূর্ণ নতুন একটা অর্থ ধারণ করেছে। ঐ লেখকদের মতে, কোন উপনিবেশ তার রাজনীতিক স্বাধীনতা ঘোষণা করলে উপনিবেশবাদের অস্তিত্ব বিলোপের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট।

সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকেরা সাধারণত অভিযোগ করে যে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সমালোচকেরা অনগ্রসর দেশগুলিতে উপনিবেশবাদীদের 'কল্যাণকর এবং প্রগতিশীল' অবদানগুলি স্বীকার করতে চায় না। উপনিবেশগুলিতে ইউরোপীয় শক্তিগুলির সৃজনশীল সক্রিয়তা ছিল সেটা অনস্বীকার্য: তারা সড়ক আর রেলপথ তৈরি করেছে, বন্দর তৈরি করেছে, খনি খুঁড়েছে, কাঁচামাল আকারণের শিল্প গড়েছে, শহরের বিস্তার ঘটিয়েছে, সভ্যতা সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের চোখ খুলে দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ অতি অনগ্রসর বিভিন্ন দেশে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত করেছে, তার ফলে জাতিগত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্প্রসারিত এবং তীব্রতর হয়েছে, এটা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের একটা অঙ্গ।

তবে, পশ্চিমীদের তথাকথিত 'সভ্যকরণের দায়িত্ব', যাতে বলা হয়, এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল কেবল উপনিবেশবাদীরা আসার পরে, সেটা সত্য প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির কর্তৃত্ব কায়েম হবার আগে এশিয়ার দেশগুলির সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সোভিয়েত প্রাচ্যতত্ত্ববিদেরা গত কয়েক বছরে আলোচনা করেছেন, তাঁদের আলোচনার বিবরণী 'পশ্চিমের সভ্যকরণ দায়িত্ব' সংক্রান্ত বক্তব্যটাকে আবার

---

* *The Idea of Colonialism*, New York, 1958, p. 364.

সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করেছে। বিষয়টার কোন কোন দিক নিয়ে সোভিয়েত পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'প্রাচ্যের পিছিয়ে পড়াটা কোন অধ্যাত্মীয় উপাদানের বিষয় নয়, এটা হল শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত অসম বিকাশের ব্যাপার, সেটার অভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত হল এই ঘটনাটা: এশিয়ার বহু দেশ সিঁড়ির নিচের দিককার ধাপগুলিতে হোঁচট খেয়েছে, আর পশ্চিম ইউরোপের কোন কোন রাষ্ট্র তাদের আগে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পর্বে পৌঁছে গেছে। উপনিবেশবাদ ঐ দেশগুলির বিকাশ ব্যাহত না করলে তারা নিজেরাই নাগাল ধরতে পারত; এখন স্বাধীনতা অর্জন করার পরে তারা আবার এগিয়ে চলেছে — যদিও ভিন্ন আভ্যন্তরিক এবং পররাষ্ট্রীয় অবস্থায়।*

ফরাসী ইতিহাসবেত্তা জাঁ শেনো ভিয়েৎনামী জাতির গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করেছিলেন, তিনি লিখেছেন: '১৮৫৮ সালের ৩১শে অগস্ট তারিখে যে ফরাসী নৌবহরটা তুরান-এ নঙর ফেলেছিল তাদের ভিয়েৎনামে কোন ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার ব্যাপার ছিল না। বরং উল্টো, ভিয়েৎনামী জাতির বিকাশের যে বাস্তব সম্ভাবনা বর্তমান ছিল সেটাকে তারা রুদ্ধ করে দিয়েছিল, ক্রমবিকাশ ত্বরিত না করে বরং রুখে দিয়েছিল।'** পশ্চিমী শক্তিগুলি জাপান জয় করে নি, — এশিয়ার একটি দেশ পশ্চিমের অনুকরণ করে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজের প্রচেষ্টায় বিকাশলাভ করতে পারল, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত জাপান।

নয়া-উপনিবেশবাদের পক্ষে যারা ওকালতি করে তারা অক্লান্তভাবে বারবার আওড়ায় পশ্চিমী শক্তিগুলির সভ্যকরণের দায়িত্বপালনের কথা — যদি সেটা সত্যি হত তাহলে তারা সব সময়েই দখল-করা দেশগুলির মানুষের অমন দৃঢ়সংকল্প প্রতিরোধের সম্মুখীন হল কেন? যেমন, আলজিরিয়া জয় করতে ফ্রান্সের লেগেছিল পঞ্চাশ বছরের মতো — যদিও 'জয় শেষ হবার পরেও প্রতিরোধ থেমে যায় নি।'*** অস্ত্র-বলে এবং নিজেদের অনেক কিছু খুইয়ে উপনিবেশবাদীরা সাময়িকভাবে এশিয়া এবং আফ্রিকার

---

* 'অসম সংগ্রামের শতাব্দীগুলি' (পনের -- উনিশ শতক), মস্কো, ১৯৬৭, পৃঃ ৩৯৩ (রুশ সংস্করণ)।

** Jean Chesneaux, *Contribution à l'histoire de la nation vietnamienne*, Paris, 1955, p. 106.

*** Marcel Egretaud, *Réalité de la nation algérienne*, Paris, 1957, p. 56.

জাতিগর্লির প্রতিরোধ ভেঙে দিতে পারলেও তাদের মর্ক্তি এবং স্বাধীনতার স্পৃহা বিনষ্ট করার ক্ষমতা তাদের হয় নি। ঔপনিবেশিক জোয়াল ছর্ড়ে ফেলার জন্যে নিপীড়িত জাতিগর্লির সংগ্রাম কখনও থামে নি: এ সংগ্রাম কখনও এখানে-ওখানে নিভে গেলেও, আবার জবলে জবলে উঠেছে আরও প্রবল হয়ে।

ঔপনিবেশিক শক্তিগর্লির মধ্যে এশিয়া এবং আফ্রিকা ভাগাভাগি পনর শতকে আরম্ভ হয়ে চলেছিল এই শতক অবধি। উনিশ শতকের শেষের দিকে পর্ঁজিতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের পর্বে ঢুকলে এই ভাগাভাগির ব্যাপারটা অঞ্চলগ্রাসের অতি প্রচণ্ড লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল।

এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় আমলা-ফয়লা, ব্যাঙ্কার, সওদাগর, আবাদকারী, ফৌজী লোকজন আর কূটনীতিকেরা গেল স্রোতের মতো। যর্দ্ধের অভিযান চলল একটার পর একটা। তড়িঘড়ি হতে থাকল হরেক রকমের রফা; জয়-করা দেশে ঔপনিবেশিক শক্তির স্বত্ব 'আইনসম্মত' করার জন্যে এইসব রফা আরও বেশি হল বিশেষত আফ্রিকার উপনিবেশগর্লি সম্বন্ধে চোদ্দ-শক্তি বার্লিন সম্মেলনের (১৮৮৪—১৮৮৫) পরে; ঐ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, কোন অঞ্চলে দখলের ঘটনায়ই সেখানে স্বত্ব প্রতিপন্ন হবে। এশিয়া এবং আফ্রিকার রাজনীতিক মানচিত্র বারবার নতুন করে আঁকা হতে থাকল। প্রভাবাধীন অঞ্চল নির্ধারণের সময়ে জাতিগত বিচার-বিবেচনা সম্পর্ণত উপেক্ষা করা হল — গোটা গোটা জাতিকে কৃত্রিমভাবে বিভক্ত করে ফেলা হল।

পৃথিবীটাকে ভাগাভাগি করে নেবার লড়াইয়ে ক্ষমতাই হল একমাত্র গণ্য বিষয়। সবচেয়ে বেশি আর্থনীতিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগর্লি একটার পর একটা অঞ্চল গ্রাস করল, সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটিয়ে দিতে থাকল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সবার আগে এগিয়ে চলল বৃটেন, কেননা — সোভিয়েত ইতিহাসবেত্তা ইয়ে. তার্লে যা বলেছেন — নৌবহরের জোরে সাগরে বৃটেনের অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব ছিল, বৃটেন ছিল পৃথিবীতে সর্বপ্রধান শিল্পসমৃদ্ধ শক্তি, আর পৃথিবীর সর্বত্র ছড়ানো বাজারের মালিক।*

---

* ইয়ে. ভ. তার্লে, 'পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগর্লির ঔপনিবেশিক কর্মনীতির ইতিহাস' (পনের শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের গোড়া), মস্কো, ১৯১৫, পৃঃ ৩০৯ (রুশ সংস্করণ)।

ভারতে, সিংহলে এবং এশিয়ায় অন্যান্য উপনিবেশে পাকাপোক্ত হয়ে গেড়ে বসে বৃটেন নজর দিল আফ্রিকার দিকে — বিশেষত আফ্রিকার সমৃদ্ধিশালী পূর্ব উপকূল এবং দক্ষিণ প্রান্তের দিকে। আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে দক্ষিণাংশে বৃটেনের অনুপ্রবেশের খুবই সহায়ক হল ১৮৮৯ সালে স্থাপিত 'বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানি'। এর প্রতিষ্ঠাতা বৃটিশ উপনিবেশবাদের সক্রিয় প্রচারক স্যার সেসিল রোড্স্ সম্বন্ধে লেনিন বলেছিলেন, 'কোটিপতি, অর্থক্ষেত্রে এক রাজা, যিনি ছিলেন ইং-বুয়ার যুদ্ধের জন্যে প্রধানত দায়ী।'* ১৮৮৯ সালে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে *'The London Gazette'*এ প্রকাশিত রাজকীয় সনদে এই কোম্পানিকে অধিকার দেওয়া হল যে, বিভিন্ন কনসেশন এবং চুক্তি থেকে পাওয়া লাভ এবং সুবিধা এই কোম্পানি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে এবং প্রশাসন কিংবা জন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা কিংবা বিভিন্ন অঞ্চল, ভূমি এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্যে ফৌজ বজায় রাখা সমেত সমস্ত অধিকার খাটাবে।** এই কোম্পানির কার্যক্ষেত্র অঞ্চলটিকে বিধিবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল: 'দক্ষিণ আফ্রিকার যে অঞ্চল বৃটিশ বেচুয়ানাল্যান্ডের ঠিক উত্তরে, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের উত্তরে এবং পশ্চিমে এবং পর্তুগীজ ডমিনিয়নগুলির পশ্চিমে।'*** কিন্তু, কোম্পানিটার প্রভাবাধীন অঞ্চল ঐভাবে যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশি ছিল বাস্তবে। ১৮,৫০,০০০ বর্গকিলোমিটারের (রোডেসিয়া এবং বেচুয়ানাল্যান্ডের মোট আয়তন) বিশাল অঞ্চলে ঐ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ ছিল।

আরও আগে, ১৮৮২ সালে বৃটেন মিসরে কর্তৃত্ব কায়েম করেছিল। উপনিবেশবাদের একজন বিশিষ্ট মতাদর্শবিদ এবং বৃটিশ লেবর পার্টির নেতা জন স্ট্র্যাচি বৃটেনের দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মিসর জয়ের ন্যায্যতা দেখাবার চেষ্টায় এবং এই দেশজয়ে বৃটিশ ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদ্বয় স্যার আলফ্রেড মিল্নার এবং এভেলিন বি. ক্রোমারের বিশেষ ভূমিকার উপর

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 22, p. 257.

** "Charter of the British South Africa Company, October 29, 1889", *British South Africa Company's Territories*, London, 1898, p. 4.

*** The British South Africa Company. Reports on the Company's Proceedings and the Condition of the Territories within the Sphere of Its Operations, 1896-1897, London, 1898, p. 3.

বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লিখেছিলেন: '১৮৮৩ সালে ক্রোমার যা দেখেছিলেন তাতে সর্বকালের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত দেশগুলির একটা ছিল মিসর। তিনি যখন ১৯০৭ সালে মিসর ছেড়ে আসেন তখন মিসর শোধক্ষম হয়ে উঠেছিল, তখন সে পাওনাদারদের পাওনা মেটাতে পারে সহজেই (নিঃসন্দেহে সেটাই ছিল ব্যাপারটার মূল উদ্দেশ্য), শুধু তাই নয়, তখন সে অন্তত আধুনিক বিকাশের পথে উঠে দাঁড়িয়েছিল।'*

সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শবিদদের দৃষ্টিতে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রাম যেন দৃষ্টিগোচর ভবিষ্যতে বাদবাকি উপনিবেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ব্যাপার। পশ্চিমী দেশগুলিতে প্রকাশিত বেশ কতকগুলি বইয়ের লেখকেরা যেমন সাম্রাজ্যবাদকে তেমনি উপনিবেশবাদকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে ধরে নেন।**

কোন উপনিবেশ কিংবা পরাধীন দেশ রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করল, তার অঞ্চল থেকে সমস্ত বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি অপসারিত করল, সমস্ত বৈদেশিক ফৌজ অপসারণ করাল, অতীতে তার উপর জোর করে চাপানো সাম্রাজ্যবাদীদের অসম সন্ধিচুক্তিগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল — তখনও এমন হতে পারে যে, উপনিবেশবাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হল না। উপনিবেশবাদ বলতে মূলত দাঁড়ায় এই: কোন জাতির উপর অন্য কোন জাতির শাসক শ্রেণীর শোষণ এবং উৎপীড়ন। এশিয়া এবং আফ্রিকার জাতিগুলি রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করার পরে এইসব জাতির উপর আর্থনীতিক শোষণ বন্ধ হয়ে যায় নি — শোষণের রকম-প্রকার, কৌশল আর পদ্ধতিই শুধু বদলেছে। লেনিন বলেছিলেন, যেকোন বিরোধাত্মক সমাজ-ব্যবস্থায়, তেমনি, পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের প্রত্যেকটি পর্বে তার নিজস্ব বিশিষ্ট ধরনের ঔপনিবেশিক শোষণ থাকে।

আদিম পুঞ্জীভবনের কালপর্যায়ের সমার্থবোধক হল সাগরপারের দেশগুলিতে বৈষয়িক ধনসম্পদের উপর ইউরোপীয় শক্তিগুলির পুরোদস্তুর লুণ্ঠন; পুঁজিতন্ত্র যখন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল সেই সময়ে বাধ্যতামূলক শ্রম

---

* John Strachey, *The End of Empire*, London, 1959, p. 86.

** জন স্ট্র্যাচি এবং সমসাময়িক উপনিবেশবাদের অন্যান্য মতাদর্শবিদেরা দৃঢ়োক্তি করেন যে, এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলির বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী রণনীতির প্রকৃতি মূলগতভাবে বদলে গেছে — সমসাময়িক পুঁজিতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ মূলত ভিন্ন ব্যাপার।

চালু করে কর্তৃত্বাধীন জাতিগুলির উপর লুণ্ঠন চলত; অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলিকে প্রধানত ভোগ্যপণ্যের বাজারে পরিণত করে শিল্পগত পুঁজিতন্ত্র ঐ দেশগুলিকে শোষণ করত; আর শেষে, সাম্রাজ্যবাদের কালপর্যায় আরম্ভ হলে প্রধানত কাঁচামালের উৎস এবং পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে উপনিবেশগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। লেনিন লিখেছিলেন: 'ঔপনিবেশিক কর্মনীতির বহু 'পুরন' প্রেরণার সঙ্গে ফিনান্স পুঁজি যুক্ত করেছে কাঁচামালের উৎসের জন্যে সংগ্রাম, সংগ্রাম পুঁজি রপ্তানির জন্যে, প্রভাবাধীন অঞ্চলের জন্যে, অর্থাৎ, বিভিন্ন লাভজনক রফা, কনসেশন, একচেটিয়া মুনাফা, ইত্যাদির জন্যে, সাধারণভাবে আর্থনীতিক অঞ্চলের জন্যে।'*

ঔপনিবেশিক শোষণের বিভিন্ন ধরনধারনের ধারাবাহিকতা নির্ধারিত হয়েছিল উপনিবেশভোগী দেশগুলিতে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের বিভিন্ন নতুন পর্বের ধারাবাহিকতা দিয়ে, তাতে একই সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছিল খাস উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের প্রক্রিয়াটা।

এখনকার উপনিবেশবাদকে উপনিবেশগুলিকে ছাড়াই বহুলাংশে চলতে হবে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের মুখে উপনিবেশবাদ সাধারণভাবে পশ্চাদপসারণ করছে — শুধু এই জন্যেই কোনক্রমেই ঝটপট এমন সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, উপনিবেশবাদ যেন আর আগের মতো বিপজ্জনক নয়। নিজেদের মুঠো আলগা হয়ে আসছে এটা বুঝতে পেরে সমসাময়িক উপনিবেশবাদীরা খুব বেকায়দায় পড়লে অতি পাশব উপায়ও অবলম্বন করে, অর্থাৎ কিনা, সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করে। এইভাবে সমসাময়িক উপনিবেশবাদ একটা গুরুতর সামরিক বিপদ — আর সেটা কেবল এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের পক্ষেই নয়, এ বিপদ সাধারণভাবে পৃথিবীর পক্ষেই।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটা সমানে ভেঙে চলেছে — এই অবস্থায় পড়ে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্যে উপনিবেশবাদ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সামরিক এবং রাজনীতিক সংগঠন গড়ে তুলেছে। যেটা ছিল ঔপনিবেশিক দুনিয়া সেই গোটা অঞ্চল জুড়ে এই সংগঠন চালু

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 22, p. 299.

রয়েছে। এর বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদান হল: বিভিন্ন বহুপক্ষীয় সামরিক-রাজনীতিক জোট; বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তৃতীয় দুনিয়ার পৃথক পৃথক রাষ্ট্র কিংবা কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় সামরিক মৈত্রী; এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে জালের মতো বিস্তৃত বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি (স্থল, বিমান এবং নৌঘাঁটি), এগুলির কোন কোন দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের বেশ মোটা রকমের সশস্ত্র শক্তি মোতায়েন করা; মুক্ত দেশগুলির উপকূলের কাছে বিভিন্ন নৌবহরের নিরন্তর উপস্থিতি; এইরকমের কোন কোন দেশের ফৌজকে কার্যত সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে ফৌজে রূপান্তরিত করা।

এই রকমের সব আন্তর্জাতিক জোট উপনিবেশবাদের সামরিক লক্ষ্যসাধনের কাজ করে: উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি সংস্থা (নামের ইংরেজী আদ্যক্ষরগুলি নিয়ে — নাটো), মধ্য চুক্তি সংস্থা (সেণ্টো), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (সিয়াটো), অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদ্যক্ষরগুলি নিয়ে আনজুস (প্রশান্ত মহাসাগরীয় নিরাপত্তা চুক্তি নামে পরিচিত); এবং আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সংস্থা (ও-এ-এস্)।

নাটো সর্বোচ্চ উপনিবেশবাদী জোট বলে গণ্য হতে পারে। এই চুক্তির সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রের বিপুল সামরিক শক্তি রয়েছে সমসাময়িক উপনিবেশবাদের হাতে: এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় জাতীয় মুক্তির বিভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপের সমর্থনে নাটোর বিভিন্ন ঘাঁটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে — যেমন, নিকট প্রাচ্যে ১৯৫৮ সালের সংকটের সময়ে ইং-মার্কিন ফৌজের গতিবিধি সম্পর্কে, কিংবা, কঙ্গোয় (কিন্‌শাসা) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বেলজিয়মের হস্তক্ষেপের সমর্থনে। কিন্তু সেটাই একমাত্র জিনিস নয়। আঙ্গোলায় এবং মোজাম্বিকে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে পিটুনি সামরিক অভিযানে নাটোর সশস্ত্র শক্তি কিংবা ঘাঁটি সরাসরি জড়িত না থাকলেও, কেবল নাটোর সদস্য-রাষ্ট্রগুলি থেকে পাওয়া সামরিক এবং আর্থনীতিক সাহায্যের জোরেই ডিক্টেটর-শাসিত পর্তুগাল আফ্রিকায় তার উপনিবেশগুলিতে ১,০০,০০০ সৈনিকের ফৌজ রাখতে পারছে এবং মুক্তির শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বছরে ১২,০০,০০,০০০ ডলারের বেশি খরচ করতে পারছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্স ছাড়াও এশিয়ার তিনটি দেশ ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এবং পাকিস্তানকে নিয়ে সিয়াটো। দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ার কোন দেশে যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যার দরুন, সাম্রাজ্যবাদীদের মতে শান্তি বিপন্ন হয়, তাহলে এই সংস্থার সদস্য-দেশগুলি সংশ্লিষ্ট দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে এবং সেখানে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করতে পারবে --- এই 'অধিকার' দেওয়া হয়েছে ঐ চুক্তিতে, ঐ চুক্তি তার সংগঠনের সনদেরই প্রকৃতির অনুযায়ী। এইভাবে সূত্রবদ্ধ সিয়াটো কর্মনীতির শিকার হয়েছে ইন্দোচীনের দেশগুলি। ভিয়েৎনামে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্যে পিছনের ঘাঁটি হিসেবে আমেরিকানরা থাইল্যান্ডকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। থাইল্যান্ডের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে বোমারু বিমান পাঠিয়ে লাওসের উপর অবিশ্রান্ত মার্কিন বোমাবর্ষণ চালানো হয়। কাম্বোডিয়ায় সামরিক হানা দেবার জন্যেও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন এলাকা ব্যবহার করা হয়। নিয়মিত সময় অন্তর-অন্তর সিয়াটোর সশস্ত্র শক্তির যেসব মহড়া চালানো হয় তার দরুন সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আবহাওয়ায় উত্তেজনা বাড়ে।

সেণ্টোর কার্যক্ষেত্র পড়েছে নাটো আর সিয়াটোর মাঝামাঝি অঞ্চলে --- তাই, এই জোটটাকে ঐ দুটো সাম্রাজ্যবাদী জোটের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে ধরা যেতে পারে। পশ্চিমে নাটো আর পূবে সিয়াটোর মধ্যবর্তী অবস্থানের এই জোটটার মধ্য-চুক্তি সংস্থা নামটা মানানসই বটে। গোড়ায় (১৯৫৫) এটার নাম ছিল বাগদাদ চুক্তি, কিন্তু ১৯৫৮ সালে ইরাকে জাতীয় অভ্যুত্থানের পরে এই দেশটি জোট থেকে বেরিয়ে গেল, তখন সেণ্টোর সদরঘাঁটি বাগদাদ থেকে তুরস্কের আঙ্কারায় স্থানান্তরিত হল। সেণ্টোর অন্যান্য সদস্য হল তুরস্ক, ইরান আর পাকিস্তান। নিকট প্রাচ্যে এই জোটের কাজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিয়াটোরই মতো।

সপ্তম দশকের মাঝামাঝি নাগাত, অর্থাৎ, সিয়াটো আর সেণ্টো সৃষ্টি হবার প্রায় দশ বছর পরে, একদিকে এশীয় সদস্য-রাষ্ট্রগুলি এবং অন্যদিকে পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিল। ঘটনাবলি লক্ষ্য করে বলা যায়, যেমন, ঐ দুই সংস্থায় এশীয় অংশীদারদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত কর্মনীতির পক্ষে সম্পূর্ণতই টেনে নিতে পশ্চিমী শক্তিগুলি অপারগ হয়েছে। এইভাবে, ইরান, তুরস্ক এবং পাকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ার স্বার্থে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল।

তবু, উপনিবেশবাদের হাতে রাজনীতিক এবং সামরিক হাতিয়ার হিসেবে

বজায় থেকে সিয়াটো এবং সেণ্টো প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রধান অবলম্বন হয়েই রয়েছে, ঐ দুই সংগঠনের এশীয় সদস্যদের সার্বভৌমত্ব খর্ব করছে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির সমস্ত সদ্য-মুক্ত দেশের একটা বিপদ হয়ে রয়েছে।

আক্রমণাত্মক মার্কিন যুদ্ধে আনুকূল্য করার জন্যে অস্ট্রেলিয়া যখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ফৌজ পাঠাল তখন আনজুস বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় নিরাপত্তা চুক্তির স্বরূপ প্রকাশ হয়ে গেল।

কিউবার বিপ্লব এবং সমগ্র লাতিন আমেরিকায় তার ক্রিয়ার কথা ভেবে আতঙ্কিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সংস্থাটা (ও-এ-এস) সামরিক-রাজনীতিক জোটের রূপ ধারণ করল। কিউবার বিপ্লবের একখানা গুরুত্বপূর্ণ দলিল ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় হাভানা ঘোষণাপত্রে ও-এ-এস্‌কে বলা হয়েছে 'একটা সামরিক জোট, লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জনগণের মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে উদ্যত একটা উৎপীড়নের হাতিয়ার'।*

বিভিন্ন উপনিবেশে, প্রাক্তন উপনিবেশে এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রে মার্কিন, বৃটিশ এবং ফরাসী ঘাঁটিগুলোকে দেখায় যেন পৃথিবীর মুখে কতকগুলো দুষ্টব্রণের মতো। বৃটেন এবং ফ্রান্স তাদের প্রাক্তন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কার্যত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিই বজায় রেখেছে, সেগুলির মধ্যে কোন-কোনটাকে আধুনিক এবং সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বেশির ভাগ মার্কিন ঘাঁটি তৈরি হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে।

তথ্যাদি যা পাওয়া যায় তার থেকে দেখা যায়, কেবল বিভিন্ন বৈদেশিক অঞ্চলেই (এর মধ্যে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিভিন্ন অঞ্চলও) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি এবং বিভিন্ন সরঞ্জামের ঘাঁটি আছে ২,২০০'র বেশি। এশিয়ায় সেগুলি আছে প্রধানত ওকিনাওয়ায়, খাস জাপানে, দক্ষিণ কোরিয়ায়, তাইওয়ানে, ফিলিপাইনে, থাইল্যাণ্ডে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, পাকিস্তানে, তুরস্কে এবং সৌদী আরবদেশে। আফ্রিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বড় ঘাঁটি রয়েছে লিবিয়ায় এবং লাইবিরিয়ায়। বৃটিশ সামরিক ঘাঁটিগুলো একটার পর একটা রয়েছে পুরন ঔপনিবেশিক বাণিজ্য-পথ

---

* Segunda Declaratión de la Habana, *Cuba Socialista*, March 1962, No. 7 pp. 13-14.

বরাবর — জিব্রাল্টার থেকে মাল্টা এবং সাইপ্রাস হয়ে এডেনে,* আর এডেনে শাখাবিভক্ত হয়ে গেছে পূবে সিঙ্গাপুরে আর উত্তর বোর্নিওর দিকে এবং দক্ষিণ দিকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বরাবর কেপটাউনের কাছে সাইমন্স্‌টাউনের দিকে।

মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি আছে বহু — সেগুলির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের; এগুলি লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সশস্ত্র পিটুনী অভিযানের পাদানি, এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে খোলাখুলিই।

বিদেশে এইসব সামরিক ঘাঁটিতে মোতায়েন সৈন্যসংখ্যা বিস্তর। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে মোতায়েন করা মার্কিন সৈন্যসংখ্যা মনে হয় পাঁচ লক্ষর বেশি।** তার উপর, এইসব দেশের ফৌজগুলিও বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কর্তৃত্বাধীন — এই মতলবে এইসব দেশে ঢুকানো হয় বহুসংখ্যক ট্রেনিংদাতা এবং উপদেষ্টা। সদ্য-স্বাধীন কোন কোন দেশের ফৌজগুলিতে মার্কিন, বৃটিশ এবং ফরাসীদের পাশাপাশি পশ্চিম জার্মান ফৌজী অফিসারেরাই ক্রমাগত বেশি বেশি সংখ্যায় ট্রেনিং-দাতা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। আফ্রিকার সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলিতে এমন পশ্চিম জার্মান ফৌজী অফিসার আছে দু'-শর বেশি, — হিটলারের ফৌজের এই উত্তরাধিকারীরা স্বভাবতই সমসাময়িক উপনিবেশবাদের তরফে সক্রিয়।

সাধারণত, কোন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সামরিক চুক্তি করে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র কোন নতুন জাতীয় রাষ্ট্রের মাটিতে সামরিক ঘাঁটি এবং ফৌজ বজায় রাখার আইনগত অধিকার পায়। কাজেই, বাহ্যত বন্দোবস্তটাকে সম্পূর্ণ সংগত বলেই মনে হতে পারে, — সেটা 'সমানতার বনিয়াদে সামরিক সহযোগিতা' বলে বিভ্রান্তিও হয়ত সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, হয় চাপ দিয়ে, নইলে ব্ল্যাক্‌মেইল ক'রে, কিংবা শাসক চক্রটাকে আরও বশংবদ করে তোলার জন্যে উৎকোচ দিয়েই সমসাময়িক উপনিবেশবাদীরা এমন সমস্ত চুক্তিই মুচড়ে আদায় করে নিয়েছে।

---

* Jean Chesneaux, *Contribution à l'histoire de la nation vietnamienne*, Paris, 1955, p. 106.

** তার উপর, ভিয়েৎনামে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫,০০,০০০ সৈনিকের বাহিনী।

তবে, একদিন না একদিন এই সার্বভৌম নতুন রাষ্ট্রগুলি অতি স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করে যে, বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি এবং বিজাতীয় ফৌজের উপস্থিতি সম্পূর্ণতই তাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। উপনিবেশবাদের এই দুর্গগুলোকে ভেঙে ফেলা এবং এগুলির অস্তিত্ব মঞ্জুর করার সন্ধিচুক্তিগুলোকে বাতিল করার জন্যে এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জনগণ ক্রমাগত অধিকতর প্রবলভাবে দাবি করতে আরম্ভ করেছে। যেমন, লিবিয়ার মাটিতে মার্কিন এবং বৃটিশ ঘাঁটি সংক্রান্ত চুক্তি সংশোধন করার জন্যে ১৯৬৪ সালে লিবিয়ার জাতীয় পার্লামেণ্ট দাবি করেছিল। কিউবার সার্বভৌম অধিকার অতি রূঢ়ভাবে লঙ্ঘন ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার মাটিতে গুয়ান্তানামো'য় নৌঘাঁটি বজায় রেখেছে। যেমন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার আমলে সেইভাবেই সামরিক ঘাঁটি গাড়া এবং বজায় রাখার সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতির জবরদস্তির প্রকৃতিটা এই দৃষ্টান্ত থেকে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের ইতিহাস খুঁটিয়ে দেখলে এমন একটা বছরও পাওয়া যাবে না যখন কোন না কোন নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয়-মুক্তির শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সশস্ত্র পিটুনী কার্যকলাপ, সামরিক অভিযান কিংবা ডাহা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ঘটে নি। সমসাময়িক উপনিবেশবাদীরা গত কুড়ি বছরে এশিয়ায়, আফ্রিকায় আর লাতিন আমেরিকায় যেসব সামরিক অপরাধ করেছে তার বিবরণ দেখা যেতে পারে — অবশ্য, এই বিবরণ মোটেই সম্পূর্ণ নয় ।

১৯৪৫ এবং ১৯৪৯ সালের মধ্যে সিরিয়া, লেবানন এবং ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন রোধ করার চেষ্টায়, মালয়, ফিলিপাইন এবং মাদাগাস্কারে এবং এশিয়া আর আফ্রিকার আরও কতকগুলি ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক-মুক্তি আন্দোলন চূর্ণ করার জন্যে বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সশস্ত্র শক্তি ব্যবহার করেছিল। ১৯৪৬ সালে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা 'নোংরা যুদ্ধ' আরম্ভ করেছিল ভিয়েৎনামে, সেই যুদ্ধ চলেছিল আট বছর ধরে, তাতে ভিয়েৎনামী এবং ফরাসী দুই জাতিরই মানুষের জীবন এবং ধন-সম্পদ ক্ষয় হয়েছিল বিপুল।

১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফৌজ কোরিয়ায় আক্রমণ-হস্তক্ষেপ করেছিল। ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালার আইনসম্মত সরকার জনগণের দাবিগুলি পূরণ করার পক্ষে ঘোষণা করেছিল — সেই সরকারকে উচ্ছেদ

করার জন্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সশস্ত্র শক্তি ব্যবহার করেছিল। ১৯৫৪ সালে ফ্রান্স আলজিরিয়ায় যে পিটুনী ঔপনিবেশিক যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল সে যুদ্ধ চলেছিল ন'বছর ধরে। ১৯৫২—১৯৫৫ সালে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা কেনিয়ার দেশভক্তদের বিরুদ্ধে চালিয়েছিল সন্ত্রাসের রাজত্ব।

১৯৫৬ সালে বৃটেন, ফ্রান্স আর ইস্রায়েল এই ত্রৈধ আক্রমণের শিকার হয়েছিল মিসর। ১৯৫৮ সালে ইরাকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অভ্যুত্থান ঘটলে নয়া-উপনিবেশবাদীরা তার জবাবে মধ্য প্রাচ্যে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করেছিল: ইরাকে প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করার মতলবে ঘাঁটি তৈরি করার জন্যে ইরাকের সীমান্তবর্তী লেবাননে এবং জর্ডানে বৃটিশ এবং মার্কিন সশস্ত্র শক্তি আক্রমণ-অভিযান চালিয়েছিল। ১৯৬১ সালে প্রাক্তন উপনিবেশ কঙ্গোর (কিন্‌শাসা) স্বাধীনতা ঘোষণার কার্যত পরদিনই সেখানে সাম্রাজ্যবাদী বেলজিয়মের ছত্রীবাহিনী অবতরণ করেছিল। ১৯৬৪ সালে বেলজিয়মের উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে মিলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কঙ্গোর আভ্যন্তরিক ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করেছিল — সেটার নাম হয়েছিল 'স্ট্যানলিভিলের হানা'।

১৯৬১ সালে ডিক্টেটর-শাসিত পর্তুগাল আফ্রিকায় তার উপনিবেশগুলিতে দেশভক্তদের বিরুদ্ধে পিটুনী অভিযান আরম্ভ করেছিল। ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌসৈন্যদল ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে আক্রমণ-অভিযান চালিয়েছিল। এর সঙ্গে বলা দরকার, বৃটেন ইতোমধ্যে দক্ষিণ আরবদেশে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন অস্ত্র-বলে চূর্ণ করার জন্যে বহু বছর যাবত চেষ্টা করে আসছিল।

যখনই কোন জাতি জাতীয় বিপ্লবের পরে মূলগত সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক সংস্কারের কর্মসূচি নিয়ে এগোয়, সেসব ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৬৭ সালে জুন মাসে আরব দেশগুলির বিরুদ্ধে ইস্রায়েলী আক্রমণের কারণ সেটাই। কেউ কেউ দেখাতে চায়, এটা যেন নিছক জাতিগত এবং ধর্মগত সংঘাত ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের সমর্থিত এই ইস্রায়েলী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হল মিসরী আরব প্রজাতন্ত্র এবং সিরিয়ার বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। তেল-আবিবের সমরবাদীরা ওয়াশিংটন এবং লন্ডনের পূর্ণ সমর্থন পায় এই কারণেই।

কোন জাতি জাতিগত অধীনতার জোয়াল ভেঙে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনকে সমাজতান্ত্রিক ধারায় পুনর্গঠনের কাজ হাতে নিলেই সমসাময়িক উপনিবেশবাদীরা সত্যিই একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বৈপ্লবিক কিউবার দিকে তাকালেই সেটা স্পষ্ট দেখা যায়: ১৯৫৯ সালে বাতিস্তার একনায়কত্ব উচ্ছেদ হবার পর থেকে কিউবার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ আর হানা চলে আসছে অবিরাম। ১৯৬১ সালে এপ্রিল মাসে কিউবার বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার জন্যে ওয়াশিংটন পাঠিয়েছিল ভাড়াটে প্রতিবিপ্লবী ঠগী দস্যুদল। ১৯৬২ সালে অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে কিউবা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ-অভিযানের নতুন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল — এবার খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তিই এই বিপদ সৃষ্টি করেছিল। এটাকেই বলা হত 'ক্যারিবিয়ান সংকট'। কিউবার বিপ্লব যে রক্ষা পেল এবং পৃথিবীজোড়া বিপর্যয় এড়ানো গেল তার কারণ হল কিউবার জনগণের আত্মবিশ্বাস আর নির্ভীকতা, সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল জন-সমাজের সমর্থন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান। তবু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাঝে মাঝে অসির ঝনৎকার তোলে — কিউবার বিপ্লব চূর্ণ করার পরিকল্পনা তারা ছাড়ে নি।

ভিয়েৎনামের বীর জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যে যুদ্ধ লাগিয়েছে সেটাই বিশ শতকের যাবতীয় ঔপনিবেশিক যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে বিকট, ভয়ংকর আর কলঙ্কজনক। ভিয়েৎনামের মাটিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যেসব অপরাধ করেছে সেগুলি থেকে দেখা যায়, কিভাবে, কোন গণতন্ত্রবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষভুক্ত শাসন-ব্যবস্থার প্রতি সমর্থনের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত 'নিরীহ' ঘোষণা দিয়ে আরম্ভ হয়ে নয়া-উপনিবেশবাদী কর্মনীতির দরুন শেষপর্যন্ত প্রায়ই ঘটে কোন জাতির দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিগ্রহ, সেই লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন সন্নিহিত এলাকা, পৃথিবীর নিরাপত্তা এবং শান্তি বিপন্ন হয়।

এইভাবে দেখা যায়, এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার মাটিতে রক্ত ঝরাবার জন্যে প্রায়ই চালু হয়ে যায় সমসাময়িক উপনিবেশবাদী সমরযন্ত্র। আমাদের একালে এখানে-ওখানে সাম্রাজ্যবাদীরা যেসব ঔপনিবেশিক যুদ্ধ বাধায় সেগুলি আর নিছক স্থানীয় তাৎপর্যসম্পন্ন ঘটনা নয়। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মুখে অনাবৃত অবস্থায় অবস্থিত এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার জাতিগুলি স্বার্থ-সংহতির সূত্রে সমাজতান্ত্রিক

দেশগুলি এবং আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এই কারণেই আজকালকার যেকোন ঔপনিবেশিক যুদ্ধ থেকে পৃথিবীজোড়া আগুন জ্বলে উঠবার ঝোঁক থাকে। এর থেকে দেখা যায়, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত দৃঢ়সংকল্প সংগ্রাম একই সময়ে বিশ্ব শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষারও সংগ্রাম।

ডাহা আক্রমণ ছাড়াও, সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি এবং জাতিগুলির জাতীয় ব্যাপারে অন্যান্য ধরনের হস্তক্ষেপ এবং জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের উপর অন্যান্য ধরনের চাপও সমসাময়িক উপনিবেশবাদ চালায়।

এইভাবে, কোন নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর্থনীতিক অবরোধ চালিয়ে নয়া-উপনিবেশবাদ অনেক সময়ে তাদের মতলব হাসিল করার চেষ্টা করে। ১৯৫৬ সালে মিসরের বিরুদ্ধে এই রকমের চাপই দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীরা — তখন সুয়েজ খাল জাতীয়করণ থেকে মিসরকে নিবৃত্ত হতে বাধ্য করার চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদীরা এই দেশে তৈল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল, এই দেশ থেকে তুলো কেনা কমিয়ে দিয়েছিল। ১৯৫৯ সালে ফ্রান্স তার প্রাক্তন উপনিবেশ গিনীর বিরুদ্ধে আর্থনীতিক অবরোধ চালিয়েছিল; আফ্রিকায় ভেঙে-যাওয়া ফরাসী সাম্রাজ্যের জায়গায় ফ্রান্স যে নতুন ঔপনিবেশিক সংগঠন খাড়া করছিল তাতে যোগ দিতে গিনী নারাজ হয়েছিল।

নবীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির কর্মনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীদের আরও একটা হাতিয়ার হল বিভিন্ন অনুদান এবং ঋণ। সাহায্য কর্মসূচির নামে যে অর্থ দেওয়া হয় সেটা প্রায়ই এই রকমের বিভিন্ন দেশে শাসক মহলগুলিকে দেওয়া রাজনীতিক ঘুষ ছাড়া কিছু নয়। গত দশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যত 'সাহায্য' তহবিল দিয়েছে তার মোটামুটি ৮০ শতাংশ গেছে সেইসব দেশে যেগুলি বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় চুক্তি এবং বিভিন্ন জোটের সদস্য হবার দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক এবং রাজনীতিক মিত্র। এগুলি হল প্রধানত — তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জনবিরোধী কর্তৃপক্ষ, আর সেণ্টো এবং সিয়াটোর সদস্য-দেশগুলির শাসক মহলগুলি। অন্যদিকে, সমসাময়িক উপনিবেশবাদীদের মর্জির পরিপন্থী কর্মনীতি অনুসরণ করেছে বলে কোন নতুন জাতীয় রাষ্ট্রকে 'শায়েস্তা করতে' হলে উপনিবেশবাদীরা ঐসব রাষ্ট্রে ঋণ এবং অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দেয়,

বিদ্যমান আর্থনীতিক চুক্তি অনুযায়ী দেয় সরবরাহ মুলতবি রাখে। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই রকমের 'পিটুনী ব্যবস্থা' প্রয়োগ করেছিল সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

যেখানেই সম্ভব উপনিবেশবাদীরা তাদের প্রতি অনুগত সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষ দাঁড় করায় এবং রাষ্ট্রপতি আর বিভিন্ন মন্ত্রীর গদিতে বসায় নিজেদের লোকজনকে। এইসব সাক্ষীগোপাল তাদের মনিবদের মর্জিমাফিক কর্মনীতি চালায়। কিন্তু তার ফলে কখনও কখনও উপনিবেশবাদীদের সঙিন কিংবা খয়রাত কিছুই ঐসব সাক্ষীগোপালের উল্টে যাওয়া ঠেকাতে পারে না — যেমন হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়ায় সিংম্যান রী'র একনায়কত্বের ক্ষেত্রে এবং তার দু'বছর পরে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ন্‌গো দিন্‌ দিয়েম চক্রের ক্ষেত্রে। এইভাবে জনগণের ক্রোধের দাপট সাম্রাজ্যবাদীদের বহু জীবকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়েছে — যেমন, ইরাকে নুরি এস্‌ সৈদ্‌ (১৯৫৮), কিউবায় বাতিস্তা (১৯৫৯), তুরস্কে মেন্দেরেস্‌ (১৯৬০), ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে ত্রুহিলো (১৯৬১), কঙ্গোয় (ব্রাজাভিলে) ফুল্‌বের ইউলু (১৯৬৩)।

তবে, এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার এখানে-ওখানে স্থানীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের ভিতর থেকে বেছে নেওয়া দালালদের সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন সরকারের নেতা হিসেবে বজায় রাখতে পেরেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সাক্ষীগোপাল সরকারটা তারই একটা নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

বিভিন্ন সাক্ষীগোপাল সরকার কায়েম করার এই কর্মনীতির দরুন বহু প্রতিক্রিয়াপন্থী চক্রান্ত-বলে ক্ষমতাদখলের ঘটনা ঘটেছে।

এইসব সশস্ত্র আক্রমণ, আর্থনীতিক অবরোধ আর ক্রয়সাধ্য সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষ, এই সবই মুক্ত দেশগুলির জাতীয় স্বার্থের একেবারে পরিপন্থী; এবং, মেহনতী জনগণের স্বার্থের বিরোধী, শুধু তাই নয়, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেটা স্থানীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থেরও বিরোধী। অর্থাৎ কিনা, সমসাময়িক উপনিবেশবাদীদের আচরিত রাহাজানের মতো পদ্ধতি সমাজের অতি নগণ্য অংশেরই সমর্থন পায়। প্রাক্তন উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলিতে এমনসব পদ্ধতি কেবল মুষ্টিমেয় সামন্ত-জমিদার কিংবা সামরিক-আমলাতান্ত্রিকদেরই রুচি অনুযায়ী।

এই প্রসঙ্গে এই সংশয় দেখা দেয় যে, উপনিবেশবাদের বিশেষভাবে উগ্র রূপ, যেমন, সশস্ত্র আক্রমণ, ইত্যাদি, কিসের লক্ষণ — তার শক্তির,

না, দুর্বলতার। এর মধ্যে দিয়ে অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক পরাক্রমের কোন মূল্যায়ন করা হচ্ছে না — কেননা, অতি আধুনিক সব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফৌজ আর নৌবাহিনী তাদের হাতে রয়েছে, সেটা তো জানা কথা। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানের শক্তি নিয়েই এ সংশয়।

এই দিকটা ইতোমধ্যে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, পৃথিবীজোড়া পরিসরে এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে উপনিবেশবাদ পশ্চাদপসরণ করছে। উপনিবেশবাদীরা যখন অনুভব করে তাদের পায়ের তলা দিয়ে মাটি সরে যাচ্ছে তখন তারা সশস্ত্র বলপ্রয়োগের পথ ধরে, সেটাও আমরা দেখিয়েছি। যেসব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে কিংবা সেটা করবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে সেসব দেশে উপনিবেশবাদের প্রধান সামাজিক অবলম্বনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই দৃঢ়োক্তির অর্থ সম্পর্কে এখন আমরা আরও কিছুটা বিশেষ-নির্দিষ্টভাবে বলতে পারি।

সাম্রাজ্যবাদীরা যখনই কোন দেশে স্থানীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের ক্ষুদ্র হীনানুগত জোটের মধ্যে থেকে সমর্থন বাগাবার চেষ্টা করে অমনি যথার্থ জাতীয় পরিসরে ঘৃণা এবং ক্রোধ ফেটে পড়ে, আর তখন তার জবাবে আসে উপনিবেশবাদীদের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ। তখন বলপ্রয়োগে কোন ফল হয় না — উপনিবেশবাদীরা সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে এই রকমেরই একটা পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ করে সেনেটর জে. উইলয়ম ফুলব্রাইট তাঁর দেশবাসীদের উদ্দেশে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন 'একটি যথার্থ জাতীয় বিপ্লবকে দমন করার নৃশংস এবং একরকম অসাধ্য কাজটা হাতে' না নেন।*

সমসাময়িক উপনিবেশবাদীরা যেসব সামরিক হঠকারিতা করেছে সেগুলি সম্বন্ধে এই মূল্যায়নের সঙ্গে সুস্থ-মনোভাবাপন্ন আরও অনেক বিশিষ্ট বুর্জোয়া লেখক এবং রাজপুরুষও একমত। কাজেই, ভিয়েৎনামে মার্কিন যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রগতিশীল এবং গণতন্ত্রীদের প্রতিবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ পুঁজির কিছু বিশিষ্ট সেনেটর এবং কংগ্রেস-সদস্য যে যোগ দিয়েছেন এতে অবাক হবার কিছু নেই — তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, ঐ রকমের গোঁয়ারতমির ফলে আজকের পৃথিবীতে, বিশেষত প্রাক্তন

---

* J. William Fulbright, *The Arrogance of Power*, New York, 1966. p. 119.

উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মান-মর্যাদা না বেড়ে বরং কমে যায়, ক্ষুণ্ণ হয়।

তাহলে আমাদের সংশয়ের নিরসন হয় -- আমরা স্পষ্ট বলতে পারি, এই সমসাময়িক উপনিবেশবাদীরা যে সশস্ত্র শক্তির এবং অন্যান্য হিংস্র পথ ধরে সেটা তারা শক্তিশালী বলে নয়: এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় তাদের অবস্থান সাধারণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেটাই অমন কাজ করার প্রবণতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, উপনিবেশবাদের অনিবার্য সর্বনাশ তাতে সূচিত হয়।

বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী মহলে বেশ কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট রাজনীতিক মুক্ত দেশগুলিতে তাদের বিভিন্ন কর্মনীতি যাতে সমর্থন পায় তার সামাজিক বনিয়াদ সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে। তাদের মতে, সেটাই হওয়া উচিত এশিয়ায়, আফ্রিকায় আর লাতিন আমেরিকায় পশ্চিমী শক্তিগুলির দীর্ঘমেয়াদী বা স্ট্র্যাটেজিক লক্ষ্য। সমসাময়িক উপনিবেশবাদের 'কড়া' পদ্ধতির সমালোচনায় তারা মাঝে মাঝে ঐ মতাবস্থানেই দাঁড়ায়। তারা বলে, অমন সব স্বেচ্ছাচারী জোরজবরদস্তির কর্তৃত্বপ্রয়াসী পদ্ধতি ছেড়ে, দীর্ঘকাল যাবত ধীরে-সুস্থে ধারানিবদ্ধভাবে মুক্ত দেশগুলিকে ভজাবার চেষ্টা করা দরকার। এই রকমের দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতির লক্ষ্য হল — প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে শেষপর্যন্ত এমনসব বড় বড় জনসমষ্টি এবং গণসংগঠন সৃষ্টি করা যাদের মতাদর্শ এবং রাজনীতিক সহানুভূতি 'পশ্চিমী জীবনযাত্রার' দিকে, অর্থাৎ কিনা, সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঘুরে যায়। এই দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতির সমর্থকেরা আশা করে, এইভাবে বিভিন্ন সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মহা ঝামেলার এবং লজ্জাকর রফাগুলো বাতিল ক'রে সেগুলোর বদলে মুক্ত দেশগুলিতে বিভিন্ন দায়িত্বশীল সামাজিক স্তরের সঙ্গে সুস্থিত মৈত্রী স্থাপন করা যাবে।

গত রাষ্ট্রপতি জন এফ. কেনেডির কার্যকালে ওয়াশিংটনে এই দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতির পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে নতুন স্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে আচার-ব্যবহারের একটা কর্মসূচি রচনা করা হয়েছিল; কেনেডির সামগ্রিক 'নতুন দিগন্ত' কর্মনীতিতে এটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি এবং জাপানের শাসক মহলগুলি এই কর্মনীতির কোন কোন দিক গ্রহণ করেছিল।

এই স্ট্র্যাটেজির আসল মর্মটা বের করতে চাইলে দেখা দরকার, নয়া-উপনিবেশবাদ তার অবস্থানগুলো গড়ে তোলার জন্যে নতুন স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ সামাজিক স্তর এবং রাজনীতিক শক্তির উপর নির্ভর করতে চায়?

যেসব দেশে বড় জাতীয় বুর্জোয়া আছে সেসব দেশে সেই বুর্জোয়াদের উপরই সাম্রাজ্যবাদীরা নির্ভর করে এটা তো জানা কথা। তবে, প্রাক্তন ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় এমন দেশের সংখ্যা খুবই কম — তাই, জাতীয় বুর্জোয়া যেখানে আগে থেকে নেই সেখানে সেটা গড়ে তোলাকেই সমসাময়িক উপনিবেশবাদীরা তাদের সমস্যার সমাধান বলে মনে করে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কই তারা 'জোড়কলম' বেঁধে দিতে চায়।

নয়া-উপনিবেশবাদীরা যে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক-আর্থনীতিক কর্মনীতি গ্রহণ করেছে, এটাই তার মর্ম, মুক্ত দেশগুলিকে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরে বজায় রাখাই এই কর্মনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য; ঐ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজি ঐ দেশগুলির উপর শোষণ চালাতে পারে এবং তাদের কোন অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের কর্মসূচি গ্রহণ করা বন্ধ করতে পারে।

যেসব তত্ত্বজ্ঞ এই স্ট্র্যাটেজি গড়ে তুলেছে তারা ঐ লক্ষ্যসাধনের উপায় দেখাতে প্রস্তুত। তারা বলে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে দিতে হবে কিছু কিছু 'সুবিধা' — যেমন, তাদের নিরপেক্ষতা এবং গোষ্ঠীবহির্ভূত থাকার কর্মনীতি বরদাস্ত করা। এই রকমের কোন প্রাক্তন ঔপনিবেশিক কিংবা আধা-ঔপনিবেশিক দেশ কোন রকমের সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করে থাকলে সেখানকারও বুর্জোয়া এবং পেটি বুর্জোয়াদের ভজাবার চেষ্টা করার কথা অবধি এরা বলে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 'সাহায্য' দেওয়াই এই নয়া-উপনিবেশবাদী স্ট্র্যাটেজির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

প্রাক্তন ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় এখন যেসব গভীর সামাজিক-আর্থনীতিক প্রক্রিয়া চলেছে সেগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে এই 'সাহায্য'টাকেই নয়া-উপনিবেশবাদীরা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলে মনে করে।

কেন যে তারা এটাকে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলে মনে করে সেটা নিয়ে পাঠকের মনে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে — কেননা, আমরা আগেই দেখেছি, বিভিন্ন সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষের আর্থিক অবস্থায় ঠেকনো দেবার জন্যে সাম্রাজ্য-

বাদীরা মুক্তহস্তে বিভিন্ন অনুদান এবং ঋণ ব্যবহার করে — কাজেই, ঐ দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতিতে যা দরকার সেইভাবে লোকসংখ্যার বিস্তৃত স্তর, বিশেষত বুর্জোয়া এবং পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রী না হয়ে তার ফলে মৈত্রী পুষ্ট হয় প্রতিক্রিয়াপন্থী সামন্ততান্ত্রিক আর সামরিক মহলের উপরতলার সঙ্গে। তবে, প্রকৃতপক্ষে, এক রকমের আন্তর্জাতিক উৎকোচ হিসেবে 'সাহায্য'টাকে ব্যবহার করা ছাড়াও, গ্রহীতা দেশের উপর কঠোর রাজনীতিক কিংবা সামরিক বাধ্যবাধকতা না চাপিয়েও, সাম্রাজ্যবাদ ক্রমে বেশি বেশি মাত্রায় ক্রেডিট এবং অনুদান দিচ্ছে। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়েছে; অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতায় মুক্ত দেশগুলির ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণই বহুলাংশে তার কারণ। প্রকৃতপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের যে সংযত করতে এবং প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিকে কিছু কিছু সুবিধা দিতে বাধ্য হচ্ছে তার কারণ এই দেশগুলি এখন সার্বভৌম রাষ্ট্র, তারা সমান অধিকার এবং পারস্পরিক লাভজনক শর্তে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে প্রয়োজনমতো ক্রেডিট, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম পেতে পারে. তদনুসারে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিভিন্ন পশ্চিমী শক্তি অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত কম সুদে আরও দীর্ঘমেয়াদী ক্রেডিট দেওয়া সংগত মনে করেছে। তার বদলে সাম্রাজ্যবাদী পাওনাদার শক্তিগুলি একটা শর্ত দেয় -- একটা মাত্র শর্ত। শর্তটা হল এই: গ্রহীতা দেশগুলিকে বিভিন্ন বুর্জোয়া সংস্কারের কর্মসূচি রূপায়িত করতে হবে, যাতে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি বিকশিত হয় এবং স্থানীয় বুর্জোয়াদের শক্তি বাড়ে।

তারা যে 'সাহায্য' দেয় তার এই উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাই কখনও কখনও বেশ খোলাখুলি, কখনও কখনও সামান্য চাপা আভাস দিয়ে আলোচনা করে। যেমন, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি লুব্‌কে বলেছিলেন, পশ্চিম জার্মান 'সাহায্য' দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে একটা মধ্য শ্রেণী সৃষ্টির বনিয়াদ গড়ার চেষ্টা হয়।* আর এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন পররাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্ক বলেছিলেন: '...আমাদের নিজেদের স্বার্থ এবং উন্নততর পৃথিবীর জন্যে আমাদের আশা আমাদের সহায়-সম্বলে অন্যান্যদের ভাগীদার করতে আমাদের বাধ্য করে।

---

* *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, Jan. 9, 1962.

যেসব 'কলকাঠি' অন্যান্যকে অবমানিত, মর্মাহত করে, কিংবা তাদের স্বাধীনতা খর্ব করে সেগুলি ছাড়াই সেটা করার চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কিন্তু আমরা মনে করি, আমাদের বিনিয়োগ হওয়া চাই উপযুক্ত বিনিয়োগ, আমরা মনে করি, আমাদের একটাকিছু অবলম্বন যেন দেওয়া হয়...'* এই 'একটাকিছু'ই হল মোদ্দা কথা। মার্কিন 'সাহায্য' কর্মনীতির ভাষ্যকারেরা সবাই একমত যে, ঐ অস্পষ্ট 'একটাকিছু' বলতে বুর্জোয়া প্রকৃতির সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থাবলির একটা ধাঁচই বুঝানো হয়। কাজেই, যেসব দেশ পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ঘটাবার সবচেয়ে স্পষ্ট লক্ষণ দেখায় তারাই গত কয়েক বছর যাবত মার্কিন ক্রেডিট আর অনুদানের ক্রমাগত বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পেয়ে আসছে, এটা কিছু আপতিক ব্যাপার নয়।

সমসাময়িক উপনিবেশবাদের এই দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতিরচয়িতারা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 'টেকনিকাল সাহায্য' দেবার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের এক রকমের মতাদর্শগত সম্প্রসারণের একটা ছদ্মাবরণ হল এই 'টেকনিকাল সাহায্য'; মুক্ত দেশগুলিতে জাতীয় কর্মীদের তালিম দেওয়া থেকে এটা আরম্ভ হয়, আর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি থেকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে পাঠানো হয় নানা বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা আর ট্রেনিংদাতা।

এইসব দেশে টেকনিশিয়ন, ডাক্তার, শিক্ষক, অর্থনীতিবিৎ এবং প্রশাসনিক কর্মীর যথার্থই নিদারুণ ঘাটতি আছে। ঔপনিবেশিক রাজগুলি এইসব দেশে যেসব আপদ রেখে গেছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বোধহয় এটাই। যেমন, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ইঞ্জিনিয়রের অনুপাত হল লোকসংখ্যার প্রতি লাখে এক কিংবা তিন জন, আর শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে ঐ সংখ্যাটা ৪০ অবধি।

এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে টেকনিকাল বুদ্ধিজীবিসমাজ এবং সরকারী কর্মী-কর্মচারীদের ট্রেনিং দেবার কাজে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করবার চেষ্টা করছে। এরই সঙ্গে সঙ্গে, তাদের প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-

---

* *Highlights of President Kennedy's New Act for International Development*, Washington, 1961, p. 8.

উপনিবেশগুলিতে ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সরকারী কাজের প্রধান প্রধান পদে তাদের নিজেদের বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টা বসাবার জন্যে এবং এইসব দেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেদের দালালদের ঢুকিয়ে দেবার জন্যে তারা ব্যবস্থা অবলম্বন করছে।

এই মতলব হাসিল করার জন্যে তারা নিজেদের কলেজ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে ঐসব তরুণ-তরুণীদের ভর্তি করছে। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময় নাগাত ঐসব দেশের মোটামুটি ১,৭০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পড়াশুনা করছিল। ঐ একই মতলবে শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বছরে ৩,০০,০০০ অবধি বিশেষজ্ঞ পাঠানো হচ্ছে। এইসব কার্যকলাপে জড়িত বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে রয়েছে কুখ্যাত 'পীস্ কোর' — এই সংগঠনের সদস্যদের মুক্ত দেশগুলিতে প্রধানত মধ্য বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক হিসেবে কাজে লাগানো হয়।

সমসাময়িক উপনিবেশবাদ এইভাবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার জাতিগুলিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে, মুক্ত দেশগুলির যত বেশি সম্ভব লোকের মনে বুর্জোয়া ব্যবস্থা এবং পশ্চিমী জীবনযাত্রা-প্রণালীর প্রতি হীন প্রীতি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। নিজেদের উপদেষ্টা এবং বিশেষজ্ঞদের মারফত কাজ চালিয়ে এই সমসাময়িক উপনিবেশবাদীরা নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির উপর আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক বিকাশের বুর্জোয়া ব্যবস্থাপত্র চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

সমসাময়িক উপনিবেশবাদীরা মুক্ত দেশগুলির উদ্দেশে অবিরাম যে প্রচার চালায় সেটা থেকে 'টেকনিকাল সাহায্যে' পার্থক্য আছে — এই যে 'সাহায্য'কে আমরা আগেই বলেছি এক রকমের সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শগত সম্প্রসারণ। ঐ প্রচারে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় সাহিত্য — এই সাহিত্যে পশ্চিমী, অর্থাৎ কিনা, পুঁজিতান্ত্রিক জীবনযাত্রাপ্রণালীর মহিমাকীর্তন করা হয়; ব্যবহার করা হয় রেডিও সম্প্রচার — তাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিভিন্ন কর্মনীতির গুণগান করা হয়; তাছাড়া প্রচারের অন্যান্য প্রচলিত উপকরণ ব্যবহার করা হয়। এই প্রচারে মুশকিল হল এই যে, এটা বিশেষ কারও উদ্দেশে করা হয় না, বরং এটা করা হয় একই সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার সমস্ত জাতির উদ্দেশে, কে যে, ধরা যাক, *Voice of America* সম্প্রচার শুনছে, কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

State Department Information Service থেকে প্রচারিত পুস্তিকাগুলো কে পড়ছে না-পড়ছে, সেটা কিছুতেই বলা যায় না। কিন্তু 'টেকনিকাল সাহায্যে'র বেলায় তেমন নয়: এক্ষেত্রে গ্রহীতা কে সেটা নির্দিষ্টভাবে জানা থাকে। মুক্ত দেশগুলির তরুণ কর্মীদের মাথায় মতবাদ ঢুকিয়ে দেওয়াতেই তার মতলবটা সীমাবদ্ধ নয়: এর একটা সাংগঠনিক দিকও আছে — এখানে-ওখানে হরেক রকমের 'সমিতি' গড়া হয়, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজের স্নাতকদের সমিতি, কিংবা পশ্চিম জার্মানিতে হাতে-কলমে ট্রেনিং-পাওয়া ইঞ্জিনিয়রদের সমিতি, ইত্যাদি। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় নয়া-উপনিবেশবাদীদের একটা সমর্থক স্তর পাবার মতলবেই এটা করা হয়।

তাহলে দেখা গেল, মুক্ত দেশগুলিতে সামাজিক-আর্থনীতিক প্রক্রিয়াগুলি এবং এসব দেশের জাতিগুলির আত্মিক বিকাশ, এই দুইয়েরই উপর সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার উদ্দেশ্যেই নয়া-উপনিবেশবাদীদের দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতি রচিত হয়েছে।

এই দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতির আখের মতলব হল মুক্ত দেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্র কায়েম করা — সেটা ঐসব জাতির জাতীয় স্বার্থের ঘোর পরিপন্থী; জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের বর্তমান পর্বে এইসব জাতি ক্রমাগত বেশি মাত্রায় বিকাশের অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক দুনিয়ার জনসংখ্যার বিভিন্ন বিস্তৃত স্তর বিকাশের এই অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থার জন্যে আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে — কেবল মেহনতিরা নয়, বিভিন্ন পেটি বুর্জোয়া গ্রুপও, তার মধ্যে বুদ্ধিজীবিসমাজের বিভিন্ন বিপ্লবী-গণতন্ত্রীরা, অফিসারেরা, কারিকরেরা, ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদীরা যে নির্ভরযোগ্য সামাজিক সমর্থন খুঁজছে সেটা তারা এদের মধ্যে পেতে পারে না। কাজেই, যা প্রকৃত অবস্থা তাতে তাদের ঐ দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতি অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়ালে, মতলব হাসিল করার অন্য কোন উপায় না থাকায় সমসাময়িক উপনিবেশবাদীরা আবার সামরিক চাপ কিংবা রাজনীতিক ব্ল্যাকমেইলের বিভিন্ন কঠোর পদ্ধতি ধরেছে।

এইভাবে এই সমসাময়িক উপনিবেশবাদীদের আচরণে একটা দ্বন্দ্বের উপাদান রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির দাবি সম্বন্ধে তারা সহনশীলতা দেখায়, এমনকি দাবি মেনেই নেয়। কিন্তু অন্যান্য

ক্ষেত্রে তারা এইসব রাষ্ট্রের উপর কঠোর দমন-পীড়ন চালায়। খুব যথাযথভাবে বলতে গেলে, এতে দ্বন্দ্বাত্মক কিছু নেই: নয়া-উপনিবেশবাদীদের দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতি এবং দৈনন্দিন কর্মকৌশল এই দুইয়েতেই রয়েছে মুক্ত দেশগুলির আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ: এই হস্তক্ষেপের রূপটা শুধু বদলায়। তার উপর, যেসব ক্ষেত্রে সমসাময়িক উপনিবেশবাদ জোর-জবরদস্তি চালায় না সেসব ক্ষেত্রেও মুক্ত দেশগুলির পক্ষে তার আশঙ্কাটা কমে যায় না। কেননা, নয়া-উপনিবেশবাদ যখন অতি ভদ্র ভেক ধরে তখনও যেসব জাতি বৈদেশিক রাজনীতিক দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করেছে তাদের উপর পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের জোয়াল চাপিয়ে দেওয়াই তার মুখ্য লক্ষ্য।

সমসাময়িক নয়া-উপনিবেশবাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই বিচার-বিশ্লেষণ শেষ করার আগে বলা দরকার যে, এটা হল একটা সুনির্দিষ্ট আর্থনীতিক বনিয়াদের উপর একটা উপর-কাঠাম। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলির নিম্নতর এবং শোষিত অবস্থা সংক্রান্ত প্রধান প্রধান দিকগুলি নিয়ে এই বিশ্লেষণের মধ্যে আগের একটা অংশে বিচার করা হয়েছে। আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির লোক-বল এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজি এবং একচেটিয়া পুঁজির শোষণই নয়া-উপনিবেশবাদের দাঁড়াবার আর্থনীতিক বনিয়াদ। এই বনিয়াদেরই উপর দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন সামরিক জোট এবং মৈত্রীর উপর-কাঠামটা, ডাহা হস্তক্ষেপ, বিভিন্ন সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষকে গদিয়ান করা, গুরুভার ঋণ দেবার কর্মনীতি, স্থানীয় বুর্জোয়াদের ভজাবার দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতি, ইত্যাদি।

এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ এখনও অর্থনীতিগতভাবে সুরক্ষিত হয়ে কায়েম আছে। এইসব দেশের মোট বহির্বাণিজ্যের মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশ চলে শিল্পে-অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে। প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশ-গুলিতে বৈদেশিক একচেটিয়া পুঁজির সরাসরি বিনিয়োগের পরিমাণ লিখতে এগারোটা অঙ্ক লাগে। সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির দেওয়া বিভিন্ন ক্রেডিট বাবত মুক্ত দেশগুলির জাতীয় ঋণের পরিমাণও তেমনি বিপুল। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে আর্থনীতিক সম্প্রসারণের এইসব মূল উপাদানগুলি ব্যবহার ক'রে সাম্রাজ্যবাদ তার

প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে রাজনীতিক, সামরিক এবং মতাদর্শগত আক্রমণাত্মক অভিযানে নির্দিষ্ট সাফল্য লাভ করেছে।

মুক্ত দেশগুলির ভাগ্যক্ষেত্রে নয়া-উপনিবেশবাদীদের কর্মনীতির কি ক্রিয়া ঘটে সেটা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এই পরিচ্ছেদের গোড়ায় বলা হয়েছে, উপনিবেশবাদ বরাবরই এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার জাতিগুলির পয়লা নম্বরের শত্রু ছিল এবং এখনও তাই রয়েছে। তার বিশেষভাবে নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি ঘটে কিভাবে সেটা এখন প্রতিপাদন করা যেতে পারে। অবশ্য গোড়ায়ই বলা দরকার, তার অভিব্যক্তি ঘটে আর্থনীতিক শোষণে, এই শোষণের দরুন মুক্ত দেশগুলি তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের একটা মোটা অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, যে-সম্পদ তাদের আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্যে এত জরুরী দরকারী জিনিস। সামরিক আক্রমণের সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি মুক্ত দেশগুলির জাতীয় প্রগতির পথে আরও একটা প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে — যেহেতু সামরিক খরচখরচা বাবত গুরুত্বসম্পন্ন পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করার দরকার হয়। সেটা ঘটে যখন সাম্রাজ্যবাদীদের কোন সামরিক জোটে জড়িত দেশের কাছে তারা সেটা দাবি করে সরাসরি, কিংবা যখন সীমান্তে বিপজ্জনক পরিস্থিতির দরুন কোন শান্তিপূর্ণ দেশ তার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বাড়িয়ে তুলতে বাধ্য হয়। এইভাবেও সাম্রাজ্যবাদ তার প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির সামাজিক প্রগতির শত্রু। কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ ঐসব দেশের আভ্যন্তরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপের অতি রূঢ় ব্যবস্থা ধ'রে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই বলপ্রয়োগ ক'রে সামন্ত-জমিদার মহলের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের ক্ষমতায় বসায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে যখন ইতোমধ্যে সাধিত বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থাবলি পুঁজিতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থাবলিরই অনুরূপ হয়ে উঠতে থাকে তখন সাম্রাজ্যবাদ ব্যক্তিগত পুঁজিকে সর্বাত্মক সহায়-সমর্থন দেয় এবং তার শক্তি বাড়াবার জন্যে কোন চেষ্টারই ত্রুটি করে না। মুক্ত দেশগুলিতে জাতিগুলির মধ্যে দেশপ্রেমিক এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দমন করা, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া ব্যবস্থা এবং 'পশ্চিমী জীবনযাত্রাপ্রণালী'র 'শ্রেষ্ঠত্ব' সম্বন্ধে প্রত্যয় সৃষ্টি করাই উপনিবেশবাদী মতাদর্শগত সম্প্রসারণের লক্ষ্য।

কাজেই, উপনিবেশবাদ যেকোন রূপে ধারণ করুক না কেন, সেটা মুক্ত দেশগুলির কাছে প্রতিক্রিয়াশীলতারই সমার্থ শব্দ।

বিভিন্ন ঘটনায় দেখা গেছে, সমসাময়িক উপনিবেশবাদীদের যেসব সাফল্য ঘটেছে সেগুলো সাধারণত সুস্থিত হয় নি। আমরা বারবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখিয়েছি, আমাদের একালে উপনিবেশবাদের দূরপাল্লার ভবিষ্যৎ স্পষ্টতই অন্ধকার। পৃথিবীতে এখনকার শক্তির অনুপাত সাম্রাজ্যবাদের অনাচার চালাবার ক্ষেত্রটাকে ক্রমেই আরও বেশি সীমাবদ্ধ করে ফেলছে। সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মর্জিমাফিক বিভিন্ন জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারত — সেদিন চলে গেছে।

অধিকন্তু, বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থা এমন যাতে জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলি উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে একটার পরে একটা জয়লাভ করতে পারে। অর্থাৎ কিনা, সশস্ত্র শক্তি বাড়িয়ে, কিংবা এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় মতলব হাসিল করার জন্যে নিজেদের আর্থিক আর বৈষয়িক সম্বল-সংস্থান থেকে আরও হুণ্ডি কেটে, কিছুতেই সাম্রাজ্যবাদীরা জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের পক্ষে পাল্লা ভারি করতে পারে না। বরং তার উল্টো হচ্ছে: সমসাময়িক উপনিবেশবাদীরা যত অস্ত্রশস্ত্র আর ডলার জড়ো করছে সেটা দেখা যাচ্ছে তাদের বাঞ্ছিত ফল লাভের পক্ষে ক্রমেই আরও কম কার্যকর হচ্ছে — তাদের বিভিন্ন সামরিক হঠকারিতার বহু ব্যর্থতা থেকে সেটা দেখা যাচ্ছে, যেমন, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন সামরিক শক্তির বিপুল সমাবেশ করা সত্ত্বেও তারা সে দেশে দেশপ্রেমিক আন্দোলনের সঙ্গে এ'টে উঠতে পারে নি।

ন্যায্য লক্ষ্যসাধনের জন্যে লড়াইয়ে জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির দৃঢ়সংকল্প এবং অধ্যবসায়েরই উপর সব নির্ভর করছে। মুক্ত দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের 'সাহায্য' দেবার বিষয়টাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে। নয়া-উপনিবেশবাদের দীর্ঘমেয়াদী কর্মনীতিওয়ালারা আশা করে, দরাজ হাতে ঋণ আর অনুদান দিয়ে তারা শেষপর্যন্ত নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সুনজরে পড়বে এবং ঐ রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদ-ঘে'ষা অবস্থান আর পুঁজিতান্ত্রিক ধারায় বিকাশ সুনিশ্চিত হবে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে যত ডলার, স্টার্লিং আর ফ্রাঁ ঢালে সেটা এই মতলব হাসিল করার জন্যেই। কিন্তু তাই বলে তাদের এই মতলব হাসিল হয়ই এমন নয়। বিভিন্ন সার্বভৌম অধিকার এবং জাতীয়

স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে মুক্ত দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি থেকে পাওয়া তহবিল এমনভাবেও ব্যবহার করতে পারে যাতে সেটা নয়া-উপনিবেশবাদী অনুপ্রবেশের সহায়ক না হয়ে জাতীয় অর্থনীতির শক্তি বাড়াতে সহায়ক হয়।

আরও একটা তথ্য দেখা যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই মুক্ত দেশগুলির ছাত্রদের ভরতি করে — এই ছাত্রদের অনুগত দালাল বানাতে পারবে বলে তারা প্রত্যাশা করে। কিন্তু এই প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হবে বলে তারা কখনও নিশ্চিত থাকতে পারে না। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বহু ছাত্র বিভিন্ন পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে পরে সাম্রাজ্যবাদ আর নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প সংগ্রামী হয়ে উঠেছে, এটা একটা নির্ধারিত তথ্য। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে জনগণের জন্যে রাজনীতিক আত্মসচেতনা বাড়ছে — তার অর্থ হল এই রকমের পরিস্থিতি ঘটবে আরও ঘন ঘন।

কাজেই, বর্তমান ঐতিহাসিক বিন্যাসে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন নয়া-উপনিবেশবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামও চালাতে পারে, এর ফলে শেষপর্যন্ত রাজনীতিক উৎপীড়ন, সামরিক আদেশ-নির্দেশ আর আর্থনীতিক শোষণ থেকে পরিত্রাণ আসে — অবশ্য এই আন্দোলন যদি শান্তি, সমাজতন্ত্র এবং আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের শক্তিগুলির সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে চলে।

নয়া-উপনিবেশবাদের অস্তিত্বটাকে বুর্জোয়া লেখকদের আজকাল স্বীকার করতে হচ্ছে। তাঁদের একজন বলেছেন: 'চূড়ান্ত রূপের নয়া-উপনিবেশবাদের অর্থ হল এই যে, এমনসব লোক রয়েছে যারা উপনিবেশবাদের পুরন ব্যবস্থাটা ছাড়তে রাজি এবং নতুন নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় — সেটা সাধারণত আর্থনীতিক ধরনের — যাকে বলা হয় 'খিড়কি দিয়ে উপনিবেশবাদ'।'* আসল কথাটা হল এই যে, আফ্রিকায় নয়া-উপনিবেশবাদ চলেছে ফলাও। কোন কোন আর্থ এবং অন্যান্য শক্তি আধিপত্য লাভ করেছে, কিংবা তা করবার চেষ্টায় আছে। 'নয়া-উপনিবেশবাদ আফ্রিকানদের উদ্ভট কল্পনা কিংবা কমিউনিজমের উদ্ভাবনা

---

* *African Affairs,* London, Vol. 63, No. 252, July 1964, p. 194.

মাত্র নয়।'* কোন কোন বুর্জোয়া লেখক অবশ্য বাস্তবতার বিরোধিতা ক'রে নয়া-উপনিবেশবাদ বলে কিছু নেই এই মর্মে দৃঢ়োক্তি করে। যেমন, উন্নয়নশীল দেশগুলির উদ্দেশে ব্রায়ান্ ক্রোজিয়ে বলেন, ঐ দেশগুলি 'তিক্ততা আর অবিশ্বাসের ঔপনিবেশিক অতীত ছেড়ে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি এবং প্রাক্তন সাম্রাজ্যিক শক্তিগুলির মধ্যে নতুন এবং আরও সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলুক', আর এই সম্পর্ককে বলা হোক 'পারস্পরিক নির্ভরশীলতা'।**

সংজ্ঞাবদ্ধ করে বলা যায়, নয়া-উপনিবেশবাদ হল আর্থনীতিক বিচারে অনগ্রসর দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণেরই অনুবৃত্তি — যদিও তাতে উপায়-উপকরণ খাটানো হয় ভিন্ন রকমের। শোষণের বিভিন্ন রূপ আর প্রণালী বদলেছে — সেটা বদলেছে দু'রকমের উপাদানের প্রভাবে: সমসাময়িক পুঁজিতন্ত্রের বিভিন্ন কাঠামগত পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আভ্যন্তরিক উপাদান, আর বিভিন্ন বাইরের উপাদান, সেগুলির মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক হল দুটো — সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান পরাক্রম, আর জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার। নয়া-উপনিবেশবাদী কর্মনীতি খাটিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা গণতান্ত্রিক জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সামাজিক মর্মবস্তুটাকে কেড়ে নিতে চায় এবং উত্থানশীল রাষ্ট্রগুলিকে অধিকারের সমানতা না দিয়ে তাদের পুঁজিতান্ত্রিক গণ্ডির মধ্যে বজায় রাখতে চায়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 'পুঁজিতন্ত্র কায়েম করার জন্যে' এবং আগে-উৎপীড়িত জাতিগুলির স্বাধীন বিকাশের কর্মসূচি ধরা বন্ধ করার জন্যে তারা বেপরোয়া হয়ে চেষ্টা করছে। সমসাময়িক উপনিবেশবাদের প্রধান ঘাঁটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; আন্তর্জাতিক ঠেঙাড়ে পুলিস এবং জাতীয় মুক্তির জন্যে যারা লড়ছে সেইসব জাতির জল্লাদ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ সর্বত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যারা ওকালতি করে তারা এশিয়ায় আর আফ্রিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা বিশেষ স্বার্থের কথা বলতে বড় ভালবাসে — এই বিশেষ স্বার্থটা নাকি ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির স্বার্থ থেকে ভিন্ন রকমের। এইসব অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকলাপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিস্তর বেড়ে গেছে — আর ঐ প্রবক্তারা দেখাতে

---

* *African Affairs*, London, Vol. 63, No. 252, July 1964, p. 194.

** Brian Crozier, *Neo-Colonialism. A Background Book*, London, 1964, p. 112.

চেষ্টা করে, এই কার্যকলাপ কেবল কমিউনিজমকে 'গণ্ডিবদ্ধ করে রাখার' কর্মনীতিপ্রসূত, তারা অসমীয়ক উক্তি করে বলতে চায় 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোট কিংবা, এমনকি, বন্ধুত্বও হতেই হবে সেটা অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট নয়', 'তা হবার দরকারও নেই'।*

মার্কিন নয়া-উপনিবেশবাদের মতাদর্শওয়ালারা বলে, এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মনীতিকে পরস্পরবিরোধী দুটো বিকল্পের একটাকে বেছে নিতে হবে: হয়,—উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিকে রাজনীতিক স্বাধীনতা দেবার পক্ষে ঘোষণা করতে হবে, সেটা অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির সহায়ক হবে, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয় বাড়বে, আর নইলে, — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাই বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া চলবে না, যাতে পুরন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি অসন্তুষ্ট না হয়, তাদের আর্থনীতিক স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, আর পশ্চিমী মিত্রদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক বিপন্ন না করে। তবে, শেষপর্যন্ত আরও বেশি মুনাফার জন্যে কামনাই জিতে যায়: প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রেট বৃটেন আর ফ্রান্সকে ধাক্কা মেরে হটিয়ে দিতে এবং মুক্ত দেশগুলির যেখানেই সম্ভব নিজস্ব একক আধিপত্য কায়েম করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা দ্বিধা করে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এশিয়ায় (মোটামুটি আঠারো শতকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে) এবং আফ্রিকায় (প্রধানত উনিশ শতকের শেষের দিকে) উপনিবেশ নিয়ে কাড়াকাড়িতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় শক্তিগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি। প্রথমত, আঠারো শতকের শেষ দশক অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই ছিল বৃটেনের উপনিবেশ; দ্বিতীয়ত, পুঁজিতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে তার বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল অনেক পরে। পুয়ের্তো রিকো, ফিলিপাইন এবং হাওয়াই গ্রাস করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষপর্যন্ত ঔপনিবেশিক আগ্রাসনে নেমেছিল, কিন্তু, দৃষ্টান্তস্বরূপ, গ্রেট বৃটেন আর ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের সঙ্গে তার কোন তুলনা চলে না — এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশের মোট আয়তন ছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বোধহয় এক শতাংশ, আর ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ২·৫ শতাংশ।

---

* *The U.S. and the Middle East,* ed. by Georgiana G. Stevens, New York, 1964, p. 175 দ্রষ্টব্য।

এটা পুষিয়ে নেবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি করল সেই যাকে বলা হয় তার নিজস্ব 'অদৃশ্য' ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম বিশিষ্ট নেতা উইলিয়ম জেড. ফস্টার বলেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনিবার্যভাবেই বিভিন্ন আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক নিয়ন্ত্রণের যে নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে সেটা প্রকৃত পক্ষে জাতিগুলিকে পদানত করার জন্যে আগেকার বৃটিশ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের অপেক্ষাকৃত স্থূল পদ্ধতিগুলির চেয়ে বেশি কার্যকর।'*

বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিতর থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরং ঐ যুদ্ধ থেকে বিপুল পরিমাণ মুনাফা করে নিয়েছিল। কিন্তু, এক সময়ে প্রবল পরাক্রমশালী উপনিবেশভোগী শক্তি বৃটেন এবং ফ্রান্সের জাতীয় অর্থনীতি যুদ্ধের পরে বদ্ধ দশায় পড়ে গিয়েছিল, সেই অবস্থা চলেছিল কয়েক বছর ধরে। যুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠল একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের একটা মজবুত ঘাঁটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের অবস্থানগুলিকে মজবুত করে নিল এবং হয়ে উঠল পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতা।

শুধু উপনিবেশগুলির উপর নয়, উপনিবেশভোগী দেশগুলির উপরও আধিপত্য কায়েম করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বিরূপ নয়, তারা যেন তাদের পুরন প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঠেলে হটিয়ে দিয়ে পৃথিবীটাকে নতুন করে ভাগাভাগি করার বড় সাধের স্বপ্ন সার্থক করবার অবস্থায় এসে গেল। আসলে, তাদের লক্ষ্যও তাদের পশ্চিম ইউরোপীয় হিস্‌সাদারদেরই মতো একই, তবে, মতলবটা তারা হাসিল করতে চায় নতুন নতুন কায়দায় — কেননা, সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনের পুরন ধরনগুলোর দিন আর নেই। আমেরিকার একজন প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদ জেম্‌স এস. অ্যালেন আফ্রিকায় মার্কিন একচেটিয়া কারবারগুলির বিভিন্ন কর্মনীতি সম্বন্ধে লিখেছেন: 'আফ্রিকার সমগ্র ঔপনিবেশিক গড়ন বজায় রাখায় এখন ওঅল স্ট্রীটের ব্যাঙ্কারদের প্রবল কায়েমী স্বার্থ রয়েছে, যাতে লুটের মালে নিজেদের বখরাটা বাড়ে, তারা কেবল সেইসব পরিবর্তনেরই পক্ষে।'**

---

* William Z. Foster, *The Twilight of World Capitalism*, New York. 1949, p. 32.

** *Political Affairs*, September 1960, p. 2 দ্রষ্টব্য।

অবস্থা বদলে গেল বলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক আধিপত্যের পুরন, সেকেলে ধরনধারন ব্যবহার করতে পারে না: এসে গেল সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা, তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব পড়তে থাকল পৃথিবীর ঘটনাবলির উপর: উপনিবেশ এবং নির্ভরশীল দেশগুলিতে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন আগেকার যেকোন সময়ের চেয়ে বিস্তৃততর পরিসরে সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকল। এই নতুন অবস্থায় নতুন নতুন পদ্ধতির দরকার দেখা দিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকায় নয়া-উপনিবেশবাদী কর্মনীতির যেসব রূপ আর পদ্ধতি নিয়ে চলছিল সেইগুলিকেই তারা এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে খাটাতে আরম্ভ করল।

ইদানীং বুর্জোয়া প্রচারে জিদ ধরে বলা হয়েছে যে, মুক্ত দেশগুলিতে রাজনীতিক অসুবিধাগুলি এবং আরও বেশি মাত্রায় আর্থনীতিক অসুবিধাগুলি ঘটছে তার কারণ বৃহৎ শক্তিগুলির সক্রিয় সাহায্য অপ্রতুল। ঐ প্রচারে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য টানা হয় না, তাতে বলা হয় সোভিয়েত ইউনিয়নও যেন আলোচ্য দেশগুলির সামাজিক এবং আর্থনীতিক বিকাশে পিছিয়ে থাকার জন্যে দায়ী। পুঁজিতান্ত্রিক পশ্চিমে, এমনকি কোন কোন উন্নয়নশীল দেশেও এই পিছিয়ে থাকা বিকাশ নিয়ে আলোচনার মধ্যে এমন মত প্রকাশ করা হয় যে, সুদীর্ঘকালের নির্মম সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির যেসব ক্ষতি হয়েছে সেটা পূরণ করার জন্যে সমাজতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী দু'রকমেরই শিল্পে-অগ্রসর রাষ্ট্রগুলির সমান-সমান অংশ নেওয়া উচিত। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থনীতিক দশার জন্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কোন দায়িত্বই নেই, ঐ দশা হল ঔপনিবেশিক আধিপত্য এবং নয়া-উপনিবেশবাদী কর্মনীতিরই ফল। কাজেই, সমাজতান্ত্রিক আর সাম্রাজ্যবাদী সমস্ত 'ধনী' রাষ্ট্রকে একত্রে তালগোল পাকিয়ে, বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয় চুক্তি অনুসারে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তা দেবার জন্যে উভয় রকমের রাষ্ট্রগুলির কাছে একই রকমের দাবি করার কোনই কারণ নেই।

অতীতে এবং এখনও উদীয়মান দেশগুলি এবং অগ্রসর শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলির আর্থনীতিক উন্নয়নের মাত্রার পার্থক্যের উদ্ভবের কারণ হল পুঁজিতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থা। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরে অনগ্রসর দেশগুলির ভূমিকাটাকে কাঁচামালের যোগানদার এবং পুঁজি বিনিয়োগের

লাভজনক সুযোগসুবিধার কেন্দ্র হিসেবে পরিণত করে রাখা হয়েছে, বহুলাংশে এই দেশগুলির উপর শোষণ দিয়েই অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে জীবনযাত্রার অপেক্ষাকৃত উঁচু মান সম্ভব হয়েছে এবং সেটা বজায় রাখা হয়। এইসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে-'সাহায্য' দেয়, নয়া-উপনিবেশবাদের প্রবক্তাদের মুখে যে-সম্বন্ধে কথার শেষ নেই, সেটা সাম্রাজ্যবাদীদের লুটের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।

কোন কোন রাষ্ট্র যে তাদের পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বৃদ্ধির অপেক্ষাকৃত উঁচু হার ঘটাতে পেরেছে তার একটা কারণ হল এই যে, মুক্ত দেশগুলির জনগণকে শোষণ করার জন্যে তারা নতুন নতুন উপায় ধরেছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে নিজেদের কোন কোন উপনিবেশকে ভেবেচিন্তেই রাজনীতিক স্বাধীনতা দিয়ে তারা তার সঙ্গে সঙ্গে ঐসব দেশের অর্থনীতির উপর নিজেদের মুঠো বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছে।

উপনিবেশবাদের সাফাই গাওয়া, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রণালী আর জীবনযাত্রাপ্রণালী দীর্ঘস্থায়ী করা এবং একমাত্র পুঁজিতন্ত্রই অনগ্রসর দেশগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম এটা প্রমাণ করাই নয়া-উপনিবেশবাদী প্রচারের প্রধান লক্ষ্য। এই মতলব হাসিল করার জন্যে হরেক রকমের নয়া-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়, এবং কেবল পুঁজিতান্ত্রিক পশ্চিমে নয়, উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও কোন কোন মহলে সেগুলি ব্যাপকভাবে গ্রাহ্য হয়। মার্কিন অর্থনীতিবিদ ওয়াল্ট রস্তভের* 'আর্থনীতিক বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্ব' সংক্রান্ত তত্ত্ব বিশেষভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে — এতে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির উদ্দেশে বলা হয়, তারা যেন ব্যক্তিগত মালিকানার কারবারী কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করার কিংবা বন্ধ করার যেকোন কার্যকরণ থেকে বিরত থাকে।

উপনিবেশবাদের সাফাই দেবার চেষ্টায় কোন কোন বুর্জোয়া মতাদর্শওয়ালা আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সামাজিক-আর্থনীতিক অনগ্রসরতার জন্যে ঐসব দেশের মানুষেরই উপর দোষারোপ করার চেষ্টা করে। এদিক দিয়ে ভারতে ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গলব্রেথের মনোভাবটা বৈশিষ্ট্যসূচক — তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে,

---

* Walt Rostow, *The Stages of Economic Growth*, Cambridge, 1960

৮'টি-৷১

ভারতের পক্ষে জনশিক্ষার উন্নয়নের চেয়ে জাতীয়-শিল্পোন্নয়ন কম প্রয়োজনীয়।*

তবে, সাম্রাজ্যবাদীরা সমস্ত ক্ষেত্রে মুক্ত দেশগুলিতে সামাজিক প্রগতিরই বিরোধী, এমন কথা ভুল। তারা বরং চায় এমন উন্নয়ন হোক পুঁজিনীতিক পদ্ধতিতে। তারা দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে — একটা রাজনীতিক, অন্যটা আর্থনীতিক। যেমন, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে কোন কোন প্রগতিশীল ব্যবস্থার (যেমন, কৃষিসংস্কার, আর্থ ব্যবস্থার উন্নতিবিধান, ইত্যাদি) আনুকূল্য করার জন্যে 'সাহায্য' এবং ক্রেডিটের ব্যবস্থা আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষিত 'প্রগতির জন্যে মৈত্রী' পরিকল্পনায়। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে পুঁজিতান্ত্রিক খাতে চালিত করা, দেশীয় বাজারগুলিকে আয়ত্ত করা এবং এইভাবে কিউবার ধরনের যেকোন মূলগত বিপ্লব যাতে ঘটতে না পারে তার ব্যবস্থা করাই এই পরিকল্পনার পিছনে মতলব। এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলির জন্যেও মূলত অনুরূপ ধরনের পরিকল্পনা ফাঁদা হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রের উন্নয়নের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয় বিশেষভাবে; রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উন্নয়নের ফলে সাধারণভাবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে -- যদিও, লাভজনক হলে এক্ষেত্রে সহযোগিতা করতেও সাম্রাজ্যবাদীরা অস্বীকার করে না।

সামাজিক প্রগতি রুখে দিতে সাম্রাজ্যবাদ অক্ষম হতে পারে — তবু, অনগ্রসর দেশগুলিতে রাজনীতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন কোন্ অভিমুখে চলবে সে ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের বক্তব্যের একটা গুরুত্ব আছে। মুক্ত দেশগুলি যাতে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে না যায়, কিংবা, সমাজতন্ত্রের দিকে এই দেশগুলির বিকাশ যাতে অন্তত ব্যাহত করা কিংবা দেরি করিয়ে দেওয়া যায়, সর্বোপরি সেটাই সাম্রাজ্যবাদের গরজের বিষয়। ঘটনাবলি থেকেই দেখা যায়, বিভিন্ন সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষ খাড়া করা এবং সেগুলিকে ফুসলে বিভিন্ন সামরিক জোটে ঢুকিয়ে নেওয়া থেকে চক্রান্ত-বলে ক্ষমতাদখল, পিটুনী অভিযান আর ঔপনিবেশিক যুদ্ধ অবধি যেকোন রকমের অর্থনীতি-বহির্ভূত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও সাম্রাজ্যবাদীরা কোন বিবেকযন্ত্রণা বোধ করে না।

---

* John Kenneth Galbraith, *Economic Development in Perspective*, Cambridge, 1962, p. 47.

ঔপনিবেশিক যুদ্ধ আর সামরিক জোট, চক্রান্ত আর সন্ত্রাসন, নাশকতামূলক কার্যকলাপ আর আর্থনীতিক চাপ আর উৎকোচ, এই সমস্ত উপায়ই তারা ধরে — যদি সেটা দিয়ে মুক্ত দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্ব চালিয়ে যাওয়া সম্ভব, কিংবা এই দেশগুলির স্বাধীনতাকে যদি শুধু একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত করা যায়, কিংবা যদি তাদের স্বাধীনতাই অপহরণ করা যায়।

নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোই যে সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সামনে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন একটা কাজ সেটা দেখা গেল; একই নিরিখে সেটা হল এই রাষ্ট্রগুলির জাতীয় আর সামাজিক প্রগতি এবং স্বাধীন উন্নয়ন সুনিশ্চিত করারও সংগ্রাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর্থনীতিক স্বাধীনতার সমস্যা

১। কত পিছনে?

তৃতীয় দুনিয়ার দিকে একটু খুঁটিয়ে তাকালেই করুণ তবু অকাট্য একটা বাস্তবতা চোখে পড়ে: এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলি অর্থনীতিগতভাবে শিল্পোন্নত দেশগুলি থেকে অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া কতকগুলি নির্দেশক থেকে মুক্ত দেশগুলির আর্থনীতিক অনগ্রসরতা এবং বৈষয়িক দ্রব্যসামগ্রী থেকে এইসব দেশের মানুষের বঞ্চিত অবস্থার পূর্ণাঙ্গ পরিসরে পরিমাপ করা যায়। মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয়ই সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী নির্দেশক। জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ছিল ১,০৩৭ ডলার, আর মুক্ত দেশগুলিতে সেটা ছিল ৮৩ ডলার। এই দুটো অঙ্কের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়, আর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির পিছিয়ে থাকার মাত্রা ছিল ১২ (১,০৩৭ : ৮৩)।

এই নির্দেশকটি পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেছে — তবু, গড়পড়তা পরিসংখ্যান-তথ্যের সাধারণভাবে লাক্ষণিক যাবতীয় ত্রুটিই এতে রয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করতে গেলে অতি অসম্ভব আজগবি সিদ্ধান্ত এসে যেতে পারে। যেমন, যেসব দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সেইসব দেশের নামের তালিকায় সবার উপরে রয়েছে ছোটখাটো দুটো ক্ষুদ্র নৃপতি-শাসিত রাজ্য কোয়াইট এবং কাতারের নাম। কিন্তু, এর থেকে যা মনে হতে পারে সেভাবে এই দেশদুটি পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্পদশালী এবং অর্থনীতিগতভাবে সবচেয়ে উঁচু মাত্রায় উন্নীত নয়। সেটা তো দূরের কথা। ব্যাপারটা এই: তৈলের সবচেয়ে বড় বড়

একচেটিয়া কারবার তাদের তৈল সম্পদ আহরণ করে, এই বিশেষ সুযোগের বাবত ঐ দুই দেশের সরকার তাদের কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা পায়। ঐ টাকা যায় সমাজের উচ্চতর সামন্ততান্ত্রিক স্তরের হাতে, তারা যথার্থই অগাধ বিত্ত-সম্পদের মালিক। কিন্তু কোয়াইট আর কাতারের বাদবাকি মানুষ — ব্যাপক জনসাধারণের দারিদ্র্য আর দুর্দশা অতি শোচনীয়।

১৯৬৪ সালে জেনেভায় বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনে এই বিষয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কেনিয়ার প্রতিনিধি সে দেশের শিল্প-ব্যবসায় মন্ত্রী জে. জি. কিয়ানো বলেছিলেন, '...বিভিন্ন কেতাবী বিবরণে আর অর্থশাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তকে বলেই চলা হচ্ছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩০ ডলার আর ৬০ ডলার, কিংবা ১০০ ডলার অবধি, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কোটি কোটি মানুষ জীবনের যে নির্মম বাস্তবতার সম্মুখীন তার কোন উপলব্ধি নেই এইসব পরিসংখ্যানে। নিযুত নিযুত মানুষ রয়েছে যাদের আদৌ কোন আয়ই নেই। ওবেলার জন্যে এক-গ্রাস অন্ন জুটবে কোথা থেকে, কিংবা রাত্রে মাথা গুঁজবার ঠাঁই হবে কোথায়, তার কোন স্থিরতা নেই তাদের জন্যে। পাঠ্যপুস্তকে লেখা মাথাপিছু আয়ের অঙ্কে কোন অংশই তাদের নেই।'* পরিসংখ্যানের গড়পড়তা হিসাবের মধ্যে যে গোঁজামিল লুকনো থাকে তার উপর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়ে এই বক্তা পরিস্থিতির একটা স্পষ্ট চিত্রই তুলে ধরেছেন।

পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার উচ্চ-মাত্রায় শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলি এবং এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে যে বিপুল আর্থনীতিক ব্যবধান রয়েছে তার আরও যথাযথ চিত্র তুলে ধরার জন্যে অন্যান্য অংক আর তথ্য হাজির করা যেতে পারে। মুক্ত দেশগুলিতে মানুষের সবচেয়ে প্রাথমিক চাহিদা খাদ্যসংক্রান্ত চাহিদা কি পরিমাণে মেটে না-মেটে সেই বিষয়ে অংক ধরে দেখা যেতে পারে। ক্যালোরি আর প্রোটিনের হিসাবে দৈনিক খাওয়ার গড় পরিমাণ নিয়ে এখানে আলোচনা করতে হবে। পাঠক হয়ত আপত্তি তুলে বলতে পারেন এখানেও তো সেই গড়পড়তার ব্যাপার। তা ঠিক, কিন্তু পার্থক্য আছে: এক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের ফাঁকির ফাঁক নেই — কেননা, সবচেয়ে ধনী আরব শেখও দিনের পর দিন মানুষের প্রয়োজনের

---

* Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, March 23—June 16, 1964, Vol. II, Policy Statements, New York, 1964, p. 251.

চেয়ে বেশি পরিমাণ খাদ্য খেতে পারে না। বলা যেতে পারে, এক্ষেত্রে প্রকৃতিই এইসব পরিসংখ্যানের গড়পড়তা হিসাবের অপেক্ষাকৃত বেশি যথাযথতা নিশ্চিত করে দিচ্ছে।

মানুষের দৈনিক প্রয়োজন হল, কে কি কাজ করে তদনুসারে, ২,৫০০ থেকে ৪,০০০ ক্যালোরি। গড় পরিমাণ ৩,০০০ ক্যালোরি ধার্য করা যেতে পারে। নিচে দেওয়া সারণী নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার সময়ে সেটা মনে রাখা দরকার। এতে দেখা যাবে, প্রাক্তন উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলির বেলায় তুলনামূলক অংকগুলি সমস্ত ক্ষেত্রেই গড়ের চেয়ে কম এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে বিপদের সীমারেখা ২,২০০ ক্যালোরিরও কম, তার নিচে নামলে আসে পুষ্টির অভাব, অর্থাৎ কিনা — ভুখা। এই সারণীতে প্রোটিন খাবার বিষয়ে তথ্যও রয়েছে; দৈনিক ৮০ গ্রাম্ প্রোটিন পর্যাপ্ত বিবেচিত হয়।

২ নং সারণী

বিশ শতকে সপ্তম দশকে কয়েকটি দেশে খাদ্য ব্যবহার

(দেশে-উৎপন্ন + আমদানি-করা খাদ্য: মাথাপিছু দৈনিক)

	ক্যালোরি	দেশ	প্রোটিন (গ্রাম্)	
	৩,৫১০	নিউ জীল্যান্ড	১০৯	
	৩,২৭০	গ্রেট বৃটেন	৮৯	
	৩,১৪০	অস্ট্রেলিয়া	৯০	
	৩,১০০	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৯২	
	৩,১০০	কানাডা	৯৪	
	৩,০০০	পশ্চিম জার্মানি	৮০	
৩,০০০ ক্যালোরি — খাবার গড় পরিমাণ				৮০ গ্রাম — প্রয়োজনীয় গড় পরিমাণ
	২,৬৯০	ব্রেজিল	৬৫	
	২,৬২০	সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	৭৭	

	ক্যালোরি	দেশ	প্রোটিন (গ্রাম্)
২,৫০০ ক্যালোরি — নিরাপদ সর্বনিম্ন পরিমাণ			
	২,৪৯০	ভেনেজুয়েলা	৬৬
	২,৩৩০	সিরিয়া	৭৮
বিপদের সীমারেখা ২,২০০ ক্যালোরি — তার নিচে পুষ্টির অভাব			
	২,১০০	লিবিয়া	৫৩
	২,০৫০	পেরু	৫১
	২,০৪০	ভারত	৫৩
	১,৯৮০	পাকিস্তান	৪৪
	১,৮৩০	ফিলিপাইন	৪৩

এই অঙ্কগুলি দেখলেই বোঝা যায়, প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির মানুষ পুষ্টির অভাবে ভুগছে, তার মর্মন্তুদ পরিণতি হল রোগ আর মৃত্যুর চড়া হার। কতকগুলো রোগ হয় পুষ্টির কমতি এবং ঘাটতির দরুন -- যেমন, বেরিবেরি, রিকিট্, স্কার্ভি, পেলাগ্রা, কোয়াশিয়রকর, ইত্যাদি। যেমন, মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে ৫ বছর অবধি বয়সের শিশুদের প্রতি তিনে একটি মারা যায় এই রোগে। আফ্রিকায় ৬ মাস থেকে ৬ বছর অবধি বয়সের শিশুদের ৯৬ শতাংশের হয় কোয়াশিয়রকর রোগ — এই রোগ হয় খাদ্যে প্রোটিনের ঘাটতির দরুন।

দুর্বল হয়ে পড়া দেহে যক্ষ্মা, অন্ত্রের বিভিন্ন রোগ আর ম্যালেরিয়া ধরে সহজেই। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক দুনিয়ার সর্বত্র এখনও বসন্তরোগ, প্লেগ আর কলেরার মড়ক দেখা দেয়।

অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং অনগ্রসর দেশগুলির দুটো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের মধ্যে ব্যবধান সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে নিচের দুটি সারণীর অঙ্কগুলি থেকে।

৩ নং সারণী

বিশ শতকে সপ্তম দশকে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং মুক্ত দেশগুলিতে তুলনামূলক মৃত্যু-হার

(জনসংখ্যার প্রতি হাজারে)

অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি

পশ্চিম ইউরোপ	৭·৮-১২·৫
উত্তর আমেরিকা	৭·৭- ৮·৪
জাপান	৭·৩
অস্ট্রেলিয়া	৮·৬

মুক্ত উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলি

এশিয়া	১৯ -২৪
আফ্রিকা	২৫·৬-৩৩·৩
লাতিন আমেরিকা	৬·৭-১৭·০

৪ নং সারণী

বিশ শতকের সপ্তম দশকে কয়েকটা অঞ্চলে গড় আয়ু

উত্তর আমেরিকা	৭০-৭৩
অস্ট্রেলিয়া	৭০-৭৩
পশ্চিম ইউরোপ	৬৮-৭০
লাতিন আমেরিকা	৫০-৫৫
এশিয়া	৪০-৫০
আফ্রিকা	৩০-৪০

টীকা: আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় কোন কোন দেশে আয়ু প্রাচীন রোমের সময়কার ইউরোপের মাত্রায়ই রয়ে গেছে: ৩০ বছর।

এই কলঙ্কজনক পরিস্থিতির জন্যে ইতিহাস দায়ী করবে উপনিবেশবাদকেই।

অসমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মোট শিল্পোৎপাদনে মুক্ত দেশগুলির অংশ ১০ শতাংশের সামান্য বেশি। সেটা কিন্তু নিষ্কর্ষক শিল্পগুলি সমেত; যন্ত্রশিল্পগুলিতে মোট উৎপাদনের মোটামুটি মাত্র ৯ শতাংশ হয় এই

দেশগুলিতে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় এই যে, এইসব দেশের মোট জনসংখ্যা হল পৃথিবীর অসমাজতান্ত্রিক অংশের সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেকের কিছু বেশি। এইসব অঙ্ক থেকে দেখা যাচ্ছে, শিল্পের দিক থেকে মুক্ত দেশগুলি অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে বহু পিছনে পড়ে রয়েছে।

মুক্ত দেশগুলির অর্থনীতিগত অনগ্রসরতা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা মাথাপিছু বার্ষিক আয়কে একটা নিরিখ হিসেবে ব্যবহার করে আবিষ্কার করেছি যে, আর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি থেকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পিছিয়ে থাকার মাত্রা হল **বারো**। এখন মাথাপিছু শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ধরে দেখলে ঐ মাত্রাটা হবে **আঠারো।**

মুক্ত দেশগুলির এই শিল্পগত অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে সমগ্রভাবেই শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভাব কিংবা অপ্রতুলতাটাকে ধরলে ভুল হবে — কেননা, প্রাক্তন ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যথেষ্টই। অধিকন্তু, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় শিল্পে-নিযুক্ত লোকের সংখ্যা অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিল্পে-নিযুক্ত লোকসংখ্যার সমানই: ২০,০০,০০,০০০। মুশকিলটা হল এই যে, এইসব প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেই যন্ত্রপাতি সেকেলে, সেগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় হাতে-চালানো কল-কৌশল। কাজেই, যেমন শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির নিম্ন হার, তেমনি উৎপাদনশক্তিগুলির উন্নয়নের নিম্ন মানের মধ্যেই দেখতে হবে অনর্থের মূলটাকে।

কৃষিতেও ঐ একই অবস্থা। যেমন, ভারতে কৃষিতে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐ শক্তির ১/২৫ ভাগ (তুলনার জন্যে উল্লেখ করা যায় — শিল্পে সেটা ১/৫০ ভাগেরও কম)। এক কথায়, মুক্ত দেশগুলিতে কেবল শিল্পে নয় কৃষিতেও শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি অত্যন্ত কম।

অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে অর্থনীতিক্ষেত্রে সক্রিয় জনসংখ্যার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশই কাজ করে কৃষিক্ষেত্রে: ৪·৫ থেকে ২০ শতাংশ। দেখা যায়, এই রকমের দেশে প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্যে এটা সম্পূর্ণতই পর্যাপ্ত। কিন্তু, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির দিকে তাকালে একেবারে ভিন্ন চিত্রই চোখে পড়ে। এইসব দেশে অর্থনীতিক্ষেত্রে সক্রিয় জনসংখ্যার ৬০ থেকে ৮০ শতাংশই খামারি কিংবা খেতমজুর — তবু, তাদের উৎপাদন খাদ্যে জনসংখ্যার চাহিদা পুরোপুরি মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আগেই দেখা গেছে, মুক্ত দেশগুলিতে জনসাধারণের ব্যাপক

অংশে অপুষ্টি একেবারে নিয়মিত। তার উপর স্মরণে আনা দরকার যে, ক্যালোরি এবং প্রোটিন গ্রহণের দৈনিক গড় পরিমাণের মধ্যে পড়ে কেবল দেশীয় উৎপন্ন নয়, আমদানি করা খাদ্যসামগ্রীও। যাবতীয় আমদানিতে খাদ্যসামগ্রীর অংশ হল — ভারতে আর ইন্দোনেশিয়ায় ১২·৫ শতাংশ, মালয়েশিয়া আর মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে প্রায় ২৫ শতাংশ, আর সিংহলে ৩৩ শতাংশের বেশি। এই অবস্থাটা যে প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির অতি নিম্ন মাত্রারই প্রত্যক্ষ ফল সেটা স্পষ্টপ্রতীয়মান।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যেসব দেশ ঔপনিবেশিক জোয়ালে বাঁধা ছিল তারা এখন নিজেদের যথেষ্ট আহার্যের সংস্থান করতে অপারগ। এতে একটা যথার্থই নিদারুণ নিহিত তাৎপর্য রয়েছে। কথাটা বিশ্বাস করাও শক্ত: যেসব দেশে শ্রমজীবী জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কাজ করে কৃষিক্ষেত্রেই সেইসব দেশের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। ইংলণ্ডও বিস্তর খাদ্যসামগ্রী আমদানি করে, তা ঠিক: কিন্তু সেদেশে অর্থনীতিক্ষেত্রে সক্রিয় জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৪·৫ জন কাজ করে কৃষিক্ষেত্রে। কিন্তু, গোটা দুই শতক ধরে বৃটিশ জোয়ালে বাঁধা ছিল ভারত — এই দেশে খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে, যদিও এ দেশে শ্রমজীবী জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদনক্ষেত্রে কাজ করে!

প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিকে কেন নিছক শিল্পে-অনগ্রসর বলে গণ্য করা চলে না সেটা দেখা যাচ্ছে এইসব তথ্য থেকে। এইসব দেশ প্রকৃতপক্ষে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ে রয়েছে।

এইভাবে, সাধারণভাবেই অনগ্রসর মুক্ত দেশগুলির অর্থনীতি বেশি মাত্রায় কৃষিপ্রধান হয়ে রয়েছে: এই দেশগুলিতে মোট উৎপাদনের সাধারণত ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ এবং বহু ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ অবধিও হয় কৃষিক্ষেত্রে। এই দেশগুলির কম-উৎপাদনশীল শিল্প এবং কম-উৎপাদনশীল কৃষির মধ্যে অনুপাত স্পষ্টতই কৃষির দিকেই বেশি। এই দেশগুলির অর্থনীতির কৃষিপ্রধান প্রকৃতিটার উপর যাঁরা জোর দিতে চান তাঁরা ঐ কারণেই এই দেশগুলিকে 'খামার বিশ্ব' বলে অভিহিত করেন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে এই দেশগুলির ভূমিকার নির্দেশ আছে এই কথাটায় — তাই এটা আরও বেশি তাৎপর্যসম্পন্ন। এর বেশির ভাগ দেশই আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী, আর তার থেকে

পাওয়া পয়সা দিয়ে কেনে যন্ত্রশিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী। যেকোন দেশে শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে লেনদেনের সঙ্গে এই রকমের বাণিজ্যের অনেক মিল আছে।

মুক্ত দেশগুলির রপ্তানির প্রকৃতিটা এবার বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। দেখা যাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি মাল হল কফি, কোকো, কলা, আনারস, আখের চিনি, চাল, লবঙ্গ এবং অন্যান্য মসলা, চা, রবার, তুলো, পাট, সিসাল, চীনাবাদাম এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী।

তবে, প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলি থেকে অন্যান্য জিনিসও রপ্তানি হয় -- যেমন, তৈল, তামা, টিন, লোহা আকরিক, ইত্যাদি। এই অবস্থার ফলে মুক্ত দেশগুলির আর্থনীতিক গড়ন সম্পর্কে আমাদের বর্ণনায় বেশকিছু পরিবর্তন করা দরকার — কেননা, এর বেশ কয়েকটি দেশে বিভিন্ন খনি শিল্পের ভূমিকা কৃষিরই মতো গুরুত্বসম্পন্ন। বিজ্ঞান সংক্রান্ত সাহিত্যে এইসব দেশকে অনেক সময়ে কাঁচামাল আর কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনকারী বলে উল্লেখ করা হয়।

এখন আরও বেশি যথাযথভাবে বলা যায় যে, তৃতীয় দুনিয়ার আর্থনীতিক গড়নের একটা বিশেষক অঙ্গ হল কম-উন্নত আকারণশিল্প, কৃষির প্রাধান্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খনি শিল্প।

আমাদের এই বিচার-বিশ্লেষণ ধরে আরও এগোন যাক। কৃষি এবং খনি শিল্প এই দুইয়েরই নিজ নিজ বিশিষ্ট আভ্যন্তরিক গড়ন আছে। যেমন, কৃষির মধ্যে থাকতে পারে ফসল উৎপাদন আর পশুপালন, আবার, ফসল উৎপাদনের অর্থ হতে পারে শিল্প-প্রয়োজনীয় ফসল কিংবা খাদ্য ফসল, এই খাদ্য ফসলের মধ্যে আবার পড়ে খাদ্যশস্য, বিভিন্ন তৈলপ্রদ উদ্ভিদ কিংবা ডাল। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির আর্থনীতিক গড়ন সম্বন্ধে এই রকমের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, এর বেশির ভাগ দেশেই কৃষি আর খনি শিল্পের যেসব শাখা রয়েছে সেগুলিতে সীমাবদ্ধ মাত্র কয়েক রকমের পণ্যই উৎপন্ন হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে দু'-তিন রকমের বেশি নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র এক রকম।

নিচে সারণীতে আছে ২৪টি দেশের তালিকা — এই দেশগুলি আগে উপনিবেশ কিংবা আধা-উপনিবেশ ছিল। এর প্রত্যেকটি দেশের অর্থনীতিতে যে পণ্যের উৎপাদন বিশিষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন সেটা দেখানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশের আমদানির মধ্যে এবং জাতীয় আয়েও ঐ পণ্যের অংশটা দেখে এর

গ্রুত্ব বোঝা যায়। এইসব দেশকে কাঁচামাল আর কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনকারী বলে আগে উল্লেখ করা হয়েছে; এই দেশগুলির আর্থনীতিক গড়ন এক-ফসলা বা একপেশে, এই মর্মে বক্তব্যর যুক্তিযুক্ততা নিচে সারণীর অংকগুলি থেকে দেখা যাবে।

৫ নং সারণী

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির জাতীয় অর্থনীতি এবং রপ্তানির একপেশে বিশেষীকরণ

দেশ	উৎপন্ন এবং রপ্তানি করা প্রধান পণ্য	ঐ পণ্য বিক্রি করে পাওয়া অর্থ	
		মোট পাওনার শতকরা হিসেবে	জাতীয় আয়ের শতকরা হিসাবে
কোয়াইট	তৈল	৯৯	৯৭
ইরাক	তৈল	৯৯	৪০
সেনিগাল	চীনাবাদাম	৯২	—
ভেনেজুয়েলা	তৈল	৯১	৫৫
সৌদী আরবদেশ	তৈল	৯০	৮৩
নাইজের	চীনাবাদাম	৮৭	—
ইরান	তৈল	৮৫	৩৩
কলম্বিয়া	কফি	৭৪	১৯
বর্মা	চাল	৭৪	২৬
হাইতি	কফি	৭৭	২৫
স্যালভাডর	কফি	৭৩	—
গুয়াতেমালা	কফি	৭৩	২৫
মিসর	তুলো	৭০	১৮
পানামা	কলা	৬৭	১২
সিংহল	চা	৬৬	৪১
ঘানা	কোকো	৬৬	৪০
চিলি	তামা	৬৩	২০
মালয়	রবার	৬২	৪০
লাইবিরিয়া	রবার	৬২	—
ব্রেজিল	কফি	৬২	১২
পাকিস্তান	পাট	৫৮	৯
উরুগুয়ে	পশম	৫৮	৯
বলিভিয়া	টিন	৫৭	২৯
ইকোয়েডর	কলা	৫৬	২৫

একদিকে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি এবং অন্যদিকে শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে চলতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেন একটা বদ্ধতার ধাঁচ ফুটে উঠছে এইসব অঙ্ক থেকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই সম্পর্ক সর্বক্ষণ বদলে চলেছে - কাজেই, কালক্রমে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে সেটা আমাদের দেখার চেষ্টা করা দরকার। বাস্তব তথ্যাদি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শিল্পোন্নত পশ্চিম এবং তৃতীয় দুনিয়ার মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে। মুক্ত দেশগুলিতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন কোন পরিবর্তন সত্ত্বেও, জাতীয় প্রগতি ঘটাবার জন্যে এই দেশগুলির যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেই প্রক্রিয়াটা চালু রয়েছে। জাতিসংঘ থেকে সপ্তম দশকটিকে 'উন্নয়ন দশক' বলে ঘোষণা করা হয়েছে --- আশা ছিল যে, এই দশকে এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জাতীয় অর্থনীতি এগিয়ে নিয়ে চলবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প প্রচেষ্টা চলবে। দুঃখের কথা, পৃথিবীজোড়া অর্থনীতিক্ষেত্রে বাস্তব ধারাগুলি জাতিসংঘের প্রত্যাশার সঙ্গে বিসদৃশ।

১৯৫০—১৯৫৫ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মোট জাতীয় উৎপন্ন বেড়েছিল বছরে গড়ে ৪·৭ শতাংশ হারে। অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে ঐ একই সময়ে আর্থনীতিক অগ্রগতির হার দেখা গিয়েছিল ঠিক ঐ একই ৪·৭ শতাংশ। কিন্তু একটা পার্থক্য ছিল: অগ্রসর রাষ্ট্রগুলি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মাথাপিছু বৃদ্ধি হয়েছিল যথাক্রমে ৩·৪ এবং ২·৭ শতাংশ। এইসব অঙ্ক তখন উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। তবে, বর্তমান দশকের প্রথমার্ধে অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছিল। ১৯৬০ এবং ১৯৬৫ সালের মধ্যে মোট জাতীয় উৎপন্নের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে ৫ শতাংশ, আর তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে মাত্র ৪·৬ শতাংশ। মাথাপিছু হিসাবের অঙ্কদুটোর (৩·৭ এবং ২ শতাংশ) মধ্যে ব্যবধান আরও বেড়ে গিয়েছিল।

এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাকালে দেখা যাচ্ছে, অসমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বহির্বাণিজ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির অংশ ১৯৫৩ সালের ২৮ শতাংশ থেকে কমে ১৯৬৬ সালে দাঁড়াল ২১ শতাংশ। ওদিকে, এই দেশগুলির ঋণ বেড়ে চলেছে, আর তাদের সোনা আর মুদ্রার মজুদ কমে যাচ্ছে। মোদ্দা কথা, পৃথিবীর দুটি অসমাজতান্ত্রিক অংশের উন্নয়ন-মাত্রা সমকেন্দ্রী হবার সম্ভাবনার লক্ষণ থাকতে পারে এমন কোন নির্দেশক আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর।

বহু অর্থনীতিবিদ আশা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকান, কিন্তু তাঁরা কোন উৎসাহজনক সম্ভাবনা দেখতে পান না। ১৯৬৪ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলন থেকে প্রচারিত দলিলে ১৯৭০ সাল সম্বন্ধে পূর্বাভাস ছিল। তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই হুঁশিয়ারি ছিল যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে রপ্তানি থেকে পাওয়া অর্থ থেকে আমদানি বাবত টাকা দিতে হলে এই দেশগুলির ঘাটতি পড়বে ৯০০ কোটি থেকে ১,৩০০ কোটি ডলার। আর, দেনা মেটাতে, ঋণ বাবত সুদ দিতে এবং বৈদেশিক কোম্পানিগুলির মুনাফা আর ডিভিডেন্ড দিতে তাদের লাগবে আরও মোটামুটি ৮০০ কোটি ডলার। এই হিসাব যাঁরা করেছিলেন তাঁরা বলেছিলেন, তৃতীয় দুনিয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে এই বিপুল পরিমাণ ঘাটতি নতুন নতুন বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগ এবং সরকারী ক্রেডিট দিয়ে আংশিকভাবে পূরণ করা যেতে পারে। স্পষ্টতই, তাঁরা বড় বেশি আশা করছিলেন — তাঁরা বলছিলেন ঐসব সূত্রে পাওয়া যেত মোট ১,২০০ কোটি ডলার। তাঁদের হিসাব আর অনুমান নির্ভুল হলেও আরও ৫০০ কোটি থেকে ৯০০ কোটি ডলারের প্রকাণ্ড ফাঁক থেকে যেত। কিন্তু তার চেয়ে হতাশাপূর্ণ পূর্বানুমানও রয়েছে: জাতিসংঘের কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলির কেবল আমদানি বাবত দেয় অর্থেরই দরুন ১৯৭৫ সাল নাগাত ডলার ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াতে পারে **এগারোটা রাশির সংখ্যা।**

অতীত, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপরে-উল্লেখিত সমস্ত অঙ্ক থেকে একটা মূল সিদ্ধান্ত আসছে এই যে, অসমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার আর্থনীতিক বন্দোবস্তটা ঐ দুনিয়ার দুটো অংশের মধ্যে — অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং প্রাক্তন ঔপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যে — আর্থনীতিক ব্যবধানটাকে সর্বক্ষণ বজায় রাখে এবং বাড়িয়ে চলে।

আমরা যেসব তথ্য হাজির করছি এগুলি কেউ, কোথাও, কোন যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করবে না বললেই হয়। এ বিষয়ে সাধারণ মতৈক্য রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এইসব ব্যাপারের ব্যাখ্যা দেবার বেলায় অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়।

যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বিশেষভাবে প্রখর সেগুলিকে মোটামুটি এইভাবে সূত্রবদ্ধ করা চলে: এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার

দেশগুলির পক্ষে হানিকর এবং অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষে লাভজনক উপায়ে বৈষয়িক সম্পদের পুনর্বণ্টনই কি প্রথমোক্ত দেশগুলির আর্থনীতিক অনগ্রসরতার কারণ? ঐ দেশগুলির অনগ্রসরতা বলতে কি পরে-উল্লেখিত রাষ্ট্রগুলির উপর তাদের নির্ভরশীলতাও বুঝায়?

গত কয়েক বছরে পশ্চিমে উদ্ভূত বহু তত্ত্বে বলা হয়, মুক্ত দেশগুলি এবং শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্যবধানটা খুবই স্বাভাবিক। ঐ সমস্ত তত্ত্বই আপাতদৃষ্টিতে-নিরীহ 'উত্তর-দক্ষিণের' সূত্রটাকে মানে; অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানসম্পন্ন অর্থনীতিবিদেরা নয়, কিংবা -- যা আরও বেশি সম্ভব — অল্প কথায় বর্ণনা দিতে উৎসুক কোন কোন সাংবাদিকই নিশ্চয়ই ঐ সূত্রটা উদ্ভাবন করেছে।

হঠাৎ মনে হতে পারে, বিশ্ব অর্থনীতির ঝটিকাসংকুল সাগরে দিঙ্‌নির্ণয় করতে ওটা বুঝি খুবই কাজের জিনিস — যেন এক রকমের কম্পাস। কম্পাসটা উত্তর দিক নির্দেশ করে: সেখানেই তো ধনী দেশগুলি, আর দক্ষিণে পাওয়া যাবে গরিব, অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলিকে; সম্পন্ন দেশ অস্ট্রেলিয়া আর নিউ জীল্যান্ড যে দক্ষিণ গোলার্ধে, তাতে কিছু এসে যায় না! তুচ্ছ এটা-ওটা অযথাযথতা উপেক্ষা করতে রাজি হবে প্রত্যেকেই, আর এ কথাও তো কেউ অস্বীকার করবে না যে, শিল্পোন্নত দেশগুলির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই রয়েছে উত্তর গোলার্ধে, তেমনি সাধারণভাবে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলেই রয়েছে অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলির প্রায় সবই।

তবে, 'উত্তর-দক্ষিণ' সূত্রটা একটা স্বতঃপ্রতীয়মান ভৌগোলিক বাস্তবতা হওয়া ছাড়াও এতে অতি হিংস্র একটা মতাদর্শগত এবং রাজনীতিক অর্থ নিহিত রয়েছে — কেননা, যেসব কারণে বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিতরে উন্নয়নশীল দেশগুলি অর্থনীতিক্ষেত্রে সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে সেগুলির যেকোন বিশ্লেষণে সামাজিক-শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধাচরণ করাই সূত্রটার সমগ্র উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক শোষণের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এমন সমস্ত রকমের ধারণার স্থান রয়েছে এই সূত্রটাতে।

যেমন, এই সূত্রে গৃহীত হয় ডাহা জাতিবিদ্বেষবাদ — এতে প্রচার করা হয় দক্ষিণের 'অশ্বেতাঙ্গ' জাতিগুলির উপর উত্তরের শ্রেষ্ঠত্ব, অর্থাৎ, 'শ্বেতাঙ্গ' জাতিগুলির শ্রেষ্ঠত্ব; 'জলবায়ু'-তত্ত্বও এই সূত্রে গৃহীত — এই তত্ত্বে উপনিবেশবাদীদের সমস্ত অপরাধের সাফাই দিয়ে তার যুক্তি হিসেবে বলা

হয়, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু মানুষকে দুর্বল করে ফেলে, আর উত্তরী জলবায়ুর কঠোরতা কাজ করবার ইচ্ছা সৃষ্টি করে, এরই থেকে নাকি বোঝা যায় 'উত্তরী' জাতিগুলির কেন বাড়বাড়ন্ত আর 'দক্ষিণী' জাতিগুলির কেন দারিদ্র্যের জীবন; আরও আছে মার্কিন অর্থনীতিবিদ রস্তভের 'বিভিন্ন পর্ব সংক্রান্ত তত্ত্ব' --- এতে নির্দিষ্ট দেশে প্রশাসনের সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থাটাকে হিসেবে না ধরে সেই দেশ উন্নয়নের যে পর্বে পৌঁছেছে সেটা নির্ধারণ করার গুরুত্বের উপরই জোর দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখায় সেই একই অতি সহজ-সরল ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ, তাতে উত্তরী দেশগুলিকে স্থান দেওয়া হয় উচ্চতর স্তরে আর নিম্নতর স্তরে স্থান দেওয়া হয় দক্ষিণী দেশগুলিকে।

'উত্তর-দক্ষিণ' সূত্রের ভিতরকার এই সমস্ত বিভিন্ন ধারণা একটা জিনিস করতে পারে না কিছুতেই: অর্থনীতির বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরে সম্পদ এবং দারিদ্র্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিতে পারে না কিছুতেই। প্রচলিত মতটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, 'উত্তর' আর 'দক্ষিণ' যেন বিশ্ব অর্থনীতিক্ষেত্রে দুটো সমান্তরাল, পরস্পর থেকে স্বাধীন, বিপরীত ধারা। ব্যাপারটা তাইই কিনা সেটা এখনও দেখতে বাকি আছে।

২। অনগ্রসরতা, শোষণ, নির্ভরশীলতা

মুক্ত দেশগুলি এবং তাদের প্রাক্তন শাসক দেশগুলির মধ্যে এখনকার আর্থনীতিক সম্পর্ক স্পষ্টতই তাদের ঔপনিবেশিক আমলের সম্বন্ধ থেকে খুবই পৃথক। এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ কাজের হবে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রেট বৃটেন এবং তার ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে হিসাবনিকাশ কিভাবে হত সে সম্বন্ধে বৃটিশ অর্থনীতিবিদ এল. এইচ. জেঙ্ক্স্-এর বর্ণনা এখানে দেওয়া হল:

'১৮৫৭'র বিদ্রোহের বাবত খরচ, কোম্পানির অধিকারগুলি সম্রাটের কাছে হস্তান্তর করার মূল্য, চীনে এবং আবিসিনিয়ায় একই সময়ে যুদ্ধ চালাবার ব্যয়, ভারতের সঙ্গে অতি দূর-সম্পর্কযুক্ত যেকোন বিষয়ে লন্ডনে সরকারী ব্যয় --- এমনকি ইন্ডিয়া অফিসে পরিচারিকাদের মজুরি অবধি, আর যেসব জাহাজ জলযাত্রা করেছিল কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করে নি

সেগুলির জন্যে খরচখরচা এবং যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে স্বদেশে ভারতীয় রেজিমেণ্টগুলির ছ'মাসের খরচও — এই সবই প্রতিনিধিত্ববিহীন রায়তদের হিসাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৬৮ সালে তুরস্কের সুলতানের রাষ্ট্রীয় সফর হয়েছিল লণ্ডনে, তাঁর সরকারী বল্-নাচের আয়োজন হয়েছিল ইণ্ডিয়া অফিসে, তার বিল্ চাপানো হয়েছিল ভারতের উপর। ঈলিং-এ একটা উন্মাদ আশ্রম, জাঞ্জিবারের একটা মিশনের সদস্যদের জন্যে উপহার, চীনে এবং পারস্যে গ্রেট বৃটেনের কনসালার এবং কূটনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলি, ভূমধ্যসাগরীয় নৌবহরের স্থায়ী খরচখরচার একাংশ এবং ইংলণ্ড থেকে ভারত অবধি একটা টেলিগ্রাফ লাইনের সমস্ত খরচ ১৮৭০ সালের আগে ভারতীয় রাজকোষের উপর চাপানো হয়েছিল।'*

দেখা যাচ্ছে, অসুয়ক ঔপনিবেশিক আমলের লুণ্ঠন আর যথেচ্ছাচারের যে চিত্র তুলে ধরেছেন এল. এইচ. জেঙ্ক্স্ তার সঙ্গে আমাদের সময়কার অবস্থার তুলনা করলে বেশকিছুটা পরিবর্তন চোখে পড়ে। কোন দেশ যতই ক্ষুদ্র এবং আর্থনীতিক দিক দিয়ে যতই দুর্বল হোক না কেন, তার উপর চাপানো হবে উপনিবেশভোগী দেশের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত কূটনীতিক সংবর্ধনার খরচখরচার দায়, এমনটা আজকের দিনে কল্পনা করাও শক্ত। ঔপনিবেশিক বশ্যতার দরুন অর্থাদি আদায় করার ব্যাপারটা ঠিক সেইভাবে আজকাল আর চালানো হয় না। অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলির ঘাড় ভেঙে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অনুকূলে সম্পদের আন্তর্জাতিক পুনর্বণ্টনের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন পদ্ধতি হিসেবে আর্থনীতিকবহির্ভূত জোরজবরদস্তি জাতীয় স্বাধীনতার ফলে শেষ হয়ে গেছে।

মুক্ত দেশগুলি এবং অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক সম্পর্ক এখন চালানো হয় উপযুক্ত ব্যবসায়ী সম্পর্কের কাঠামের মধ্যে — সেগুলির প্রধান প্রধান রূপ হল ব্যবসায়ী লেনদেন, পুঁজি রপ্তানি, সরকারী স্তরে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট আর অনুদান। তাদের আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক সম্পর্কের ব্যবস্থার ভিতরে ঐ দুই পক্ষ হল আনুষ্ঠানিকভাবে সমানাধিকারসম্পন্ন চুক্তিবদ্ধ দুটো পক্ষ। তারা যথার্থই সমানাধিকারসম্পন্ন কিনা সেটা দেখা দরকার।

---

* L. H. Jenks, *The Migration of British Capital to 1875*, pp. 223-24. R. Palme Dutt. *India Today*. London, 1940, pp. 140-41 থেকে উদ্ধৃত।

মুক্ত দেশগুলির রপ্তানি-আমদানির কাজ-কারবার নিয়ে আগে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এখানে বিশেষভাবে নজরে পড়ে — যা ইতোমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে — অসমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বহির্বাণিজ্যের পরিমাণে প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির অংশ সমানে কমে আসছে। ১৯৫৩ সালে সেটা ছিল ২৮ শতাংশ, কিন্তু তার দশ বছর পরে সেটা কমে দাঁড়ায় ২২·৬ শতাংশ। এটা ঘটেছে মুক্ত দেশগুলির বাণিজ্যের পরিমাণ কমে যাবার দরুন নয় — বরং তার উল্টো: ঐ পরিমাণটা বেড়ে আসছে। যেমন, ১৯৫৫ এবং ১৯৬৪ সালের মধ্যে এই দেশগুলির রপ্তানি বেড়েছিল ৫৬ শতাংশ, আর ঐ একই সময়ে তাদের আমদানির পরিমাণ বেড়েছিল ৩৭·৭ শতাংশ। তাহলে, তাদের রপ্তানি আর আমদানি দুইই পরিমাণে বেড়েছে। কিন্তু মূল্যের নিরিখে দেখলে চোখে পড়ে ভিন্ন চিত্র। দেখা যায়, ঐ একই ১৯৫৫—১৯৬৪ সাল কালপর্যায়ে তাদের রপ্তানি বেড়েছে মাত্র ৪৫ শতাংশ, কিন্তু আমদানি বেড়েছে ৪২ শতাংশ। অর্থাৎ কিনা, মুক্ত দেশগুলির রপ্তানি পণ্যগুলির ইউনিট মূল্য কমে গেছে, আমদানি করা জিনিসগুলির ইউনিট মূল্য বেড়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী এই দু'রকমের দেশের রপ্তানি-আমদানির দামের মধ্যে অনুপাত থেকে বেশ কিছু জানা যায়। একে বলে 'বাণিজ্যের অবস্থা'। অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির বাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তনের বিভিন্ন সূচক সংখ্যা নিচে দেওয়া হল — এতে ১৯৫৮ সালকে বুনিয়াদী কালপর্যায় ধ'রে সেটার সূচক অঙ্ক ধরা হয়েছে '১'।

৬ নং সারণী

বাণিজ্যের অবস্থা

(১৯৫৮ = ১)

	১৯৬০	১৯৬১	১৯৬২	১৯৬৩	১৯৬৪
অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি	১·০৪	১·০৪	১·০৫	১·০৫	১·০৫
তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি	০·৯৯	০·৯৬	০·৯৫	০·৯৬	০·৯৭

বেড়ে-চলা অনুপাতগুলি বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতি দেখাচ্ছে, আর অনুপাত কমে চলার অর্থ তার বিপরীত ধারা দেখায়। এইভাবে দেখা যাবে, কিছু কিছু বিচ্যুতি সত্ত্বেও সাধারণ ধারাটা হল অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতি, আর প্রাক্তন উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলির বেলায় সেটার অবনতি। অর্থাৎ কিনা, পৃথিবীর বাজারে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ঘাড় ভেঙে পয়সা করছে শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশগুলি।

এই প্রক্রিয়াটাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের এই ব্যবস্থাটার মধ্যে কোন কোন অংশীদার কেন সব সময়ে লাভবান হচ্ছে, আর অন্যান্য অংশীদারদের কেন ঠিক তেমনি সব সময়েই লোকসান হচ্ছে — এতে অনেককিছু স্পষ্ট বোঝা যাবে।

এ ব্যাপারে কতকগুলি কারণ সক্রিয় রয়েছে — কারণগুলির কোন কোনটা উৎপাদনক্ষেত্রের, আবার অন্যান্যগুলি বণ্টনক্ষেত্রের। ঐ প্রথম ধরনের কারণগুলি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ করা যাক। আগেই বলা হয়েছে, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে যা তার চেয়ে মুক্ত দেশগুলিতে অনেক কম -- তার অর্থ হল সম পরিমাণ তুলনীয় জিনিস উৎপন্ন করতে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চেয়ে মুক্ত দেশগুলিতে বেশি শ্রম নিয়োগ করতে হয়। বেশি শ্রম নিয়োগ করতে হলে ব্যয়ও বেশি পড়ে — তাই, মুক্ত দেশগুলিতে উৎপন্ন পণ্যগুলির বাবত জাতীয় ব্যয় হয় অপেক্ষাকৃত বেশি। বলা হচ্ছে জাতীয় ব্যয়ের কথা: বিশ্ব বাজারে সেগুলি বিক্রি হয় সেগুলির আন্তর্জাতিক মূল্যে, সেটা সাধারণত অপেক্ষাকৃত কম, — অগ্রসর রাষ্ট্রগুলিতে বিদ্যমান উৎপাদনের অবস্থা দিয়ে সেটা প্রভাবিত হয়। ফলে, মুক্ত দেশগুলিতে উৎপন্ন পণ্যগুলির জাতীয় ব্যয় এবং আন্তর্জাতিক মূল্যের মধ্যে অনুপাত এই দেশগুলির পক্ষে অনুকূল নয়।

অন্যত্র দেখানো হয়েছে, প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলি বিশ্ব বাজারে যেসব মাল ফেলে সেগুলি সাধারণত খাদ্যদ্রব্যসামগ্রী এবং কৃষিজাত আর খনিজ কাঁচামালের বাইরে কিছু নয়। তবে, এইসব এবং বিভিন্ন তুলনীয় পণ্য কিংবা দ্রব্যসামগ্রী শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও উৎপন্ন হয়, এইসব দেশে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি অনেক বেশি, শুধু তাই নয়, সেটা বাড়েও মুক্ত দেশগুলিতে যেমন তারচেয়ে বেশি দ্রুত। এর ফলে (ক) প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে উৎপন্ন

পণ্যগুলির আন্তর্জাতিক মূল্যে কমে যায়; (খ) তাদের জিনিসগুলি এবং পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে উৎপন্ন বিভিন্ন তুলনীয় জিনিস বিশ্ববাজারে এত বেশি পরিমাণে পড়ে যার ফলে ঐ বাজারে সরবরাহ মাত্রাতিরিক্ত হবার ফলে ঐসব জিনিসের আন্তর্জাতিক মূল্য আরও কমে যায়।

এই প্রতিকূল ধারাটার প্রতিকূলতা করা মুক্ত দেশগুলির পক্ষে আরও কঠিন হয় — তার কারণ তাদের যেসব রপ্তানি করা পণ্য বাজারগুলোতে অমন মাত্রাতিরিক্ত সরবরাহ ঘটায় সেসব পণ্যের রপ্তানি কমিয়ে দিয়ে চলতে তারা পারে না। আগেই দেখা গেছে, তাদের যত কফি কিংবা তুলো কিংবা চীনাবাদাম কিংবা সিসাল উৎপন্ন হয় তার সবটাই বিক্রি করবার সামর্থ্যের উপর তাদের অর্থনীতি খুবই বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল। অথচ, কৃত্রিম উপায়ে তৈরি বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদন দ্রুত বাড়ছে — ফলে, মুক্ত দেশগুলিতে উৎপন্ন অনেক রকমের কাঁচামালের চাহিদা সমানে সংকুচিত হয়ে পড়ছে। তাদের ঐসব পণ্যের রপ্তানির সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তাছাড়াও এই পরিস্থিতিতে ঐসব পণ্যের দামও পড়ে যায়।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখন সক্রিয় এইসব প্রক্রিয়া জাতীয় ব্যয় এবং আন্তর্জাতিক মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ফলে একদিকে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি এবং অন্যদিকে মুক্ত দেশগুলির মধ্যে অসমতুল্য বাণিজ্য দেখা দেয়। অসমতুল্য জাতীয় মূল্য কিংবা নিযুক্ত শ্রমের অসমতুল্য পরিমাণের একটা পরিণতি হল অসমতুল্য বাণিজ্য। শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে বেশি রকমের অসমতার ভিতরে রয়েছে তার মূলটা। আর এটা হল বহু বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ ফল, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির উৎপাদনশক্তি-গুলির বিকাশ ব্যাহত করার জন্যে এই ঔপনিবেশিক শাসনই দায়ী।

দামের উপর প্রভাব বিস্তার করার অন্যান্য উপাদানও আছে -- সেগুলি বণ্টনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। আমরা জানি, পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব বাজারে সক্রিয় রয়েছে বিভিন্ন পরাক্রমশালী একচেটিয়া কারবার -- নিজেদের স্বার্থ অনুসারে যেকোন পণ্যের দাম বাড়াতে কিংবা কমাতে তারা ষোল-আনাই সক্ষম। অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিকে নিয়ে যে-আর্থনীতিক ব্যবস্থাটা তার অপরিহার্য অঙ্গ এই একচেটিয়াগুলির কার্যকলাপ যে সব সময়েই মুক্ত দেশগুলির স্বার্থের পরিপন্থী এটা অবশ্যম্ভাবী। যেমন, মুক্ত দেশগুলিতে নিজেদের অধীনস্থ বিভিন্ন কোম্পানির উৎপন্ন বিভিন্ন খনিক

আর আকরিক একেবারে জলের দামে কিনে নেওয়া তাদের পক্ষে নিতান্তই রেওয়াজী ব্যাপার. ঐসব অধীনস্থ কোম্পানির যেকোন লোকসানে তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। আসল গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হল এই যে, যেমন ধরা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা ইংলণ্ডে মূল কারবারটা চূড়ান্ত মাত্রায় সস্তা কাঁচামাল পেয়ে সেটার আকারণ ঘটিয়ে সেটাকে শিল্পোৎপন্ন জিনিস হিসেবে যত বেশি সম্ভব চড়া দামে বিশ্ব বাজারে বিক্রি করে। এইভাবে, সংশ্লিষ্ট মুক্ত দেশটির যা লোকসান হয় সেটা এই: বৈদেশিক কোম্পানির রপ্তানি করা কাঁচামাল বাবত দাম পাওয়া যায় কম, সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল হল দেশটির জাতীয় রপ্তানি পণ্যের একটা। আর সব মিলিয়ে দেশটির বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় কম।

একচেটিয়া কারবারগুলো অবশ্য সর্বশক্তিমান নয় — তার অন্তত এই সহজ-সরল কারণ রয়েছে যে, তাদের নিজেদের মধ্যে গলাকাটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। তারা সব সময়েই এবং ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় বিশ্ব বাজারের বিভিন্ন দামকে বিভিন্ন পণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্য থেকে সরিয়ে দিতে পারে না। মূল্যের নিয়ম একচেটিয়া দামের চেয়ে প্রবল। তবু, আন্তর্জাতিক দামের তারতম্য ঘটাবার উপর একচেটিয়া কারবারগুলির প্রভাব খুবই প্রবল। মুক্ত দেশগুলির কথা এই যে, রপ্তানি থেকে আয়ে যেকোন লোকসান সাময়িক হলেও সেটা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

অসমতুল্য বাণিজ্য আর একচেটিয়া দাম, এই দুইয়ের মিলিত ক্রিয়ায় মুক্ত দেশগুলির গুরুতর লোকসান হয়। ধরা যাক আগেকার দশক যাবত যদি বিভিন্ন পণ্যের দাম সুস্থিত থাকত তাহলে যেকোন চলতি বছরে মুক্ত দেশগুলির রপ্তানি থেকে আয় কত হত সেটা হিসাব করলে ঐসব লোকসানের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। ১৯৬৪ সালে জেনেভায় বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনে এই রকমের হিসাব পেশ করা হয়েছিল। এইভাবে, ১৯৫০ সালকে বুনিয়াদী বছর হিসেবে ধরে দেখা গিয়েছিল, ১৯৬২ সালে পরিবর্তিত বাণিজ্যের অবস্থার দরুন মুক্ত দেশগুলির লোকসান হয়েছিল ৩০০ কোটি ডলারের বেশি।

বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুক্ত দেশগুলির উপর যে কী শোষণ চলে তার তাৎপর্যটা একটা সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নিচে-উল্লেখিত প্রত্যেকটি দেশকে একটা ৩০-৩৫ অশ্বশক্তির ট্র্যাক্টরের ক্রেতা বলে ধরা হবে, — বিশ্ব বাজারে এইসব ট্র্যাক্টরের সরবরাহকারী হবে বিভিন্ন পশ্চিমী

কারবার। ধরা যাক, ৩·০৬ টন কোকো-শিম বিক্রির পয়সা দিয়ে ঘানা ১৯৫৫ সালে ঐ রকমের একটা ট্র্যাক্টর কিনতে পেরেছিল। ঐ রকমের ট্র্যাক্টর ১৯৬২ সালে কিনতে ঘানাকে কোকো-শিম বিক্রি করতে হল ৭·১৪ টন। অমন একটা ট্র্যাক্টর কিনবার জন্যে ব্রেজিলকে ১৯৫৫ সালে কফি বিক্রি করতে হয়েছিল ২·৩৮ টন, আর সেজন্যে ১৯৬২ সালে তাদের কফি বিক্রি করতে হল ৪·৭৯ টন। তুরস্কের ক্ষেত্রে — ঐ দুই বছরে ঐ রকমের ট্র্যাক্টরের সমতুল্য হল যথাক্রমে ১·৭৭ এবং ২·৯ টন তামাক। কয়েকটি দেশের জাতীয় উৎপাদের হিসাবে ঐ ট্র্যাক্টরের বাবত ব্যয় খতালে দেখা যায়, ১৯৫৫—১৯৬২ সালের কালপর্যায়ে ব্যয়টা বেড়েছিল বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ: ফিলিপাইন ২১ শতাংশ, জ্যাম্বিয়া (এদেশ তখনও ছিল উত্তর রোডেসিয়া) ২৮ শতাংশ, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ৬১ শতাংশ, ভেনেজুয়েলা ১৯ শতাংশ, মালয়েশিয়া ৭০ শতাংশ, সিংহল ৫৫ শতাংশ এবং উরুগুয়ে ২০ শতাংশ।

এই রকমের কাজ-কারবারেই পারস্পরিক বাণিজ্যের ফল দাঁড়ায় মুক্ত দেশগুলির লোকসান আর অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির লাভ। ঔপনিবেশিক বশ্যতার দরুন কেউ কর আদায় করছে না: সেই আদায়কারীদের কাজটা এখন গেছে বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক বাজারের বন্দোবস্তটার হাতে, সেই বন্দোবস্তটার মারফত শোষক রাষ্ট্রগুলি মুক্ত দেশগুলির জাতীয় উৎপাদের একাংশ মাগনাই হাত করে নেয়।

বৈদেশিক বিনিময়ের অন্যান্য সূত্রের উপর নির্ভর করে উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের বহির্বাণিজ্যের লোকসান মেটাবার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে। এই রকমের দুটো সূত্র হল ব্যক্তিগত পুঁজির আন্তর্জাতিক প্রচলন এবং বৈদেশিক সরকারী অনুদান। পশ্চিমী বিশেষজ্ঞদের তাত্ত্বিক পরিকল্পনাগুলিতে এবং কার্যক্ষেত্রের বিভিন্ন সুপারিশে উন্নয়নশীল দেশগুলির বহির্বাণিজ্যের লোকসান মেটাবার জন্যে ব্যক্তিগত পুঁজি রপ্তানি এবং সরকারী অনুদান কাজের হতে পারে বলে ধারণাটা সব সময়েই তুলে ধরা হয়।

যেমন, উন্নয়নশীল দেশগুলির রপ্তানি থেকে পাওয়া আয়ের উপর প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পশ্চিমী পদ্ধতিতে এই ধারণাটার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্যাবলি সম্বন্ধে মার্কিন বিশেষজ্ঞ পল জি. হফ্‌ম্যানের হিসাবে, এইসব দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ হলে

১৯৬১—১৯৭০ সালের কালপর্যায়ে প্রয়োজনীয় আমদানি বাবত তাদের দিতে হবে মোটামুটি ৪৪০০০ কোটি ডলার। ঐ দশকে তাদের রপ্তানি থেকে আয় হতে পারে মোট ৩৭৮০০ কোটি ডলার। কাজেই, ঐ দশকে তাদের বাণিজ্য উদ্বৃত্তে ঘাটতি হতে পারে ৬২০০ কোটি ডলার। তার উপর, দেনা বাবত, পরিবহন ব্যয় এবং অন্যান্য যেসব কৃত্যকে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ আছে সেগুলির জন্যে চাই অন্তত ৮০০ কোটি ডলার, এইভাবে গোটা কালপর্যায়ের জন্যে মোট অতিরিক্ত প্রয়োজন দাঁড়ায় ৭,০০০ কোটি ডলার বা বছরে গড়ে ৭০০ কোটি ডলার। হফ্‌ম্যানের হিসাব অনুসারে, উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষতিপূরণ বাবত বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজি এবং সরকারী সাহায্য থেকে ঐ পরিমাণ অর্থই চাই।*

জেনেভায় বাণিজ্য এবং উন্নয়নসংক্রান্ত সম্মেলনে জাতিসংঘের খাদ্য-কৃষি সংগঠনের বিশেষজ্ঞেরা ১৯৬৪ সালের বসন্তকালে অনুরূপ হিসাবই পেশ করেছিলেন, যদিও তাতে বিভিন্ন নির্দেশক ছিল কিছুটা পৃথক।**

আফ্রিকার 'অনুসঙ্গী' রাষ্ট্রগুলির প্রতি 'ইউরোপীয় আর্থনীতিক গোষ্ঠীর' (বারোয়ারী বাজার) আর্থনীতিক কর্মনীতির একটা বুনিয়াদী উপাদান হয়ে উঠেছে এইসব পদ্ধতি। বলা হয়, ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে বাণিজ্যে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির যে লোকসান হয় সেই ক্ষতি বারোয়ারী বাজারের সাহায্য তহবিল দিয়ে পূরণ হতে পারে।

পশ্চিমে আরও যুক্তি দেখানো হয় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলি বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগ হিসেবে যে তহবিল পায় তাতে অন্যান্য সূত্রে পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গে তুলনায় কোন কোন ভাল রকমের সুবিধা আছে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহিঃআর্থনীতিক কর্মনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রের সুপারিশ আছে একটা আলোচনায়, তাতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে: '...ব্যক্তিগত পুঁজি যা যায় তার পরিমাণের চেয়ে বেশি গুরুত্বসম্পন্ন হল এই যে, ঐ ব্যক্তিগত পুঁজির সঙ্গে থাকে টেকনিকাল আর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা এবং কাজ-কারবার সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ, — কম-

---

* Paul G. Hoffman, *One Hundred Countries, One and One Quarter Billion People*, Washington, 1960, p. 54.

** U. N. Conference on Trade and Development. International Commodity Problems. Geneva. March 26, 1964, Document E/Conf. 46/61, p. 30.

উন্নত দেশগুলিতে আরও বেশি উৎপাদের উদ্দেশ্যে লোক-বল এবং বৈষয়িক সহায়-সম্পদ জড়ো করার জন্যে ঐগুলি সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন।*

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আরও বেশি পুঁজি রপ্তানি করার সপক্ষে যুক্তি যা-ই হোক না কেন, এর খাস প্রয়োজন সম্বন্ধে সাধারণত কোন প্রশ্ন তোলা হয় না। বেশির ভাগ পশ্চিমী অর্থনীতিবিদই নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন যে, বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগ প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির পক্ষে একটা আশীর্বাদ। সেটা যাচাই করে দেখা দরকার।

পরখ করার একটা সহজ-সরল উপায় ধরে দেখা যাক, মুক্ত দেশগুলিতে বৈদেশিক পুঁজির প্রবেশ, আর বৈদেশিক কোম্পানিগুলির সংশ্লিষ্ট মুনাফার মধ্যে তুলনাটা কেমন দাঁড়ায়। এখানে উল্লেখিত সারণীটা বিভিন্ন সরকারী তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।**

৭ নং সারণী

মুক্ত দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কোম্পানির প্রত্যক্ষ লগ্নী এবং মুনাফা

(নিযুত ডলার)

সাল	প্রত্যক্ষ পুঁজি বিনিয়োগ	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুনঃপ্রেরিত মুনাফা
১৯৫৯	৫২৫	১,৪১০
১৯৬০	২২৯	১,৪৬৯
১৯৬১	৪১৯	১,৬১৬
১৯৬২	২০৩	১,৮৮২
১৯৬৩	৪৫১	১,৯৬৯
১৯৬৪	৫২৩	২,২৮৯
১৯৬৫	৮০৭	২, ২৫২
১৯৬৬	৫১৯	২, ৩৪৪

* *Economic Policies Toward Less Developed Countries.* Studies prepared by Raymond F. Mikesell and Robert Loring Allen, Washington, 1961, p. 49.

** *Survey of Current Business.* Washington, August and September issues for 1960-1967.

প্রথম স্তম্ভের অংকগুলি দেখে কারও মনে হতে পারে, বিভিন্ন মার্কিন কোম্পানির ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগ হিসাবে ঐগুলি যেন মুক্ত দেশগুলির জাতীয় সম্বল-সংস্থানের ক্ষেত্রে বার্ষিক বৃদ্ধির পরিমাণ। কিন্তু, দ্বিতীয় স্তম্ভের অংকগুলি এই পুঁজি ঢুকবার ব্যাপারটাকে একেবারে নাকচ করে দিচ্ছে — প্রকৃতপক্ষে ঐ পুঁজি ছাঁকা লোকসানই ঘটায়। পুনঃপ্রেরিত মুনাফা এবং বাইরে থেকে আসা বিনিযুক্ত পুঁজির পরিমাণের মধ্যে বিয়োগফলটা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিগত মালিকানার কারবারগুলির খাটানো প্রণালীর দরুন মুক্ত দেশগুলির ছাঁকা লোকসানের পরিমাণ।

হিসাব কষে দেখা গেছে, সমগ্রভাবে মুক্ত দেশগুলির লোকসান হয় বার্ষিক গড়ে ৩০০ কোটি ডলার — সেটা মুনাফা হিসেবে পুঁজি-রপ্তানিকারী রাষ্ট্রগুলিতে পুনঃপ্রেরিত হয়। এইভাবে দেখা যায়, প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে ব্যক্তিগত পুঁজি রপ্তানি হল ঐসব দেশের উপর শোষণের আর একটা পদ্ধতি মাত্র।

আন্তর্জাতিক পুঁজিতান্ত্রিক কারবারী চলিতকর্মের অন্যান্য প্রচলিত ধারায়ও মুক্ত দেশগুলির বিস্তর লোকসান হয় — সেগুলি হল, যেমন, জাহাজ ভাড়া করা, বীমা, বিনিময় হারের ওঠা-নামা, ইত্যাদি।

মোট হিসাবনিকাশে দেখা যায়, মুক্ত দেশগুলি বছরের পর বছর আয়-ব্যয়ের সাম্য বজায় রাখতে অপারগ হয়। সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে চলতি বাণিজ্যিক দায়-দায়িত্ব মেটানো, বৈদেশিক একচেটিয়া কারবারগুলোর মুনাফা পুনঃপ্রেরণের ব্যবস্থা (সেটা করা হয় ডলারে আর স্টার্লিং-এ, কখনও স্থানীয় মুদ্রায় নয়), সুদসমেত সরকারী দেনার ব্যবস্থা, ইত্যাদি বাবত মুক্ত দেশগুলির বছরে ৬০০ কোটি ডলার কম পড়েছিল।

এ বিষয়টা আরও খুঁটিয়ে দেখা দরকার কেননা, তহবিলে ঘাটতির দরুন এই দেশগুলি অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির বাণিজ্য-অংশীদারদের কিংবা তাদের দেশে সক্রিয় বৈদেশিক একচেটিয়াগুলোর কিংবা পশ্চিমী পাওনাদার সরকারগুলির পাওনা দেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হলে কী ঘটবে সে কথা মনে আসা স্বাভাবিকই। তার অর্থ দাঁড়াবে -- পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্টি করা আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক সম্পর্ক-ব্যবস্থার ভাঙন; ঐ ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করবার জন্যে পশ্চিমীরা আর একটা উপায় বের করেছে — সেটা হল বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ক্রেডিট আর অনুদান, সেটাকে 'সাহায্য' নাম দিতেই তারা পছন্দ করে।

শোষণের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাটা বজায় রাখতে গিয়ে ৬০০ কোটি ডলার কম পড়লে সেই ৬০০ কোটি ডলারের ব্যবস্থা করা হয়। পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন সরকার রাষ্ট্রীয় ক্রেডিট আর অনুদান হিসেবে মুক্ত দেশগুলিকে যে অর্থ দেয় তার পরিমাণ হয় ঠিক ঐ ৬০০ কোটি ডলারই। এই টাকাটা দেয় শেষপর্যন্ত ঐসব অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশের করদাতারা — অর্থাৎ কিনা, পকেট খালি করে নেওয়া হয় প্রধানত মেহনতিদেরই। মুক্ত দেশগুলি এইসব আগাম বাবত আসল কিংবা সুদের টাকা দিলে সেই টাকা যায় সংশ্লিষ্ট পাওনাদার সরকারগুলির হাতে — ঐসব দেশের করদাতাদের হাতে নয়। অর্থাৎ কিনা, প্রাক্তন উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলির উপর শোষণের ব্যবস্থাটাকে চালু রাখার জন্যে খাস পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতেই মেহনতী জনগণের উপর শোষণ চালানো দরকার।

সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসায়ী কাজে-কারবারে মুক্ত দেশগুলিকে যত আর্থিক সংস্থান করতে হয়েছে তার মূল্যে ১০০ ধরা হলে দেখা যায়, ঋণ, বৈদেশিক পুঁজি এবং বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য আর্থিক আর বৈষয়িক সম্বল-সংস্থানের পরিমাণ হয় ২২·৫। আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির উপর প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির নির্ভরশীলতার মাত্রাটা দেখা যায় ঐ অনুপাত থেকে। কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন, ১৯৭০ সাল নাগাত ঐ নির্দেশকটা দাঁড়াবে ২৯·২। আরও কোন কোন নৈরাশ্যবাদী হিসাবে বলা হয় অংকটা দাঁড়াবে ৫১। এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করার সময়ে অবশ্য ধরে নেওয়া হয় যে, মুক্ত দেশগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের বর্তমান ধারাগুলো অপরিবর্তিতই থাকবে।

এইসব ধারা অতিক্রম করতে হলে অসমতুল্য বাণিজ্যের কুপরিণতিগুলো দূর করা দরকার, অর্থাৎ কিনা, মুক্ত দেশগুলিতে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বেশকিছু পরিমাণে বাড়ানো দরকার। বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক বাজারে একচেটিয়া কারবারগুলির যা-খুশি-তাই করবার অধিকারও খর্ব করা দরকার। মুক্ত দেশগুলির সামনে আরও একটা কাজ হল বৈদেশিক কারবারগুলোর লুণ্ঠনধর্মী ক্রিয়াকলাপ শায়েস্তা করা, — যেসব দেশে তারা সক্রিয় সেইসব দেশে লোক-বল আর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শোষণ চালিয়ে ঐসব কারবার বিপুল পরিমাণ মুনাফা পুনঃপ্রেরণ করছে নিজেদের দেশে দেশে। প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে অর্থনীতির এক-ফসলা

অবস্থাটার অবসান ঘটানোও আর একটা সমস্যা। আর শেষে, অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি থেকে মুক্ত দেশগুলি যেসব ঋণ আর অনুদান পায় সেগুলির জন্যে সুবিধাজনক শর্তাদি পাবার জন্যে দরকষাকষি করার সময় হয়েছে।

এইসব খাতে কাজ চালালে সেটা প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির পক্ষে যথার্থই লাভজনক হতে পারে। সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে এইসব দেশের মোট জাতীয় উৎপাদের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৪৫০ কোটি ডলার। এই দেশগুলি যদি পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কারবারগুলোকে বিপুল ঋণ আর সুদ বাবত বিপুল পরিমাণ টাকা দেওয়া এবং অত্যধিক পরিমাণ মুনাফা দেবার হাত থেকে রেহাই পেত তাহলে ঐ বৃদ্ধির পরিমাণ দ্বিগুণ হতে পারত, কিংবা, অন্যভাবে বলা যায়, তাদের আর্থনীতিক উন্নয়নের হার হতে পারত দ্বিগুণ।

তবে, এখন যা অবস্থা তাতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অমন প্রবল পরিবর্তনের প্রশ্ন ওঠে না। তাদের উৎপন্ন সম্পদের একাংশ তারা অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয় — সেটাই তাদের আর্থনীতিক নির্ভরশীলতার আয়তন।

আর্থনীতিক নির্ভরশীলতা বলতে কি বুঝায় সেটা এখন নির্ধারণ করা দরকার। যেমন, ইংলন্ডকে অর্থনীতিগতভাবে নির্ভরশীল দেশ বলা ঠিক কি? জানা আছে, ইংলন্ডে পর্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয় না — তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর প্রায় অর্ধেক তাদের আমদানি করতে হয়: কেনিয়া কিংবা উগান্ডার চেয়ে ইংলন্ডকে বেশি নির্ভরশীল বলা ঠিক হবে কি? কেনিয়া আর উগান্ডা তো অন্তত নিজেদের দেশের মানুষকে খাওয়াতে পারে।

দেখা যায়, কোন দেশ আমদানি করতে আগ্রহশীল এবং, হয়ত, সেই আমদানির উপর তাদের টিকে থাকাই নির্ভর করে, তার চেয়ে বড় কথা হল এই যে, আর্থনীতিক বিচারে এইসব আমদানি কতখানি লাভজনক। ইংলন্ড তার উঁচু মাত্রায় উন্নীত শিল্পের উৎপাদের বিনিময়ে খাদ্যসামগ্রী আমদানি করে। ইংলন্ডের শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির মাত্রা যা উঁচু তাতে এই বিনিময় তার পক্ষে নিশ্চয়ই লাভজনক। কাজেই, ইংলন্ড সম্বন্ধে কথা হল এই যে, এটা নির্ভরশীলতার ব্যাপার নয় — এটা হল আন্তর্জাতিক কর্মবিভাগের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার।

অর্থনীতিগতভাবে কম উন্নত দেশগুলির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিস্থিতিটাকে এবার বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। ইথিয়োপিয়া কফি উৎপন্ন করে এবং চালান দেয় -- এই দেশটিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরলে দেখা যায়, এদেশে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি কম। এর অর্থ হল, ধরা যাক, ইংলন্ড থেকে কেনা জিনিসের বাবত এই দেশটিকে নিযুক্ত শ্রমের হিসাবে দিতে হয় বিনিময়ে পাওয়া জিনিসের চেয়ে বেশি। এদিক দিয়ে দেখলে, বিনিময়টা তার পক্ষে লাভজনক নয়। কিন্তু আমদানি করা জিনিসের জন্যে তার প্রয়োজনটা এমন যাতে ঐ আমদানিটা একেবারে বাদ দিয়ে, এমনকি তার পরিমাণটা কমিয়েও তার চলে না। আর, যেহেতু নিযুক্ত শ্রমের হিসেবে, এই দেশটি যা পায় তার চেয়ে তার দিতে হয় বেশি, তাই, তাকে সব সময়েই কফির উৎপাদন বাড়াবার এবং সেটা রপ্তানি করার চেষ্টা করতেই হয় — তাতে লোকসান হলেও। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইথিয়োপিয়ার ব্যাপারটা ইংলন্ডের বিপরীত: আন্তর্জাতিক কর্মবিভাগের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার নয় — এটা হল আর্থনীতিক নির্ভরশীলতার ব্যাপার।

পুঁজির আন্তর্জাতিক চলাচলের বেলায়ও ঐ একই কথা। বৈদেশিক একচেটিয়া কারবারগুলো মুক্ত দেশগুলি থেকে যে মুনাফা নিয়ে যায় সেটা সব সময়েই ঐসব দেশে নতুন পুঁজি যা ঢোকে তার চেয়ে বেশি, তা আগেই দেখা গেছে। কিন্তু, বিভিন্ন অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পুঁজি রপ্তানির মধ্যে আন্তর্জাতিক লুণ্ঠনের মতো কিছুই দেখা যায় না, সেটা নিচে সারণীতে সহজেই দেখা যায়।

৮ নং সারণী

অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিগত পুঁজির চলতি রপ্তানি এবং মুনাফা পুনঃপ্রেরণ

(বার্ষিক গড়; নিযুত ডলার হিসেবে)

কালপর্যায়	সরাসরি বিনিয়োজিত পুঁজি	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুনঃপ্রেরিত মুনাফা
১৯৫৩—১৯৫৭	৬৬৩	৫৫৮
১৯৫৮—১৯৬২	১,১৩০	৯২০

এই সারণী থেকে দেখা যায়, ব্যাপারটা মুক্ত দেশগুলির মতো নয়: ব্যক্তিগত মার্কিন পুঁজির গ্রহীতা হিসেবে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কোন বৈদেশিক মুদ্রার লোকসান হয় না। তারা বরং যা দেয় তার চেয়ে বেশিই পায়।

এর প্রধান কারণ হল পুনঃবিনিয়োগ: অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বৈদেশিক একচেটিয়া কারবারগুলি যে মুনাফা করে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদনে এবং সম্প্রসারণের কাজে নিয়োগ করা হয়। মুক্ত দেশগুলিতে তার উলটো: মুনাফাটা পুঁজি-রপ্তানিকারী দেশগুলিতেই প্রধানত ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তার কারণ, বৈদেশিক পুঁজি ঐসব দেশে লাভজনক বিনিয়োগের শুধু সীমাবদ্ধ সুযোগসুবিধাই দেখতে পায়, তাছাড়া, বড় বড় কারখানা বসাবার আগ্রহও তারা বোধ করে না, ঐসব কারখানার উৎপাদ অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ স্থানীয় বাজারে বিক্রি হতে পারে না। এছাড়া অন্যান্য বাধাও আছে — যেমন, রাস্তা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, জলের পাইপ, ইত্যাদি তল-কাঠাম গড়ায় অতিরিক্ত উপরি-ব্যয়। অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বিভিন্ন শিল্পায়তনের লাভজনক এবং সুফলপ্রদ পরিচালনের জন্যে অপরিহার্য তল-কাঠাম সাধারণত আগে-প্রস্তুত অবস্থায়ই পাওয়া যায়।

তবে, যেমন বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, তেমনি এই ক্ষেত্রেও মুক্ত দেশগুলি বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজি আনবার কঠোর প্রয়োজনের সম্মুখীন হয় — তার ফলে নতুন দফায় মোটা রকমের লোকসান সত্ত্বেও। এটা হল বিভিন্ন পরদেশের উপর এই দেশগুলির আর্থনীতিক নির্ভরশীলতার আর একটা প্রকাশ।

যা আগেই দেখা গেছে, এই সমস্ত আর্থনীতিক ব্যাপারের মূল কারণ হল প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির সাধারণ আর্থনীতিক অনগ্রসরতা। কিছুটা ভিন্ন রূপে এটাকে এইভাবে সূত্রবদ্ধ করা যায়: বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার ভিতরে মুক্ত দেশগুলির নির্ভরশীল এবং শোষিত অবস্থার মূলে প্রধান প্রধান আর্থনীতিক উপাদান হল উৎপাদনশক্তিগুলির নিচু মাত্রা এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির কমতি।

অবশ্য, এগুলি হল বিভিন্ন বিষয়গত আর্থনীতিক উপাদান। বাস্তবে, প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির উপর শোষণ চালিয়ে

যাবার জন্যে এই দেশগুলির ঐ আর্থনীতিক নির্ভরশীলতাটাকে বজায় রাখাই পশ্চিমী শক্তিগুলি এবং তাদের একচেটিয়া কারবারগুলোর সুপরিকল্পিত কর্মনীতি, তার ফলে পরিস্থিতিটা আরও বেশি প্রকোপিত হয়।

এই কর্মনীতি রূপায়িত করা হয় নানা উপায়ে — যেমন, বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক বাণিজ্যের কোন একটা ক্ষেত্রে একচেটিয়া কায়েম ক'রে। এইভাবে, একটা তৈল কার্টেলে বিভিন্ন মার্কিন কারবারের প্রভুত্বের ভূমিকা থাকায় সেই কার্টেলটা মধ্য প্রাচ্যের তৈল-উৎপাদনকারী দেশগুলির আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের উপর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ খাটায়।

হরেক রকমের বাণিজ্যিক অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা দিয়েও ঐ একই মতলব হাসিল করা হয় — এই বাণিজ্যিক অগ্রাধিকারের ব্যবস্থাটায় মুক্ত দেশগুলিকে নিজেদের বাজারের সঙ্গে বেঁধে রাখার জন্যে পশ্চিমী শক্তিগুলি ঐসব দেশের বিভিন্ন রুদ্ধ গ্রুপকে রপ্তানি আর আমদানির ব্যাপারে কোন কোন অনুকূল শর্ত দেয়। যেমন, প্রাক্তন বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলিকে অর্থনীতিগতভাবে ইংলন্ডের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল করে রাখার জন্যে ঐ ব্যবস্থাটাকেই ব্যবহার করা হয়। লাতিন আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলির বহির্বাণিজ্যের উপর কর্তৃত্ব আরও জোরদার করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ব্যবহার করে ঐ একই ব্যবস্থা। আফ্রিকার বহু মুক্ত দেশের অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্যেও ঐ একই পদ্ধতি ব্যবহার করে ইউরোপীয় আর্থনীতিক গোষ্ঠী। বারোয়ারী বাজারের 'অনুসঙ্গী' নতুন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির রপ্তানির চার-পঞ্চমাংশের বেশি নিয়ন্ত্রণ করে ঐ বারোয়ারী বাজার।

প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির আর্থনীতিক নির্ভরশীলতা বজায় রাখার উপায় হিসেবে বিভিন্ন মুদ্রা এলাকাও (যেমন, স্টার্লিং এলাকা, ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ। অমন দেশগুলির জাতীয় আর্থ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ফিনান্স পুঁজি এবং একচেটিয়া পুঁজি ঐগুলিকে ব্যবহার করে।

এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির আর্থনীতিক স্বাধীনতা গণ্ডিবদ্ধ করার আর একটা উপায় হল পশ্চিমী রাষ্ট্রীয় ঋণ এবং অনুদান সংক্রান্ত কর্মনীতি — এতে ঐ দেশগুলির জাতীয় দায়দায়িত্ব বেড়ে যায়, শুধু তাই নয়, ঐসব দেশের অর্থনীতির গড়ন, এমনকি দেশগুলির

বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতেও সেটা কাজে লাগে। যেমন, এটা লক্ষণীয়, বিভিন্ন আর্থনীতিক সাহায্য কর্মসূচি অনুসারে পশ্চিমীরা ঐসব দেশের জন্যে যত অর্থ বরাদ্দ করেছে তার প্রায় এক-দশমাংশ মাত্র শিল্পোন্নয়নের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল, পশ্চিমী সাহায্য কর্মনীতি ঐ দেশগুলিকে কৃষিজাত এবং খনিজ কাঁচামালের উৎপাদনকারীর অবস্থায়ই বজায় রাখতে চায়।

কোন প্রাক্তন উপনিবেশ এবং তার প্রাক্তন সাম্রাজ্যিক দেশের মধ্যে বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের মধ্যে আর্থনীতিক নির্ভরশীলতার বিভিন্ন অতিরিক্ত সুনির্দিষ্ট উপাদান শর্ত হিসেবে থাকতে পারে; ঔপনিবেশিক আমলে ঐ সাম্রাজ্যিক দেশের অবস্থা কি ছিল, সাধারণত তার একটা গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকা থাকে ঐসব সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

মোট কথা, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলি যেসব সম্পর্কের জটিল জালে ধরা পড়ে তাতে তাদের জাতীয় আর্থনীতিক স্বাধীনতা গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর, প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির সাধারণ আর্থনীতিক অনগ্রসরতাই তো বিদ্যমান পরিস্থিতির মূল কারণ।

আর্থনীতিক উন্নয়নের এই নিচু মাত্রার দরুন সব সময়েই, অর্থাৎ কিনা, যেকোন পরিস্থিতিতেই, আর্থনীতিক নির্ভরশীলতা ঘটে কিনা সেটা এবার নির্ধারণ করার চেষ্টা করা দরকার। আর্থনীতিক উন্নয়নের বিভিন্ন মাত্রা — এই জিনিসটা তো সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলিতেও এসেছে অতীতের জের হিসেবে। এক্ষেত্রেও রয়েছে অপেক্ষাকৃত কম উন্নীত বিভিন্ন দেশ — এইসব দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন শিল্পের বেশ গুরুত্ব রয়েছে। এ বিষয়ে যেকোন সংশয় নিরসনের জন্যে এটা বিবেচনায় রাখা দরকার যে, পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনায় সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় আর্থনীতিক উন্নয়নের বিভিন্ন জাতীয় মাত্রার মধ্যেকার অসমতার ফলে পরিণতি ঘটে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায়, অপেক্ষাকৃত বেশি অগ্রসর দেশগুলি অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর দেশগুলিকে সাহায্য করে, যাতে তারা এগিয়ে ধরে ফেলতে পারে — এটাই বিশেষক। পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় তার বিপরীত: উঁচু মাত্রায় উন্নীত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং প্রাক্তন উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক ব্যবধানটা ক্রমাগত আরও বেড়েই চলে। তার কারণটাও সহজেই

নজরে পড়ে: সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার নিয়ম হল প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার সমুন্নত নীতিগুলির অনুযায়ী পারস্পারিক সহায়তা, আর পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় তার বিপরীত,—বুর্জোয়া সমাজের বিশেষক উপাদান প্রচলিত শোষণের সম্পর্কই আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চালানো হয়।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট এক রকমের সামাজিক অবস্থা থাকলে, একমাত্র তবেই, অর্থাৎ, পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব আর্থনীতিক ব্যবস্থায়ই, আর্থনীতিক অনগ্রসরতার দরুন আর্থনীতিক নির্ভরশীলতা ঘটে। তার মানে, পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব আর্থনীতিক ব্যবস্থার ভিতরে প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির নির্ভরশীল অবস্থার আর্থনীতিক ভিত্তি ছাড়াও একটা সামাজিক ভিত্তিও আছে।

এই যখন অবস্থা তাতে দেখা যাচ্ছে, এই দেশগুলি তাদের জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি না ঘটালে, উৎপাদনশক্তিগুলির উন্নয়ন না ঘটালে, সেগুলির শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি না বাড়ালে, এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে, অর্থনীতিক্ষেত্রে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র এবং বৈদেশিক একচেটিয়াগুলোর কর্তৃত্বের জাল কেটে বেরিয়ে না এলে, ঐভাবে বেরিয়ে এসে আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজি এবং একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ না চালালে তারা কখনও আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না। কার্যত এ হল ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট দুই প্রস্থ কাজ, বিশ্ব পুঁজিতন্ত্রের হাতে উৎপীড়ন থেকে মুক্ত দেশগুলির রেহাই পাওয়া এবং এই দেশগুলির আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জনই এইসব কাজের উদ্দেশ্য। সেটাই আমাদের একালে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

৩। আর্থনীতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিপুল হলেও এরই ফলে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির উপর বৈদেশিক উৎপীড়ন চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে না। এর ফলে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনও শেষ হয়ে যায় নি। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙনটা ঐ সংগ্রামের একটা মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে — তাতে ঐ সংগ্রামে একটা নতুন কাজকে অগ্রাধিকার দেবার অত্যাবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। পূর্ববর্তী পর্বে

রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল সেই কাজ; বর্তমান পর্বে কাজটা হল আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করা।

তবে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির বুঝি সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতিক বিরোধিতা করার প্রয়োজন আর নেই, এমন সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে। অবস্থাটা তার বিপরীত: এর প্রায় সমস্ত দেশেরই উপর সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতিক চাপ চলছে কম-বেশি পরিমাণে, তীব্র সামরিক চাপও চলছে প্রায়ই, কোন কোন দেশ ডাহা আক্রমণেরই শিকার হয়। প্রকৃতপক্ষে, এর কোন কোন দেশ এখনও ঔপনিবেশিক রাজের জোয়াল ঠেলে চলেছে, · স্বভাবতই, এইসব দেশের মুক্তিসংগ্রামের আশু এবং প্রধান লক্ষ্য আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করা নয় — সেটা হল রাজনীতিক স্বাধীনতা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব অর্জন করা।

কিন্তু, যেহেতু এখন আমরা বিচার-বিবেচনা করছি পৃথিবীজোড়া জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব নিয়ে, তাই, আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করাই এখন প্রধান লক্ষ্য — কেননা, বেশির ভাগ দেশই ইতোমধ্যে জাতীয় সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে।

ঔপনিবেশিক আমলে ঔপনিবেশিক জাতিগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনীতিক ক্ষমতা খাটাবার ফলে আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজি এবং একচেটিয়া পুঁজি অবাধে লুটতরাজ চালাতে পারত। আমাদের একালে, প্রাক্তন উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলির আর্থনীতিক অনগ্রসরতা আর নির্ভরশীলতার দরুন তাদের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ আসে নিরন্তর, তাদের উপর আসে রাজনীতিক আর সামরিক চাপ। সামরিক-ঔপনিবেশিক জোট আর চুক্তি, প্রত্যক্ষ আক্রমণ আর হস্তক্ষেপ, হুকুমবরদার সাক্ষীগোপাল কর্তৃপক্ষ, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বৈদেশিক বাধ্যবাধকতা, ইত্যাদির উপর-কাঠামের জন্যে এক রকমের বনিয়াদের কাজ করে ঐসব দেশের আর্থনীতিক নির্ভরশীলতা এবং অধিকারের অসমতা।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে, যেসব জাতি সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে তাদের পক্ষে রাজনীতিক স্বাধীনতা একটা গুরুত্বপূর্ণ সাধন। তবে, সেটা জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের স্বয়ংসমাপ্ত লক্ষ্য নয়। কোন জাতি রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করলে সেটা ব্যবহৃত হয় বিপ্লব এগিয়ে নেবার জন্যে, আর্থনীতিক স্বাধীনতা পাবার জন্যে, সমস্ত

রকমের বৈদেশিক শোষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জন করার জন্যে। আজকের জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের অনেক নেতা ঠিক এই মতই পোষণ করেন।

উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির উপর উপনিবেশবাদীদের আধিপত্যের দরুন একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হত, সেটা যেন একটা (কিংবা বিভিন্ন) জাতির উপর অন্য একটা জাতির আধিপত্য আর শোষণ। কিন্তু সেটা ছিল বিভ্রান্তি মাত্র -- কেননা প্রকৃতপক্ষে, ঐ ঔপনিবেশিক আধিপত্য খাটাত সমগ্রভাবে বিশেষ-সুবিধাভোগী জাতিটি নয় — ঐ আধিপত্য খাটাত ঐ জাতির ফিনান্সীয়-একচেটিয়া বুর্জোয়ারা। তবে, এই ব্যাপারটাকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে হলে, এবং একটা নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীই যে নিপীড়িত জাতিগুলির প্রধান শত্রু এটা আরও স্পষ্ট করে তাদের দৃষ্টিগোচর করাতে হলে বৈদেশিক রাজনীতিক শাসনের অবসান ঘটানোর দরকার ছিল। এইভাবে এখন পূর্ণাঙ্গ জাতীয় মুক্তির জন্যে সংগ্রামটি ঢের বেশি সুনির্দিষ্টভাবে একটা শ্রেণী-সংগ্রাম হয়ে উঠেছে -- কেননা, কোন একটা উপনিবেশভোগী দেশের বিরুদ্ধে যা তার চেয়ে বেশি পরিমাণে এ সংগ্রাম পরিচালিত হয় আন্তর্জাতিক উৎপীড়ন আর শোষণের সমগ্র ব্যবস্থাটারই বিরুদ্ধে, কিংবা একটু অন্যভাবে বললে — আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজি এবং একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে।

আর্থনীতিক স্বাধীনতার জন্যে এই সংগ্রামের প্রকৃতিটাকে অনেক সময়ে একেবারে বিকৃত করে দেখানো হয়। তাতে বলে দেওয়া হয় এটা যেন নিছক আর্থনীতিক সংগ্রাম — এতে যেন কোন রাজনীতিক কিংবা সামাজিক উপাদান নেই। বাস্তবতার দিকে তাকালে এই বক্তব্যটার ফাঁকি চট করে ধরা পড়ে।

যেমন, সুয়েজ খাল জাতীয়করণের ঘটনাটা তুলে ধরে দেখা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে মুখ্যত এটা হল মিসরের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন একটা আর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানের উপর বৈদেশিক একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে অবলম্বিত ব্যবস্থা। কিন্তু, তার পরিণতি ঘটল কী? খাল নিয়ে সেই সংঘাত থেকে দেখা দিল একটা রাজনীতিক সংকট। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রকাশ্য আক্রমণ চালাল। জ্বলে উঠল একটা বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক সংঘাত, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সমর্থনপুষ্ট জাতীয়-মুক্তির শক্তিগুলি গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ করল। তার মোটফলে মিসরী জনগণের

মোটা রকমের আর্থনীতিক লাভ হল, আর গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক জয় হল পৃথিবীজোড়া জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের।

গত কয়েক বছরে এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় কোন কোন জাতীয়তাবাদী মহলে আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের অতি সহজ-সরল এবং আসলে আদিম ধরনের একটা ব্যবস্থাপত্র চালু হয়েছে। সমস্ত পরদেশের সঙ্গে যাবতীয় আর্থনীতিক সম্পর্ক ভেঙে দেবার কথা তাতে বলা হয়। সুপারিশটাকে আরও আকর্ষণীয় দেখাবার চেষ্টায় এর রচয়িতারা এশিয়া আর আফ্রিকার জাতিগুলির জাতীয় গর্ববোধ এবং বাইরের সাহায্য ছাড়াই যাবতীয় আর্থনীতিক সমস্যা সমাধানের সামর্থ্যের বিষয়টা তুলে ধরে কথা বলে।

আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করার জন্যে প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির জনগণ প্রথমত এবং সর্বোপরি নিজেদের প্রচেষ্টার উপরই নির্ভর করবে এটা নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য, কিন্তু, তার অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য সমস্ত দেশেরই সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দেওয়াটা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হবে। তাদের বোঝা দরকার যে, পৃথিবীতে তাদের শত্রু ছাড়া মিত্রও আছে, তাদের বোঝা দরকার যে, সীমান্ত রুদ্ধ করে দিলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বন্ধ করতে সেটা কাজের হবে, কিন্তু, তারই সঙ্গে সঙ্গে সেটা হবে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার পথে বাধা, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া তাদের যে গুরুত্বসম্পন্ন আর্থনীতিক এবং অন্যান্য সহায়তা দিতে পারে সেগুলি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। এটাও তাদের আগে থেকে বোঝা দরকার যে, তাদের অর্থনীতির একপেশে গড়নের ফলে, তাদের যাকিছু উৎপাদনশক্তি আছে বিচ্ছিন্নতার দরুন তারও শোচনীয় পতন অবধারিত হয়ে যাবে। কেননা, এখন যেসব পণ্য আক্ষরিক অর্থেই তাদের অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন সেগুলির উৎপাদনও তারা কমাতে বাধ্য হবে। তাদের কলা, কফি আর চীনাবাদাম, তৈল, তুলো আর টিন তারা বিক্রি করতে পারবে না। তার উপর, তাদের আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্যে লেগে যেতে পারে দশকের পর দশক, হয়ত কয়েক শতক; শিল্পোন্নত দেশগুলি প্রযুক্তিগত অগ্রগতির যেসব পর্ব অনেক আগেই পার হয়ে এসেছে সেই সমস্ত পর্বের ভিতর দিয়ে তাদের ঐ সময়ে চলতে হবে তাদের সাধ্য অনুসারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে বেরিয়ে গেলে তারা বিদেশ থেকে

আধুনিক যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম এবং তাদের নিজস্ব অর্থনীতি গড়তে সহায়ক অন্যান্য সবকিছু পাবার সম্ভাবনা বর্জন করবে।

বলা বাহুল্য, তার পরিণতি হিসেবে মুক্ত দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতা আরও শক্তিশালী না হয়ে সেটার বিপত্তিই ঘটবে, শেষপর্যন্ত তারা যে অবস্থায় পড়বে তাতে তাদের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির চাপ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আরও কমেই যাবে। এইসব তত্ত্ব বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে এমন সমর্থন পাবে না, তা আশা করা যেতে পারে। তবু, এমন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ থেকে বিপদের আশংকাও রয়েছে — কেননা, এর থেকে বিভিন্ন হঠকারী কর্মনীতি ধরবার ঝোঁক দেখা দেয়, তেমন কর্মনীতি সংশ্লিষ্ট জাতির পক্ষে মহা ক্ষতিকর হতে পারে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে, প্রাক্তন উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলির জনগণ যে যত দ্রুত সম্ভব এবং সবচেয়ে কার্যকর উপায়ে যেকোন রকমের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজি আর একচেটিয়া পুঁজির উপর সমস্ত রকমের নির্ভরশীলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে উদ্‌গ্রীব হবে এটাও সম্পূর্ণতই বোধগম্য।

মূর্ত-নির্দিষ্টভাবে সেটা কিভাবে সাধিত হতে পারে তাই নিয়েই কথা: আর্থনীতিক স্বাধীনতার দিনটিকে নিকটতর করার জন্যে সংশ্লিষ্ট জাতি-গুলির কোন কোন নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করা চাই?

এই প্রসঙ্গে দু'রকমের ব্যবস্থার কথা আমরা আগে বলেছি। আন্তর্জাতিক ফিনান্স পুঁজি এবং একচেটিয়া পুঁজির আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ আর শোষণ সরাসরি গণ্ডিবদ্ধ করার জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। আবার পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতির কাঠামের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির এই নির্ভরশীল অবস্থা সৃষ্টি হয় যেসব মূল কারণে সেগুলি দূর করবার ব্যবস্থাবলিও আছে। আগে উল্লেখিত বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে: (ক) সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন বাছা বাছা পণ্য নিয়ে বহির্বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কায়েম করা, কিংবা, যেসব ক্ষেত্রে আরও বেশি মূলগত ব্যবস্থা দরকার সেখানে সমগ্র বহির্বাণিজ্যেরই উপর রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া; (খ) প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে উৎপন্ন বিভিন্ন পণ্যের দাম একচেটিয়া কারবারগুলোর খেয়ালখুশিমতো কমাবার যথেচ্ছাচার গণ্ডিবদ্ধ ক'রে সম্পাদিত বিভিন্ন বিস্তৃত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন; এবং (গ) সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া কারবারগুলোর

চাপের মুখে মুক্ত দেশগুলির অবস্থান আরও মজবুত করে তোলার জন্যে এই দেশগুলির মধ্যে বিভিন্ন আর্থনীতিক মৈত্রী কিংবা সম্মিলনী স্থাপন করা এবং পারস্পারিক সহযোগিতা সংগঠিত করা। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে বৈদেশিক একচেটিয়া পুঁজির লুণ্ঠনমূলক কার্যকলাপ শায়েস্তা করার জন্যে সুনির্দিষ্টভাবে রচিত বিভিন্ন ব্যবস্থাও এই রকমের ব্যবস্থাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এইসব ব্যবস্থা হল: (ক) মুনাফা পুনঃপ্রেরণের উপর বাধানিষেধ; (খ) বৈদেশিক কোম্পানিগুলির মুনাফার উপর বর্ধিত কর; (গ) কোন শিল্পে কত বৈদেশিক বিনিয়োগ হবে তার উপর নিয়ন্ত্রণ; এবং (ঘ) (মূলগত ব্যবস্থা হিসেবে) জাতীয়করণ।

আর্থনীতিক অনগ্রসরতা ঘুচিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ কিনা, মুক্ত দেশগুলির নির্ভরশীল অবস্থার জন্যে দায়ী মূল কারণগুলি দূর করা আরও বেশি কঠিন সমস্যা। মূলত এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া — এতে খুবই কার্যকর বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ব্যবস্থার চেয়ে দৈনন্দিন সৃজনশীল প্রচেষ্টাই বেশি গুরুত্বসম্পন্ন। তবে, অর্থনীতিক্ষেত্রে কোন্ কর্মনীতি সেটাকে পরিচালিত করে তদনুসারে প্রক্রিয়াটা ত্বরান্বিত কিংবা মন্দিভূত হতে পারে। বহু মুক্ত দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, আর্থনীতিক উন্নয়নের হার বাড়াতে হলে উৎপাদন-সংস্থানের একটা ক্রমবর্ধমান অংশ রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করা, অর্থাৎ কিনা, জাতীয় অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটাকে অবিরাম সম্প্রসারিত করে চলা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। ঐ দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তিগত পুঁজির উপর বাধানিষেধ খাটানো না হলে কোন আর্থনীতিক প্রগতি হতে পারে না। মুক্ত দেশগুলির পক্ষে আর্থনীতিক পরিকল্পনা এবং সংগঠনের বিপুল গুরুত্ব সম্বন্ধে স্বতঃপ্রতীয়-মান সিদ্ধান্তও এসে যায়। তৃতীয় দুনিয়ায় বিভিন্ন জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে সাধারণভাবে অগ্রগতি আসতে হলে বিভিন্ন কৃষিসংস্কার হওয়া চাই চলতি রেওয়াজের মতো — কেননা, গ্রামাঞ্চলে মধ্যযুগীয় অবশেষগুলো যতকাল প্রবল থাকবে ততকাল কৃষি উৎপাদন থমকে থাকবে, জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ কৃষকেরা গরিব থেকে যাবে, কাজেই, জাতীয় শিল্পগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর দেশীয় বাজার গণ্ডিবদ্ধ থেকে যাবে। শহরে এবং গ্রামে ক্ষুদ্র-পণ্য উৎপাদনের আর্থনীতিক ফলপ্রদতা বাড়াবার জন্যে উৎপাদন, বিপণন, ক্রেডিট, ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের সমবায় গড়ে তোলার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

এইভাবে সিদ্ধান্ত আসছে যে, এখনকার জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের আসল কাজ আর লক্ষ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এই আন্দোলনের বর্তমান পর্বে আর্থনীতিক স্বাধীনতাকে আমরা সর্বাগ্রগণ্য কাজ বলে মনে করি, আর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই যে, যে প্রক্রিয়ায় আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয় তারই একটা গূঢ় সামাজিক আর রাজনীতিক তাৎপর্য আছে, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে রাজনীতিক সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সামাজিক সংস্কার অবশ্যম্ভাবী কেন

আর্থনীতিক অনগ্রসরতা অতিক্রম করতে এবং আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হবেই তার একটা রূপরেখা এর আগের পরিচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে। রাজনীতিক সার্বভৌমত্ব অর্জিত হবার পর থেকে উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে অনেককিছুই করা হয়েছে — সেটা প্রধানত তাদের আর্থনীতিক সমস্যাগুলোর সমাধান ত্বরান্বিত করার জন্যে। তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা বৃথাই গেছে এমন কথাও ন্যায্য হবে না। তবু, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এখনও খুবই গুরুতর বিভিন্ন আর্থনীতিক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়ে রয়েছে। খাদ্য পরিস্থিতি এবং কোটি কোটি মানুষের সামনে দুর্ভিক্ষের সদা-বিদ্যমান বিপদই বোধ হয় এর বহু দেশের পক্ষে সবচেয়ে বড় আর্থনীতিক বিপত্তি।

তৃতীয় দুনিয়ার পক্ষে বিশিষ্ট বিভিন্ন অবস্থার ফলে এই খাদ্য সংস্থানের সমস্যাটার বহু দিক রয়েছে — যেমন, দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি, স্বদেশে খাদ্যসামগ্রীর অপ্রতুল উৎপাদন, আমদানি করা খাদ্যের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা, এবং শেষে, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান সামাজিক-আর্থনীতিক সম্পর্ক দিয়ে নির্ধারিত ভূমিস্বত্বের বিভিন্ন সেকেলে, এমনকি বহু ক্ষেত্রে আদিম ব্যবস্থা।

এইসব মূর্ত-নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে সাফল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হবে — কাজেই, এই সমস্যাগুলির বিভিন্ন দিক নিয়েই আমরা আলোচনা আরম্ভ করছি।

১। তৃতীয় দুনিয়া স্বয়ম্ভর হতে পারে কি?

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শস্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ বাড়ছে, তা সত্ত্বেও এবং শস্য ফসলের ফলনও কিছুটা বাড়া সত্ত্বেও ১৯৬০ সালের আরম্ভ নাগাত এই দেশগুলিতে জনসংখ্যার মাথাপিছু শস্য উৎপাদন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার চেয়ে কম, সেটা নিচের সারণীতে দেখা যাচ্ছে।

৯ নং সারণী

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে খাদ্য পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচক সংখ্যা

(১৯৩৪ — ১৯৩৮ = ১০০)

নির্দেশক	১৯৪৮-৫২	১৯৬০
শস্য খেতের পরিমাণ	১১৮	১৩২
শস্য ফলন	৯০	১০৮
শস্য উৎপাদন	১০৬	১৪২
জনসংখ্যার আয়তন	১২৩	১৪৬
মাথাপিছু শস্য উৎপাদন	৮৬	৯৭

এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলি যুদ্ধের আগে শস্য রপ্তানি করত। অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে তাদের রপ্তানি করা গম, চাল, ভুট্টা, ইত্যাদির মোট পরিমাণ ছিল বছরে গড়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ টন। ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের মধ্যে পরিস্থিতির মূলগত পরিবর্তন ঘটে গেল। এই কালপর্যায়ে ঐ দেশগুলি বছরে গড়ে ৪০ লক্ষ টন শস্য আমদানি করেছিল। সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাদের শস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল আড়াই কোটি টনের বেশি। বিশেষজ্ঞেরা হিসাব কষে দেখেছেন, ১৯৮০ সাল নাগাত কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুনই এই দেশগুলিতে প্রয়োজনীয় শস্যের পরিমাণ দাঁড়াবে এখনকার চেয়ে ৩০ কোটি টন বেশি। এই অঙ্কটা মনে রেখে স্মরণ করা যাক, ১৯৩৫—১৯৬০ এই ২৫ বছরে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় শস্য উৎপাদন বেড়েছিল মাত্র ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ টন। মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে ১৯৮০

সাল অবধি এত কম সময়ের মধ্যে তারা শস্য উৎপাদন ৩০ কোটি টন বাড়াতে পারবে কি?

কয়েকটা 'কিন্তু' না রেখে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নে। বিশুদ্ধ তত্ত্বগতভাবে বলা যেতে পারে, বিশ শতকে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিকা-শক্তির যে মাত্রা অর্জিত হয়েছে তদনুযায়ী সম্ভাবনার বিচারে অমন বৃদ্ধি নিশ্চয়ই ঘটতে পারে। যেমন, উত্তর আমেরিকায় শস্য উৎপন্ন হয় মাথাপিছু ১,১১০ কিলোগ্রাম, যদিও এশিয়ায় ঐ পরিমাণটা ২২৫ কিলোগ্রাম। উত্তর আমেরিকায় ফলন বেড়েছে গত ২৫ বছরে ১০৯ শতাংশ, আর আলোচ্য দেশগুলিতে ঐ বৃদ্ধি হয়েছে গড়ে মাত্র ৮ শতাংশ।

উন্নয়নশীল দেশগুলি কৃষিক্ষেত্রে ঐসব অঙ্কের ব্যাপারে উত্তর আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলে খাদ্য ঘাটতির সমস্যা তো মিটে যেতই, শুধু তাই নয় — শস্যের সর্বাত্মক অতি-উৎপাদনের উল্টো সমস্যারই সম্মুখীন হতে হত। সেক্ষেত্রে, কোন রকমের জনসংখ্যাগত 'বিস্ফোরণ' কিংবা এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধিতে ভয় করবার কিছুই থাকত না।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের গোড়ার প্রশ্নটাকে কিছুটা অন্যভাবে তুলতে হচ্ছে: উঁচু মাত্রায় উন্নীত রাষ্ট্রগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিকাশক্তি এখন যে মাত্রায় উঠেছে, উন্নয়নশীল দেশগুলি কি আগামী ১০ কিংবা ১৫ বছরে সেই মাত্রা ধরতে পারবে? এমন স্পষ্ট করে তোলা প্রশ্নটিতে তো 'না' উত্তরই দিতে হয়।

তবে, আসলে, প্রশ্নটাকে অমন চরম রূপে তোলার দরকার নেই। কার্যত, আলোচ্য দেশগুলিতে শস্য উৎপাদন ৬০-৬৫ শতাংশ বাড়ানো নিয়েই সমস্যাটা। কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, কাজটা মোটেই অসাধ্য নয়। ষষ্ঠ দশকের শেষের দিকে এবং সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে, জাতীয় আর্থনীতিক পরিকল্পনা চালু হবার সময়ে শস্য উৎপাদনে গড় বার্ষিক বৃদ্ধি ঘটেছিল — ভারতে ২·৪ শতাংশ, মরোক্কোয় ১·৭ শতাংশ, পাকিস্তানে ৬ শতাংশ, ফিলিপাইনে ১·৯ শতাংশ, মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে ৪ শতাংশ এবং সুদানে ৭·৪ শতাংশ। (১৯৬৫ সাল থেকে ধরে) ১৯৮০ সাল নাগাত শস্য উৎপাদনে ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটাবার জন্যে পরপর বার্ষিক গড়ে ৪ শতাংশ বৃদ্ধিই তো যথেষ্ট।

কোন কোন উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এই সাধন পর্যাপ্তই, অন্যান্য দেশে

খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন সেক্ষেত্রে দ্রুততর করার দরকার পড়ে। সমস্যাটাকে অবশ্য সরল করে হাজির করা হয়েছে -- কেননা, ৬০ শতাংশের কথা বলা হলে, অংকটাকে সমগ্র তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য বলে ধরতে হয়: কোন কোন দেশে উৎপাদনবৃদ্ধির উচ্চতর হার দরকার, আবার, কোন কোন দেশে বৃদ্ধির অপেক্ষাকৃত ধীরগতি পর্যাপ্ত হতে পারে, সেটা প্রত্যেকটা পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করবে -- যেমন, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার, বৈদেশিক মুদ্রা পাবার সম্ভাবনা (সেটা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রপ্তানির পর্যাপ্ততা দিয়ে নির্ধারিত হয়), শিল্পোন্নয়নক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন, ইত্যাদি।

বিভিন্ন জাতীয় আর্থনীতিক পরিকল্পনা এবং কর্মসূচির কাঠামের মধ্যে কৃষিকাজের বিভিন্ন লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার সময়ে উপরে উল্লেখিত সমস্ত উপাদানই বিবেচনায় রাখার চেষ্টা করা হয়। বাস্তবে কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শস্য উৎপাদন নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে স্পষ্টতই কম হচ্ছে, সেটা নিচের অংকগুলি থেকে দেখা যায় (বন্ধনীর ভিতরে উল্লেখিত সালগুলি হল পরিকল্পনার কালপর্যায়)। বার্ষিক বৃদ্ধি লক্ষ্য থেকে কম হয় -- মরোক্কোয় ০·৮ শতাংশ (১৯৬০ — ১৯৬৪), ভারতে ৩·১ শতাংশ (১৯৬১/৬২—১৯৬৫/৬৬), সুদানে ১·১ শতাংশ (১৯৬১/৬২—১৯৬৫/৬৬), মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে ২ শতাংশ (১৯৬১/৬২—১৯৬৪/৬৫), ভেনেজুয়েলায় ৬·১ শতাংশ (১৯৬৩—১৯৬৬), ইত্যাদি।

তৃতীয় দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশেই পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট কৃষিকাজের লক্ষ্যগুলি সাধনে এই গুরুতর অপারগ অবস্থা বোধহয় সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয়। এর কারণগুলি বের করতে এগিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নিতে হবে যে, কারণগুলি হবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় স্বতঃপ্রতীয়মান ভুল হিসাবই ঐ ব্যর্থতার কারণ, আবার, কোন কোন দেশে কারণটা হল বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অন্য কোন কোন দেশে সম্ভবত সংশ্লিষ্ট দেশের রপ্তানি পণ্যের দাম পড়ে যাবার ফলে অর্থাভাবের দরুন সেটা ঘটেছে। অন্য দিকে, এইসব কারণ বিভিন্ন হলেও সেগুলি যে তৃতীয় দুনিয়ার সমস্ত দেশেরই ক্ষেত্রে একই অভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক অনগ্রসরতারই অভিব্যক্তি সেটা স্পষ্ট। কেননা, খুলে বললে, আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনা, বসন্তকালে নদীতে জলবৃদ্ধি, যার থেকে হতে পারে বন্যা, এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারে কৃষির এই যে ভেদ্যতা, এটা

হল কৃষি-প্রযুক্তিবিদ্যার নিচু মাত্রা আর অনুপযুক্ত সেচব্যবস্থারই লক্ষণ কিংবা, এক কথায়, কৃষির সামগ্রিক অনগ্রসরতারই সাক্ষ্য। আর, পরিকল্পনা পূরণ করতে না-পারার কারণ যদি হয় রপ্তানি থেকে আয়ের অপ্রত্যাশিত কমতি তাহলে বোঝা যায় দেশটির অর্থনীতিতে বহির্বাণিজ্যের গুরুত্ব অযৌক্তিকভাবে অতিরিক্ত, সেটা থেকেও অকাট্য লক্ষণ দেখা যায় যে, দেশটির কৃষি পিছনে-পড়া, আর তার অর্থনীতির গড়ন একপেশে এবং ঠিক ঔপনিবেশিক ধরনের। পরিকল্পনায় গুরুতর ভুল হিসাবও ঘটে ঐ একই কারণে: তার থেকে বোঝা যায়, জাতীয় অর্থনীতির তদারক করার এবং, বিশেষত, উন্নয়নের কর্মসূচি রচনা করার জন্যে দক্ষ লোকজনের ঘাটতি আছে।

তৃতীয় দুনিয়ায় কৃষিক্ষেত্রে শোচনীয় অবস্থার মূল কারণসংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে একটা অনিবার্য সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা দরকার: এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যেকোন গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির জন্যে, যেকোন সুস্থিত প্রগতির জন্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে এখন বিদ্যমান কৃষিসংক্রান্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দরকার। তৃতীয় দুনিয়ায় কৃষি উন্নয়ন কী মাত্রায় বিভিন্ন **প্রযুক্তিগত** কারণে কিংবা বিভিন্ন **সামাজিক-আর্থনীতিক** বাধাবিঘ্নের দরুন ব্যাহত হয় সেটা বলার কোন উপায় জানা নেই। তবে, যেটা হল কার্যত মধ্যযুগীয় সামাজিক পরিবেশ, যেখানে উৎপাদনকারীরা — কৃষক এবং খেতমজুরের — বাস্তবিকই নিজেদের শ্রমের ফল ব্যবহার করতে পায় না, সেখানে আরও বেশি সারের যোগান, কিংবা আরও উন্নত ধরনের খামারের কাজের মতো কোন প্রযুক্তিগত উন্নতিবিধান করে বিশেষ কোন সুফল হবে না এটা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন কৃষি সংস্কার এবং ঔপনিবেশিক আমলে উদ্ভূত কৃষি সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থাটার মূলগত পরিবর্তনের প্রয়োজন এমনই তীব্র আর স্বতঃপ্রতীয়মান যে, গত বিশ বছর ধরে প্রায় সমগ্র তৃতীয় দুনিয়া জুড়ে সেদিকে একটা ক্রমবিকাশ চলে আসছে।

বেছে নেওয়া কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের কোন কোন কৃষি সংস্কার এবং সেগুলির ফলাফলের একটা রূপরেখা এখানে হাজির করার চেষ্টা করা যাচ্ছে, এটা সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য।

ভারতে বিভিন্ন কৃষি সংস্কার আরম্ভ হয়েছিল দেশটি স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই। এইসব সংস্কারের ফলে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের

মধ্যে সবচেয়ে বিত্ত-সম্পদশালী এবং সবচেয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী অংশটার আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক অবস্থান বেশ নাড়া খেয়েছিল; জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার একটা সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল; ভূমির খাজনা কমানো হয়েছিল, প্রজা কৃষকদের সম্পত্তির অধিকারের আরও বেশি নিরাপত্তাবিধান করা হয়েছিল, তার মধ্যে পুনরুদ্ধার এবং মালিকানার অধিকার। এইসব পরিবর্তনের ফলে ভূস্বামীদের মালিকানাধীন ভূমির মোট আয়তন কমে গেল, কৃষকের মালিকানাধীন ভূমির আয়তনও তেমনি বেড়ে গেল।

ভারতীয় ভূমি সংস্কারের পিছনে ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। গ্রাম ভারত সম্বন্ধে বিশিষ্ট অধ্যয়নকারী এইচ. ডি. মালব্য ভারত সরকারের ভূমি সংস্কারের প্রাক্কালে গ্রামাঞ্চলের রাজনীতিক পরিস্থিতির এই বর্ণনা দিয়েছিলেন: 'বাস্তবিকই, সবকিছু চলছিল একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবার দিকে। কিছুকাল ধরে মনে হয়েছিল, গ্রামাঞ্চলে রক্তাক্ত এবং হিংস্র সংঘাত কিছুতেই বন্ধ হবার নয়। ১৯৪৭ সালে ১৫ই অগস্ট ভারতের স্বাধীনতার আগেকার মাসগুলিতে এবং স্বাধীনতার পরবর্তী কালপর্যায়ে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে অবিরাম ভূমিসংক্রান্ত সংঘাত চলেছিল।'*

প্রকৃতপক্ষে, ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে কৃষি সংস্কার বরাবরই সংগ্রামের রশ্মিকেন্দ্র হয়েছে। সে সংগ্রাম এখনও চলছে।

প্রথমেই এবং খুবই কার্যকরভাবে বিলুপ্ত করা হল ভূমিস্বত্বের জমিদারী প্রথা, এই প্রথার বনিয়াদ ছিল ভূস্বামীদের বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক অধিকার আর বিশেষ বিশেষ সুযোগসুবিধা; প্রধানত সেই আঠারো শতকে এই ভূস্বামীরা বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের হাত থেকে ভূমি পেয়েছিল। জমিদারদের বিভিন্ন খাস ভূমিখণ্ড বজায় রাখতে দেওয়া হয়েছে, কেড়ে নেওয়া ভূমি বাবত তাদের খেসারত দেওয়া হয়েছে, এই খেসারত বহু ক্ষেত্রেই ঐসব ভূমির বিক্রয়-মূল্যের চেয়ে ঢের বেশি।

জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করা সমেত এই সমগ্র কার্যকরণের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে প্রগতিশীল বিভিন্ন উপাদান ছিল। দুঃখের কথা, ভারতীয়

---

* H. D. Malaviya, *Village Panchayats in India*, New Delhi, 1956, p. 207.

কৃষককুলের উপর ক্লেশ চাপিয়ে দেয় এমন একটা ব্যবস্থার সঙ্গে সেটা সংশ্লিষ্ট ছিল। নতুন, অসামন্ততান্ত্রিক বনিয়াদে লাভজনক অর্থনীতি স্থাপন করার জন্যে প্রাক্তন ভূস্বামীরা যে ভূমি নিজেদের হাতে রাখতে পেয়েছিল সেখান থেকে প্রজাদের তারা 'পরিষ্কার করে' ফেলতে লেগেছিল। তদনুসারে, বিনীত সরকার ঐসব প্রজাকে উচ্ছেদ করতে দিয়েছিল। ফলে, পরিবর্তিত পরিস্থিতি সত্ত্বেও, ভূস্বামী এবং কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ আগেরই মতো তীব্র থেকে গেল।

ভূমির জন্যে লড়াই চালিয়ে কৃষকেরা শেষপর্যন্ত মালিক-প্রজার মধ্যে সম্পর্কের নিয়ামক আইন পাস করতে সরকারকে বাধ্য করল এবং শস্য ফলনের ১/৪ থেকে ১/৫ অংশের মধ্যে ভূমির খাজনা নামাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করল। কিন্তু, ১৯৬১ সাল নাগাত, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা চালু হবার সময়ে, ঐ খাজনা-হ্রাস করা হল মাত্র কয়েকটা রাজ্যে — দেশের মোটামুটি অর্ধেক এলাকায়। প্রজাদের সম্পত্তির অধিকার এবং ভূমি পুনরুদ্ধারের অধিকারের বেলায় অবস্থা দাঁড়াল আরও খারাপ। খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেল, যেসব জায়গায় প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা বলবৎ করা হল না। খাজনার পরিমাণ অপরিবর্তিত থেকে গেছে -- কোথাও কোথাও বেড়েছে। কয়েকটা রাজ্যে ভূমি পুনরুদ্ধারের বাবত প্রজার দেয় অর্থের পরিমাণ ভূমির বিক্রয়-মূল্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, এই পুনরুদ্ধারের অধিকারটাকে ধনী প্রজারা ছাড়া বড় একটা কেউ খাটাতে পারে না। কৃষকেরা সাধারণত নিজেদের জমিজেরাতের মালিকানা হাতে নিতে অপারগ, শুধু তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে, তাদের সর্বনাশ হয়ে যায়, সংস্কার চালু হবার আগে যে জমিতে তারা চাষবাস করত সেটাও হাতছাড়া হয়ে যায়। ভারতীয় অর্থনীতিবিদের হিসাব কষে দেখিয়েছেন, গোটা উনিশ শতকে যা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি কৃষক প্রজা দখলচ্যুত হয়েছিল সংস্কার চালু হবার সময়ে।

জমিজেরাতের আয়তন সীমাবদ্ধ করার ব্যাপারটায় আরও বেশি মুশকিল দেখা দিল। ১৯৫৯ সাল নাগাত, মোট ষোলটার মধ্যে মাত্র চারটে রাজ্যে সংশ্লিষ্ট আইন বলবৎ হয়েছিল। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে ঐসব আইনের বলে ভূস্বামীদের হাত থেকে ভূমি নেওয়া হয়েছিল মোটামুটি ১৭,০০,০০০ একর — তার মধ্যে থেকে নতুন করে বিলি করা হয়েছিল মাত্র ১২,০০,০০০ একর। কিন্তু, একমাত্র বোম্বাইয়েই দু'বছরের মধ্যে কৃষক

প্রজাদের প্রায় ৩০,০০,০০০ একর জমি চলে গিয়েছিল ভূস্বামীদের হাতে।

ভূস্বামীদের মালিকানা গণ্ডিবদ্ধ করার জন্যে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কিছু লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটেছিল মাত্র ১৯৫৯ সালে জানুয়ারি মাসের পরে — তখন ব্যাপক কৃষক বিক্ষোভের চাপে পড়ে সক্রিয় হয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার ৬৪তম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে ঐ বছরের মধ্যেই প্রয়োজনীয় আইন বলবৎ করার জন্যে সমস্ত রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিল। এই রকমের আইন পরে বলবৎ হয়েছিল, এখন সমস্ত রাজ্যেই নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ পরিমাণের জমিজেরাৎ স্থাপিত হয়েছে — সেগুলির আয়তন কয়েক দশক থেকে কয়েক শ' একর অবধি। তবে, তাই বলে কিন্তু গত কয়েক বছরে ভূমিহীন এবং সামান্য ভূমির মালিক কৃষকদের মধ্যে মোটা রকম পরিমাণ ভূমি বিলি হয় নি। জমিদারী প্রথা বিলোপর ফলে কৃষকেরা যে জমিতে চাষ করে সে সম্বন্ধে তাদের অবস্থানটাই শুধু বদলেছে: ভূস্বামীর কাছ থেকে ভূমি খাজনা দিয়ে নেবার জায়গায় তারা হয়েছে হয় রাষ্ট্রের প্রজা, নইলে নিজেদের অধিকার অনুসারে মালিক।

বর্তমান সময় অবধি ভারতে ভূমি সংস্কারের ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরবার চেষ্টা করলে সিদ্ধান্ত হয় নিম্নরূপ। প্রথমত, এই সংস্কারের ফলে ভূমিতে বিস্তৃত সামন্ততান্ত্রিক মালিকানার অবসান ঘটে নি — কেননা, বহু ভূস্বামীই যথাসময়েই তাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ভূমি বিলি করে দিতে পেরেছে, ঐসব আত্মীয়স্বজনের প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ভূমির মালিক হয়েছে, এইভাবে গোটা পরিবারের মালিকানায় সেই আগেকার জমিদারিই থেকে গেছে। দ্বিতীয়ত, এই সংস্কার কৃষকদের মধ্যে স্তরবিভাগের অনুকূল হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থ হাতে থাকায় কম-বেশি বিত্তবান কৃষকেরা নিজেদের জমিজেরাতের পরিমাণ বাড়াতে পেরেছে। অভাবী কৃষকদের লাভ হয় নি কিছুই। সপ্তম দশকের গোড়ায় সমস্ত ভূমির মোটামুটি ৩০ শতাংশের মালিক ছিল সমস্ত খামারী পরিবারের প্রায় ২·৫ শতাংশ, আর কৃষক পরিবারগুলির প্রায় ৮০ শতাংশের মালিকানায় ছিল ৩০ শতাংশের কিছুটা কম — সেগুলি ছিল ছোট এবং অতি ক্ষুদ্র জমিজেরাৎ।

বিভিন্ন সুস্পষ্ট সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ টিকে রয়েছে, আর গ্রামাঞ্চলে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে — এই হল ভারতীয় ভূমি ব্যবস্থার সবচেয়ে বিশিষ্ট দুটো উপাদান। এছাড়া আর একটা উপাদান

হল চা, কফি এবং রবার গাছের বড় বড় বাগিচার অস্তিত্ব, এর বহু বাগিচাই বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক কারবারের ধাঁচে সংগঠিত, এগুলিতে উৎপাদন হয় রপ্তানির জন্যে, জন-খাটা শ্রমিকের উপর কঠোর শোষণের জোরে এগুলি চলে। ভারতীয় কৃষির এই ক্ষেত্রটিতে বৈদেশিক পুঁজি মজবুত হয়ে গেড়ে আছে। অন্যদিকে, যেসব এলাকায় গোষ্ঠীগত সামাজিক সম্পর্ক টিকে রয়েছে সেখানে ভূমিস্বত্বের বনিয়াদ হল ভূমিতে চাষবাসের বারোয়ারী ব্যবস্থা। এটা হল নিছক জীবনধারণের জন্যে খেত-খামার, এতে যাকিছু উৎপন্ন হয় সবটাই খামারীদের ভোগ ব্যবহারে যায়, বাইরের সঙ্গে কোন বিনিময় বাণিজ্য নেই। কৃষকদের ছোট ছোট জমিজেরাতের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও (মোটামুটি ৮০ শতাংশ) চলে মূলত ঐ নিছক জীবনধারণের বনিয়াদে, ফসল যা ওঠে তাতে কৃষকদের খাদ্যের যোগান হওয়াও শক্ত, বিক্রির জন্যে অবশিষ্ট থাকে না কিছুই।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, ভারতের গ্রামাঞ্চলে সামাজিক এবং আর্থনীতিক ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তার ফলে তৃতীয় দুনিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ দেশটিতে কৃষি উন্নয়নের পথ থেকে অনেক বাধাবিঘ্নই অপসারিত হয় নি। কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিপন্থী হয়ে ভূমি সমস্যা বহুলাংশে অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এইসব বাধাবিঘ্ন এমনই গুরুতর যে, গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যাকে সাহায্য দেবার জন্যে সরকার যেসব সাংগঠনিক এবং প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নিয়েছে সেগুলির সম্ভাবনা আর পরিসর লক্ষণীয় হলেও তাতে ফল হয়েছে সামান্যই।

আজ ভারতীয় গ্রামাঞ্চলের যা অবস্থা — সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন অবশেষের গ্রাস বজায় রয়েছে, গ্রামে জনসংখ্যার বেশির ভাগই ভূমিহীন কিংবা সামান্য পরিমাণ জমির মালিক -- এই অবস্থায় কৃষি উন্নয়নের জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হলে সেটা টাকা উড়িয়ে দেবারই সামিল।

১৯৬৬ সালে ভারতে গণ পরিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল; দেশটি জাতীয় পরিসরে মহা বিপর্যয়ের আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েছিল -- এই সময়ে অবস্থাটা চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল। ন্যায়সংগতভাবে এ কথা বলা দরকার যে, সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময়ে খাদ্য পরিস্থিতিতে ঐ নিদারুণ অবনতির আশু কারণ ছিল ১৯৬৫ সালের অতি প্রতিকূল আবহাওয়ার অবস্থা। তবে, অন্যত্র আমরা যা বলেছি সেটা এক্ষেত্রেও সত্য: কৃষি অনগ্রসর হলে একমাত্র তবেই এই রকমের বিভিন্ন কারণে এত ক্ষতি হতে পারে।

ভারতে এক্ষেত্রে নাগাল ধরবার জন্যে যত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগ্নলিতে ফল যে হয়েছে সামান্যই তার কারণ হল এই যে, ঐসব ব্যবস্থা কখনও সাংগঠনিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নতিবিধানের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে এগোয় নি, এবং ভারতীয় গ্রামাঞ্চলের মৌলিক আর্থনীতিক আর সামাজিক সমস্যা ভূমি সমস্যা সমাধানে ঐসব ব্যবস্থা যত সহায়ক হওয়া উচিত ছিল তা আদৌ হয় নি।

এবার অন্য একটি মহাদেশের দিকে নজর দিয়ে লাতিন আমেরিকায় ভূমি সংস্কারের বিষয়টাকে কিভাবে দেখা হচ্ছে তার সমীক্ষা করে দেখা যাক। স্মরণে থাকতে পারে, এখানে ভূমি সমস্যা অনন্যসাধারণ — এখানে ভূমির মালিকানার প্রধান ব্যবস্থাটা হল যাকে স্পেনীয় ভাষায় বলা হয় **লাতিফুন্দিসমো:** লাতিফুন্দিয়া বা বৃহৎ বৃহৎ জমিদারির মালিকানা, এর কোন কোন জমিদারির আয়তন ইউরোপের কোন কোন গোটা দেশের চেয়ে বড়। লাতিন আমেরিকায় সমস্ত রেজিস্ট্রি করা ভূমির অর্ধেকই ৬,০০০ হেক্টরের বেশি আয়তনের বিভিন্ন লাতিফুন্দিয়া। হিসাবে দেখা যায়, ভূস্বামীদের মোটামুটি ৩—৮ শতাংশই সমস্ত আবাদযোগ্য ভূমির ৬০ ৮০ শতাংশের মালিক। যেসব কৃষকের জমি আছে তাদের প্রধান অংশটার হাতে যেসব ছোট্ট ছোট্ট জমিখন্ড আছে, একটি লাতিন আমেরিকান পত্রিকার ভাষায় 'সেগুলি মালিকদের জীবিকানির্বাহের উপায়ের চেয়ে কবরের জমিনের পক্ষে বেশি উপযোগী'।*

জমিদারিগুলোর মালিকেরা ভূমি খাজনাবিলি করে দিনমজুরদের কাছে — তার বদলে এই দিনমজুরদের যথার্থই সামন্ততান্ত্রিক প্রণালীতে কাজ করতে হয়। লাতিন আমেরিকার কোন কোন দেশে চালু আছে যাকে বলা হয় 'মাতা পোর মাতা' প্রথা, এর অর্থ হল, প্রজা যে ভূমি খাজনাবিলি নেয় তার সমান আয়তনের ভূস্বামীর খেত তাকে চাষ করে দিতে হয় বেগার খেটে। দিনমজুর সব সময়েই মালিকের কাছে দেনদার থাকে, ফলে তার উপর চেপে থাকে একরকমের হীন নির্ভরশীলতা: দেনা শোধ না করে সে তার খেত ছেড়ে যেতে পারবে না, আর ঐ দেনা শোধ করার আশাও সে করতে পারে না কখনও।

---

* *Panorama Economico Latinoamericano*, Havana, 1962. Vol. 4, No. 51, p. 4.

বলিভিয়ার একটা সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটা প্রকাশিত হয়েছিল: 'বিক্রি হবে: পাহাড়ীয়া এলাকায় খামার। পাঁচ-শ'টা ভেড়া। জল প্রচুর। **বিশ জন দিনমজুর**।' সম্ভাব্য ক্রেতাকে ভেড়াগুলোর সঙ্গে দিতে চাওয়া হল বিশ জন দিনমজুর! আর সেটা হল বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ও ছাড়িয়ে বেশকিছুটা! ঐ মহাদেশের ভূমিতে মালিকানার ব্যবস্থায় পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে যে মধ্যযুগীয় মূলনীতি সেটাই অতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ঐ বিজ্ঞাপনটায়।

বহু লাতিফুন্দিয়া — বিশেষত শিল্পে-প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদন এবং পশুপালন এলাকাগুলির বহু লাতিফুন্দিয়া — চালানো হয় বড় বড় পুঁজিতান্ত্রিক কারবারের কায়দায়। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কারবারগুলোর মালিকানাধীন জমিদারিগুলোর ক্ষেত্রে কথাটা আরও বিশেষভাবে প্রয়োজ্য। এই রকমের একটা একচেটিয়া কারবার 'ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি' মধ্য আমেরিকায় সর্বপ্রধান ভূমি-মালিক; মধ্য আমেরিকায় আখ, কোকো আর কলার যত উৎপাদন আর বিপণন হয় তার কার্যত সবটাই ঐ একচেটিয়া কারবারটার হাতে। মধ্য আমেরিকায় 'ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি'র মোট ভূমির পরিমাণ মোটামুটি দশ লক্ষ হেক্টর।

কৃষকদের এবং ক্রমবর্ধমান জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের চাপে লাতিন আমেরিকার কোন কোন দেশে ভূমি সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্কার চালু করা হয়েছে। এই রকমের একটি দেশ হল ভেনেজুয়েলা।

ভেনেজুয়েলায়, ভূমির মালিকানার ক্ষেত্রে প্রকটিত চূড়ান্ত বৈপরীত্যকে কেন্দ্র করে রয়েছে ভূমি সমস্যাটা: একদিকে রয়েছে বিভিন্ন বিপুল আয়তনের

১০ নং সারণী

ভেনেজুয়েলায় ভূমির মালিকানা, ১৯৫৬

	মোট জমিজিরেৎ	আকার অনুযায়ী বণ্টন	
		৫ হেক্টর কিংবা তার কম	৫০০ হেক্টর কিংবা তার বেশি
সংখ্যা	৩৯৭,৮০০	৬৬·৯	২·৫
আয়তন (হেক্টর)	২৯,৫৯০,০০০	২·৩	৮২

জমিদারির ছোট একদল মালিক, আর সামান্য ভূমির মালিক কিংবা একেবারেই ভূমিহীন বিপুলসংখ্যক কৃষক রয়েছে অন্যদিকে। বিভিন্ন সরকারী পরিসংখ্যান তথ্যের বনিয়াদে নিচের সারণীটি তৈরি করা হয়েছে।

১৯৫৮ সালে ভেনেজুয়েলায় পেরেজ জিমেনেজের প্রতিক্রিয়াপন্থী একনায়কত্ব উচ্ছেদ হলে পরিস্থিতিটা স্পষ্টতই বড় বড় জমিদারির মালিকদের পক্ষে খারাপের দিকে মোড় ঘুরেছিল, আর ভূমি সংস্কারের জন্যে লড়াইয়ে জনগণের সামনে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। রোমুলো বেতানকুরের নতুন সরকার কৃষকদের কিছু কিছু সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছিল। কুদেতার অল্প কিছুকাল পরেই কৃষক আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। রিগুয়াল-এ খোলা হয়েছিল একটা 'পহেলা ফ্রন্ট', তখন কৃষকেরা প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মালিকানাধীন জমিদারি দখল করে কোন খেসারত না দিয়েই সেখানে চাষ আরম্ভ করেছিল। এই আন্দোলনের গতিবেগ বেড়ে চলল, কয়েক দিন পরে জিমেনেজের অন্যান্য সমর্থকদের জমিদারিগুলো ভাগ করে নেওয়া হল। ১৯৬০ সালে ৫ই মার্চ তারিখে ভূমি সংস্কারসংক্রান্ত আইন বলবৎ হলে এই রকমের ভূমিদখলের সংখ্যা বেড়ে চলল; যেসব এলাকায় কৃষক আন্দোলন আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছিল সেখানে সরকারের পাঠানো ফৌজের মুখেও ঐ সংখ্যা বেড়ে চলল।

ভেনেজুয়েলার ভূমি সংস্কারে ভূমির 'সামাজিক ক্রিয়া' সংক্রান্ত ধারণাটাকে রূপায়িত করা হয়েছিল। স্থানীয় বুর্জোয়াদের প্রস্তাবিত এই সংস্কার অনুসারে ভূমিতে উৎপাদন হওয়া চাই জাতীয় অর্থনীতির কাঠামের মধ্যে। ভূস্বামীদের জন্যে শত শত, এমনকি হাজার হাজার খেতমজুরের চাষ করা বিশাল বিশাল জমিদারি এবং মেহনতী কৃষকের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের মধ্যে কোন পার্থক্য তাতে করা চলবে না: আসল কথা হল --- ভূমিতে চাষ হওয়া চাই, ভূমি যেন অমনি পড়ে না থাকে। শুধু তাই নয়: দৃষ্টান্তস্বরূপ খাজনাবিলি করার মতো বিভিন্ন ভূমিস্বত্বের স্থান ঐ ধারণায় ছিল না। সংক্ষেপে, ভেনেজুয়েলার এই ভূমি সংস্কারে ভূমিকে **উৎপাদনের উদ্দেশ্যে** ব্যবহার করার প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হল, এবং ভূমির **সামাজিক ক্রিয়ারই** সম্বন্ধে গরজ প্রকাশ করা হল, অথচ ভূমি সম্পর্কের **সামাজিক দিকটাকে** সম্পূর্ণতই উপেক্ষা করা হল।

কোন ভূস্বামী ভূমির 'সামাজিক ক্রিয়া' বাস্তবে রূপায়িত না করলে অমনি তার জমিদারির উপর ভূমি সংস্কার আইন প্রয়োজ্য হয় -- সরকার

তার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেয়। জাতীয় ভূমি ইনস্টিটিউট থেকে দেওয়া তথ্য অনুসারে, ভূমি সংস্কার আইনের বলে ১৯৬৪ সাল নাগাত ৬৬ হাজারের বেশি কৃষক পরিবার ভূমি পেয়েছিল।* দেশটিতে কৃষকের সংখ্যা ২৫,০০,০০০, — গড় আকারের পরিবারে পাঁচ জন করে ধরলে কৃষক পরিবারের মোট সংখ্যা ধরা যেতে পারে ৫,০০,০০০, তাহলে যত পরিবার ভূমি পেল তাদের সংখ্যা ১৩ শতাংশের বেশি নয়।

এই সরাসরি ভূমি বিলির ব্যাপারটা তাৎপর্যসম্পন্ন, কিন্তু, ১৯৬০ সালের ৫ই মার্চ তারিখের ভূমি সংস্কার আইন যে কৃষকদের পরিচালিত ভূমি দখল মেনে নিল তার তাৎপর্য আরও বেশি। ঐভাবে নেওয়া ভূমিতে কৃষকের মালিকানার স্বীকৃতিটা হল বহুলাংশেই জমিদারির মালিকদেরই স্বার্থে, ঐ বাবতে ঐ মালিকদের মোটা রকমের খেসারত দেবার ব্যবস্থা হল। ঐসব ভূমিতে কৃষকের মালিকানায় সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হল (তার ফলে কৃষকের অবস্থান আরও বেশি মূর্ত-নির্দিষ্ট হল), কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে ভূমি সংস্কার আইনে ঐ কৃষকেরা ঐসব ভূমির প্রাক্তন মালিকদের খেসারত দেবার জন্যে দায়ী হল।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, যেমন ভারতে তেমনি ভেনেজুয়েলায়ও এযাবত যে ভূমি সংস্কার রূপায়িত হয়েছে তাতে ভূমি সমস্যার সমাধান হয় নি, কেননা ঐসব সংস্কারের পরেও গ্রামের জনসংখ্যার উপরের স্তরটা তাদের খুবই বাস্তব বিশেষসুবিধাগুলো ভোগ করে চলেছে, আর বেশির ভাগ কৃষক রয়ে গেছে আগেরই মতো ভূমিহীন। আবারও ভারতেরই মতো ভেনেজুয়েলায়ও ছোট কৃষকের অর্থনীতিতে ভূমির 'সামাজিক ক্রিয়াটাকে' যথোপযুক্তভাবে কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ কিনা, তাদের অর্থনীতির উৎপাদন-শীলতা অপ্রতুল, প্রকৃতপক্ষে, তাতে তাদের নিজেদের জীবিকা-নির্বাহ করাও শক্ত, বিপণনযোগ্য উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সেগুলি সম্পূর্ণতই অপারগ।

ভেনেজুয়েলা আর ভারত এই দুই দেশেই, তেমনি তৃতীয় দুনিয়ার আরও অনেক দেশেও, ভূমি সংস্কার চালু হয় সরাসরি কৃষকদের কার্যকরণ এবং ভূমি সমস্যার সমাধান পাবার জন্যে সুদৃঢ় প্রচেষ্টার ফলে। তবে, কয়েকটি রাষ্ট্রে কৃষকদের এই রকমের কোন কার্যকরণ চলার আগেই শাসক

* *Reforma Agraria en Venezuela.* Instituto Agrario Nacional. Caracas, 1964, p. 122.

মহল বিভিন্ন সংস্কারে হাত দেয়। **ইরান** তার একটি ভাল দৃষ্টান্ত। ইরানে শাহ নিজেই উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং কেন তিনি সংস্কার চালু করার সিদ্ধান্ত নিলেন তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন: 'নিচ থেকে বিপ্লব আসার আগেই উপর থেকে ক্রমবিকাশের প্রস্তুতি চালাবার জন্যে আমি জাতির নেতাদের হুঁশিয়ারি জানিয়ে আসছি আমার রাজত্ব করার প্রায় প্রথম দিনটা থেকেই।'*

১৯৫৯ সালের শেষাশেষি প্রকাশিত কৃষি সংস্কার আইনের প্রথম খসড়ায় ভূমিতে মালিকানার সর্বোচ্চ মাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সেচযুক্ত ভূমিতে ৩০০ হেক্টর আর সেচ-ছাড়া ভূমিতে ৬০০ হেক্টর। ফলবাগিচার জন্যে কোন সীমা নির্দেশ করা হয় নি। ভূস্বামীরা আর তাদের প্রতিনিধিরা মজলিশে ঐ খসড়ার প্রবল বিরোধিতা করেছিল, মজলিশে তারা ছিল সংখ্যাগুরু, তারা নিজেদের জন্যে কোন কোন সুবিধা দিতে সরকারকে বাধ্য করেছিল, এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন ছিল ভূমিতে মালিকানার ঊর্ধ্বতর সীমা, সেটা পরে সেচযুক্ত এবং সেচ-ছাড়া জমির জন্যে যথাক্রমে ৪০০ এবং ৮০০ হেক্টরে নির্দিষ্ট হল, সেটা লিপিবদ্ধ ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসের আইনে।

কিন্তু, ভূস্বামীদের বিরোধিতা চলতেই থাকল, ১৯৬০ সালের আইন আর তার জায়গায় এসেছিল যে ১৯৬২ সালের আইন সেগুলির রূপায়ণ দীর্ঘকাল যাবত কার্যত মুলতবি রইল। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ আইন বলবৎ করবার জন্যে পাঠানো সরকারী কর্মকর্তারা নিহত হল। অসন্তোষ দেখা দিল কৃষকদের মধ্যেও — তারা বলল, ঐসব সংস্কারে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে না। বিরোধিতা যা তীব্র মাত্রায় উঠল তাতে শাহ বাধ্য হয়ে মজলিশ ভেঙে দিলেন; সংস্কার বলবৎ করার পথে মজলিশ বাধা দিচ্ছিল। ১৯৬২ সালের ৯ই জানুয়ারি এবং ১৯৬৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখের আইনদুটির ভিত্তিতে রচিত ভূমি সংস্কার এখন বাস্তবে রূপায়িত করা হচ্ছে।

নতুন আইনে ভূস্বামীর সামনে তিনটে পথ থাকল — হয়, (১) উদ্বৃত্ত ভূমি থাকলে সেটাকে অন্তত ৩০ বছরের জন্যে কৃষকের কাছে খাজনাবিলি করতে হবে — খাজনার পরিমাণ পাঁচ বছর অন্তর-অন্তর পুনর্বিবেচনা করে

* *Life*, July 29, 1963, p. 46.

দেখা হবে; (২) পারস্পরিক সম্মত শর্তে ঐসব ভূমি প্রজার কাছে বিক্রি করতে হবে; নইলে, (৩) প্রজা যে ভূমিতে চাষ করে তার একাংশ প্রজার হাতে তুলে দিতে হবে নিখরচে — ঐ ভূমি হবে ফসলে প্রজার চিরাচরিত ভাগের অনুযায়ী, বাদবাকি ভূমি চাষ করাতে হবে দিনমজুর দিয়ে। তৃতীয় পন্থাটা ধরা হলে ভূমিসংক্রান্ত ব্যাংক ভূস্বামীকে প্রয়োজনীয় ক্রেডিট দেবে। ১৯৬৪ সালে আইনটা সংশোধিত হল, তাতে ব্যবস্থা থাকল যে, ঐভাবে পাওয়া ভূমি বাবত কৃষক সমবায় সমিতির সদস্যরা ভূস্বামীদের খাজনা এবং পুনরুদ্ধার-মূল্য দেবে, সেটার জন্যে সমবায়গুলিকে জামিন থাকতে হবে।

ভূমি যাতে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে এমন সব কাজ-কারবার নিষিদ্ধ করে ইরানের আইনে কয়েকটা ধারা আছে। অধিকন্তু, যেসব কৃষক সংস্কার আইন অনুসারে ভূমি পাবে তারা কোন সমবায়ে যোগ দেবে, এটা আবশ্যিক। এইগুলি এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার লক্ষ্য হল যথেষ্ট বৃহদায়তন অর্থনীতি গড়ে ওঠা নিশ্চিত করা, যাতে উৎপাদন আরও ফলপ্রদ হতে পারে এবং শহরে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জরুরী চাহিদাগুলি মেটাবার উপযোগী উদ্বৃত্ত যাতে সৃষ্টি হতে পারে।

তবু, আলোচিত অন্যান্য দেশের মতো ইরানের ক্ষেত্রেও এটা সত্য যে, 'উপর থেকে বিপ্লব', 'শ্বেত বিপ্লব', ইত্যাদি ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে তার প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে নি — এই উদ্দেশ্যটা হল বিশেষসুবিধাভোগী ভূস্বামীদের এবং অভাবী, সামান্য জমির কৃষকদের ভিতরকার ব্যবধানটাকে ঘুচিয়ে দেওয়া।

মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে কতকগুলি ভূমি সংস্কার চালু করা হয়েছিল মূলত ভিন্ন অবস্থায়, সেগুলির ফলও হয়েছিল ভিন্ন রকমের। ১৯৫২ সালে মিসরী বিপ্লবের প্রাক্কালে কৃষকের দশা ছিল যথার্থই ভয়াবহ। জনসংখ্যার মাত্র এক শতাংশ ছিল সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীরা — তাদের হাতে ছিল সমস্ত আবাদযোগ্য ভূমির ৩৫ শতাংশ, কৃষক প্রজাদের তোলা ফসলের ৭০ শতাংশ অবধি তাদের হস্তগত হত। মিসরে কৃষকের গড় আয়ু ছিল ২৭ বছর।

সংস্কারসংক্রান্ত ডিক্রি জারি হয়েছিল বিপ্লবের পরেই। কিন্তু তখন এই ডিক্রির আওতায় এসেছিল কৃষকদের মাত্র ৫ শতাংশ আর সমস্ত ভূমির মাত্র ৬·৪ শতাংশ (যদিও ভূস্বামীদের মালিকানায় ছিল ৩৫ শতাংশ)।

মিসরে জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্প্রসারিত হবার ফলে ১৯৬১ সালে এল নতুন ভূমি সংস্কার, তাতে এইসব ব্যবস্থা ছিল: (ক) কোন পরিবার

যে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভূমির মালিক হতে পারে সেটার মাত্রা ১৯৫২ সালের আইনে নির্দিষ্ট ৮০ হেক্টর থেকে অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হল; (খ) কৃষকদের মধ্যে বিলি করার জন্যে ভূস্বামীদের মালিকানাধীন ১,২৫,০০০ হেক্টর ভূমি দখল; এবং (গ) ২,৬১৪ জন বিদেশীর মালিকানাধীন সমস্ত ভূমি পুরোপুরি দখল করা। নতুন নতুন ভূমি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গেই এইসব সিদ্ধান্ত বলবৎ করার ব্যবস্থা ছিল ··· ঐসব নতুন ভূমিও কৃষকের হাতে দেবার জন্যে। হিসাবে দেখা গিয়েছিল, এই দুটো সূত্রে প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারের (মোট ২,৬৬,০০০ কৃষক পরিবার) হাতে পড়ে ০·৮ থেকে ২ হেক্টর ভূমি।

সদ্য আবাদ করা এবং সংস্কারের বলে বিলি করা ভূমিতে সমবায়ের জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করা হয়েছিল। এখন সরকারী নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সমবায় সংগঠিত হচ্ছে। যাকে বলা হয় 'যুক্ত পালাক্রমিক ফসলের সমবায়' সেটা হল এক ধরনের প্রচলিত সমবায়, — ভূমি যাতে অতি মাত্রায় টুকরো টুকরো হয়ে না যায় এবং অনিয়ন্ত্রিত খামার যাতে না চলে যুক্তিসম্মত খামারের কাজের পরিপন্থী এই দুটো জিনিস বন্ধ করার জন্যে চালু হয় ঐ যুক্ত পালাক্রমিক ফসলের সমবায়। এইসব সমবায়ে সমস্ত ভূমিকে কতকগুলো বড় খেতে ভাগ করে ফেলা হয়, তার প্রত্যেকটা খেতে থাকে কয়েক জন মালিকের ভূমিখণ্ডগুলি, সেগুলিতে রোয়া হয় কোন একটা ফসল। এইভাবে প্রত্যেকটি কৃষক কয়েক রকমের বদলে এক রকমের ফসল জন্মায়। সব ফসল তোলা হলে চলে বিনিময়। এই প্রণালীতে ইতোমধ্যেই শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি আর ফলনের পরিমাণ দুইই বেশ বেড়েছে। সমবায়-গুলিকে বিনাসুদে ঋণ দিয়ে সরকার কৃষকদের জন্যে ক্রেডিটের ব্যবস্থা করেছে।

এইসব সংস্কারের ফলে কৃষিক্ষেত্রে সত্যিকারের অগ্রগতির পথ খুলে গেল — কেননা, তার ফলে ভূমিতে সামন্ততান্ত্রিক মালিকানার অবসান ঘটল যথার্থই, আর, যাদের শ্রমে ভূমির উৎপাদনশীল সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয় তাদেরই হাতে এল দেশের ভূমি সম্পদের প্রধান অংশটা। মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রের ভূমি সংস্কার এবং তৃতীয় দুনিয়ার অন্যান্য দেশের যে ভূমি সংস্কারের রূপরেখা আগে তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল ঐ। মনে হতে পারে এই দিক দিয়ে মিসরী আরব প্রজাতন্ত্র এবং ইরানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই: নীলনদের উপত্যকায়ও তো সংস্কার

প্রবর্তন করা হয়েছিল 'উপর থেকে' — কায়রোয় জারি করা ডিক্রি-বলে। কিন্তু বিষয়টাকে এভাবে দেখা ঠিক নয়। এভাবে দেখলে সংস্কারের বাহ্যিক, গৌণ দিকটাই বিবেচনা করা হয়। ঐসব সংস্কার যেসব সরকার চালু করেছে সেগুলির প্রকৃতি বিবেচনায় রাখা হলে একমাত্র তবেই সংস্কারগুলির আসল অর্থ নির্ধারণ করা যায়। মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে রয়েছে একটি বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক সরকার, যাকে বলা হয় জনসংখ্যার মধ্যবর্তী স্তরগুলি সেগুলিরই স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এই সরকার — অর্থাৎ কিনা, সামন্ততন্ত্রী কিংবা বুর্জোয়াদের স্বার্থ নয়। এইসব মধ্যবর্তী স্তরের বিশেষক হল সেগুলির সামাজিক অবস্থান, — মেহনতী জনগণ এবং সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণী এই দুইয়েরই সঙ্গে ঐ অবস্থানের মিল আছে। কৃষককে অবশ্য ঐ দুইয়েরই জাতিরূপী মূর্ত রূপে হিসেবে দেখা চলে, কেননা, কৃষক মেহনতি, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি সে খেতে খাটে, সে আবার সম্পত্তির অধিকারীও বটে বাস্তবিকই, কারণ তার দীন-হীন ভূমিখণ্ড তো সম্পত্তি, তেমনি, মনোবৃত্তির দিক দিয়েও, কারণ এখনও সে সেটাকে নিজস্ব করে নেবার স্বপ্ন দেখে এবং ইতোমধ্যে সেটাকে খাজনাবিলি করে তার সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এইভাবে মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে এখন ক্ষমতাসীন বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক সরকারটিকে সঠিকভাবেই মোটের উপর কৃষকের সপক্ষে বলে ধরা চলে, যার ফলে আগেই সিদ্ধান্ত করে নেওয়া যেতে পারে যে, এখানে চালু করা যেকোন ভূমি সংস্কারে কৃষকের স্বার্থটাকে যুক্তিসম্মতভাবে বিবেচনায় রাখা হয়, যে কৃষক ঐ সরকারের সামাজিক বনিয়াদের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরবর্তী ঘটনাবলিতে দেখা গেছে এমনটা মনে করা সঠিকই।

কৃষকদের আরও বেশি রাজনীতিক সক্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আর পাঞ্চজনিক কাজে প্রত্যক্ষ কৃষক প্রতিনিধিদের টানবার জন্যে মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বারবার চেষ্টা করেছে। এইভাবে, আরব সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের ৬,৯১২টা প্রাথমিক (স্থানীয়) সংগঠনের মধ্যে ৪,০০০টা স্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রামে। নিয়ম আছে, আসনের অন্তত ৫০ শতাংশ পাবে ফেল্লা (কৃষক) এবং শ্রমিকেরা। একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৬৪ সালে মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে এই নিয়ম খাটানো হয়েছিল।

এইভাবে, উপরে বর্ণিত প্রকৃতির ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সাধারণ স্বরাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি মিলে মিসরে কৃষির পুনরুজ্জীবনের একটা বনিয়াদ স্থাপিত হয়।

তবে, মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে কৃষিক্ষেত্রে যত সমস্যা ছিল সেই সবেরই সমাধান তার ফলে হয়ে গেল, এমনটাও তার অর্থ নয়। কেননা, প্রকৃতপক্ষে, বহু মুশকিলই রয়ে গেছে—সেগুলি এক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি রোধ করছে। এই রকমের একটা প্রতিবন্ধ হল এই যে, দেশটিতে যথার্থই ভূমির ঘাটতি আছে: দেশটির মোট আয়তনের মাত্র ৪ শতাংশ আবাদযোগ্য ভূমি, অথচ, খামারের কাজে জীবিকানির্বাহ করে তার ৭০ শতাংশ মানুষ। নিষ্কৃতির পথ আছে একটাই — সেটা হল বড় বড় অহল্যা ভূমিখণ্ডের উন্নয়ন। দুঃখের কথা, দেশটির বেশির ভাগই মরুভূমি। সেচের একমাত্র উৎস হল নীলনদ। এই নদের জল দিয়ে মরুভূমিকে উর্বর করে তোলা মিসরের মানুষের দীর্ঘকালের স্বপ্নের কথা, কিন্তু এখনকার বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক শাসক কর্তৃপক্ষ বড় আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করার আগে ঐ স্বপ্ন সার্থক করে তোলার জন্যে কিছুই করা হয় নি; সোভিয়েত ইউনিয়নের টেকনিকাল এবং আর্থিক সহায়তায় ঐ বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। অনুমান ছিল, এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ বেড়ে যাবে প্রায় ৩০ শতাংশ। কৃষির গড়নেও সম্ভবত বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে যাবে। যেমন, ব্যাপক পরিসরে ধান উৎপাদন সম্ভব হবে; জলের অভাবের দরুন সেটার কথাও আগে উঠতে পারে নি। আসোয়ান বাঁধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রকল্প রূপায়িত হয়ে গেলে মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়বে ৪০-৫০ শতাংশ, আর দেশটির জাতীয় আয় বাড়বে ৪৫ শতাংশ।

মোট কথা, তৃতীয় দুনিয়ার অন্যান্য অনেক দেশের মতো মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রও সামাজিক-আর্থনীতিক এবং সাংগঠনিক আর প্রযুক্তিগত এই দুই দিক থেকেই কৃষি সমস্যাটার সমাধানের চেষ্টা করছে। এই দুই দিক দিয়ে চালানো প্রচেষ্টার যথোপযুক্ত সমন্বয় করা হয়, আর এই দুটি মিলে হয় দেশের কৃষি উন্নয়নের নির্ভরযোগ্য বনিয়াদ। আগেই বলা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতির অগ্রগতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে এই দুই দিক দিয়ে চালানো প্রচেষ্টার এই রকমের সমন্বয়ের প্রয়োজন কোন-না-কোনভাবে সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে (যেমন, ভারতে এবং ইরানে)। এরই সঙ্গে সঙ্গে, তৃতীয় দুনিয়ার সর্বত্র -- যেমন অন্যত্রও বহু দেশে -- এটা ব্যাপকভাবে মেনে নেওয়া হয় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কার এমন অতি মাত্রায় মূলগত হওয়া উচিত নয় যা

কৃষিকাজে বিভিন্ন আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির সুফলপ্রদ প্রয়োগের পরিপন্থী হতে পারে, তার পক্ষে যুক্তি দেখানো হয় এই: বড় বড় জমিদারির মালিকানা বিলুপ্ত করে সংশ্লিষ্ট ভূমিগুলি যারা সেখানে চাষ করে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলে ভূমি চূড়ান্ত মাত্রায় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, পৃথক পৃথক জমিজিরেতের পরিমাণ এত কম দাঁড়াবে যাতে সেগুলির অর্থনীতি আর লাভজনক হবে না। জাতিসংঘের খাদ্য-কৃষি সংগঠনের বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, তৃতীয় দুনিয়ায় জমিজিরেৎগুলির এখনকার গড় আয়তন অপরিবর্তিত থাকলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ১৯৬৫ — ১৯৮৫ সালের কালপর্যায়ে আবাদী ভূমির মোট পরিমাণ বছরে ১·৫ শতাংশ করে বাড়ানো দরকার। কিন্তু এটা করবার কোন বাস্তব সম্ভাবনা নেই -- কাজেই, সিদ্ধান্ত করা হয়, উপরে উল্লেখিত কালপর্যায়ে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার অনিবার্য বৃদ্ধির (মোট ১৭ থেকে ৫০ কোটি) দরুন গুরুতর অতিপ্রজতা দেখা দেবে।

খাদ্য-কৃষি সংগঠনের বিশেষজ্ঞেরা এর সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তৃতীয় দুনিয়ার গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগে বিদ্যমান সামাজিক গড়ন 'কৃষির আধুনিকীকরণের পথে একটা ভয়ানক বাধা। প্রায়ই, যে চাষ করে তার নিরাপদ ভূমিস্বত্বের অধিকার নেই; তাকে দিতে হয় অত্যধিক খাজনা কিংবা ফসলের ভাগ — সেটা মোট উৎপাদনের ৫০ শতাংশেরও বেশি হতে পারে; সে থাকে কারবারি-মহাজনের তাঁবে, এই কারবারি-মহাজনের কাছ থেকে তাকে ধার নিতে হয় অতি চড়া সুদে, আর সেই মহাজনের কাছে তার উৎপন্নের একাংশ কিংবা সবটাই যে দামে বিক্রি করতে হয়, দরকষাকষির দিক থেকে তার অবস্থা দুর্বল এবং অসহায়ই না হলে সে দাম বলবৎ হত না। পুঁজি বিনিয়োগ এবং লগ্নী পুঁজির উপর চলতি খরচখরচার পক্ষে এটা গুরুতর নিরুৎসাহকর।'* এই উদ্ধৃতিটা থেকে দেখা যাচ্ছে, এই বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, তৃতীয় দুনিয়ায় কৃষিকাজে উৎপাদিকা-শক্তির মাত্রা বাড়াতে হলে মোটারকমের ভূমি সংস্কার দরকার। কিন্তু, যে দলিল থেকে ঐ উদ্ধৃতিটা নেওয়া হয়েছে তাতেই ভিন্ন প্রকৃতির একটা বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। জোর দিয়েই বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সরকারকে একটা উভয়সংকটের সমাধান করতে হবে, যা সমাধানের

---

* United Nations Economic Commission for Asia and the Far East, *Indicative World Plan for Agricultural Development. A Progress Report*, CAEP. 3/B. 15, November 6, 1967, p. 13.

অতীত: তারা গ্রামাঞ্চলের চূড়ান্ত অসমতার যাবতীয় সামাজিক পরিণতি বরদাস্ত করে চলবে, না, গ্রামাঞ্চলে আর্থনীতিক প্রগতির চিন্তাটাই ছেড়ে দেবে?

প্রশ্ন ওঠে — গ্রামাঞ্চলের সামাজিক অগ্রগতি এবং আর্থনীতিক উন্নয়নের বিষয়টাকে এইভাবে পাশাপাশি দাঁড় করানোর দরকার কতখানি? মূলগত ভূমি সংস্কারের ফলে গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন না ঘটে বরং তার পতনই ঘটবে, এমন কথা বলা ঠিক কি?

প্রশ্নদুটি কেবল কৃষি সমস্যাবলি ছাড়াও আরও কিছুর সঙ্গেও মূলত সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন আর্থনীতিক তত্ত্বের মধ্যে আলোচিত বিভিন্ন অত্যাবশ্যক সমস্যার সঙ্গে প্রশ্নদুটো সংশ্লিষ্ট। তবে, যেহেতু আমাদের কথা হচ্ছে তৃতীয় দুনিয়ার গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন চাহিদা আর সমস্যা নিয়ে, তাই, বিশেষভাবে এই অঞ্চলগুলিতে অবস্থার উপর যে পরিমাণে প্রশ্নদুটোর বাস্তব তাৎপর্য আছে সেইভাবে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করা দরকার।

কার্যকর উঁচু মাত্রায় উৎপাদনশীল অর্থনীতি সংগঠিত করার ব্যাপারে ক্ষুদ্রায়তনের চেয়ে বৃহদায়তন খামারের সুবিধাই যে সাধারণত বেশি, এটা তো স্বতঃপ্রতীয়মান হবারই কথা। সেটা তো একরকম স্বতঃসিদ্ধই। অন্যদিকে, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এটা একেবারে ভ্রান্ত হতে পারে। যেমন, লাতিন আমেরিকার কোন বিরাট লাতিফুন্দিয়া কিংবা ইরানের সংস্কার এড়িয়ে যাওয়া কোন ভূস্বামীর জমিদারির চেয়ে ডেনমার্কের কোন ছোট খামার হয়ত বেশি উৎপাদনশীল হতে পারে। এক্ষেত্রে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকায় আসে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীর আর্থনীতিক গরজের মতো উপাদান — সেটা ডেনমার্কের ঐ খামারির ক্ষেত্রে অফুরন্ত হতে পারে, আর লাতিন আমেরিকার দিনমজুরটির ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে প্রায় শূন্য। আবার, সামন্ততান্ত্রিক ধরনের জমিদারিগুলো বিলুপ্ত করবার প্রয়োজন সম্বন্ধে খুবই বহুল পরিমাণ মতৈক্য রয়েছে — কাজেই, ধরে নেওয়া যাক ভূমি সংস্কার সেই পর্ব পার হয়ে এসেছে, এখন, সামাজিক-আর্থনীতিক দিক থেকে কেবল পুঁজিতান্ত্রিক ধরনের বড় বড় আর্থনীতিক প্রতিষ্ঠান এবং ছোট কৃষকের জমিজিরেৎগুলো নিয়েই কৃষিক্ষেত্র। এখন প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে: বেশি উৎপাদনশীল হবে কোন্ ধরনের অর্থনীতি? কোন্ অর্থনীতির বিপণনযোগ্য উৎপন্ন বেশি হবে? নিশ্চয়ই আগেরটা। তবে, হঠাৎ কোন সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত করে ফেলা চলে না। আমাদের উত্তরটা থেকে কিছুতেই

এমন বক্তব্য আসে না যে, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি ঠিক ঐরকমের পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির সম্ভাব্য সর্বাধিক উন্নয়নেই আগ্রহশীল। এইসব বড় পুঁজিতান্ত্রিক খামার কোন দেশের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে পারে এমনটা সম্ভাবিত নয়, তা যদি হতও তবু অমন বক্তব্য ঠিক হত না। কেননা, গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার প্রধান স্তরটার সমস্যাবলির সমাধান হত না তাতেও, — এই প্রধান স্তরটা হল ছোট কৃষকেরা, এরাই তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির মানুষের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। গ্রামাঞ্চলের সামাজিক-আর্থনীতিক গড়নটার উন্নয়ন তেমন ধারায় হলে তার ফলে কৃষকদের ভবিষ্যৎ হয় দুর্দশাগ্রস্ত, এই কথাটাই বরং সত্যের আরও কাছাকাছি -- কেননা, কেবল কৃষকের সর্বনাশ ঘটিয়েই কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিতান্ত্রিক কারবারের শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে। আরও বেশি ভূমির দরকার হলে সেটা কেনা হবে প্রতিবেশী অভাবী কৃষকের কাছ থেকে। গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার নিঃস্বতার দরুন গণ পরিসরে নতুন দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে, — গ্রামাঞ্চলে খাদ্যের সাধারণ ঘাটতি এই দুর্ভিক্ষের কারণ নয়, এই দুর্ভিক্ষের কারণ এই যে, জনসংখ্যার বিরাট অংশের হাতে সেই খাদ্য কেনার পয়সা থাকবে না। দারিদ্র্য, দুর্দশা আর বেকারি থাকবে সেই একই। কৃষির ঐরকমের পুনরুজ্জীবনের জন্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এমন মূল্যই দিতে বলা হয়। কিন্তু তাদের অমন মূল্য দেবার কোন কারণ সত্যিই আছে কি?

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখা হলে — যেকোন রকমের অর্থনীতিই সংগঠিত হোক না কেন -- তৃতীয় দুনিয়ার সীমাবদ্ধ ভূমি-সম্পদসম্পন্ন অনেক দেশে অমনসব সামাজিক পরিণতিই অবশ্যম্ভাবী, আর সেইসব পরিণতির দরুন আসবে আবার নতুন নতুন গুরুতর আর্থনীতিক সমস্যা। এমনসব নিদারুণ পরিণতি রোধ করার একমাত্র পথ হল মূলগত ভূমি সংস্কার চালু করা, — যারা ভূমি চাষ করে তাদের হাতে ভূমি তুলে দেওয়া এবং ভূমিতে মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেবার ব্যবস্থা থাকবে সেই ভূমি সংস্কারে। তবে, এর থেকে আবার প্রশ্ন আসে — অনিবার্যভাবে ভূমি টুকরো টুকরো হবার দরুন যেসব ভয়ানক পরিণতি ঘটবে সেগুলো রোধ করার উপায় কি? ছোট ছোট উৎপাদনকারীদের সমবায়ে মিলিত হওয়াটাকেই তো সঠিক উপায় বলে মনে আসে। নানা রকমের এবং নানা উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী বিভিন্ন কৃষক সমিতি গড়া যেতে পারে। তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশে ইতোমধ্যেই সমবায়গুলির

সাহায্যে কৃষকের খামারগুলির জন্যে ক্রেডিটের বন্দোবস্ত করা হয়, বীজ, সার, যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামের যোগান দেওয়া হয়, খামারগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর বিপণনের ব্যবস্থা করা হয়। সবচেয়ে ফলপ্রদ ধরনের সমবায় হল উৎপাদন সমিতি।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে ছেয়ে আছে যেসব কৃষি সমস্যা সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তই আসছে যে, ভূমি সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বসম্পন্ন যথার্থ মূলগত সংস্কারই — সর্বোপরি সেটাই — সেগুলির সমাধান করতে পারে। বলা বাহুল্য, এখন চলতি ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় যাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় সেইসব সামাজিক স্তর (যেমন, ভূস্বামী শ্রেণী) বর্তমান ভূমি ব্যবস্থায় যেকোন পরিবর্তনের প্রবল বিরোধিতা করবে। বহু ক্ষেত্রে হয়ত সংশ্লিষ্ট দেশের শাসক মহলগুলির উপর তারা বেশকিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে, সরকারী কর্মকর্তাদের উৎকোচে বশীভূত করে, ইত্যাদি উপায়ে তারা হয়ত ভূমি সংস্কার রুখে দিতে পারবে। যা কিছু ভূমিস্বত্বের কিংবা কৃষি উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পথে অন্তরায় সেটা, তার ফলে, নতুন ধারায় জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার পথেও অন্তরায়। পথ বেছে নেওয়াটা কঠিন — হয়, মুষ্টিমেয় বিশেষসুবিধাভোগীদের স্বার্থ আর সংকীর্ণ ইচ্ছা মেটাতে হবে, নইলে, জনগণের চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন চাহিদা মেটাতে হবে। সেই ঔপনিবেশিক আমলে জনগণের চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন চাহিদাগুলি তখনকার মতো অবহেলিত হতে পারত: এই চাহিদাগুলি বিজাতীয় রাজের বিবেচ্য বিষয় হত না আদৌ। কিন্তু এখন যে দেশের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সেখানকার সরকার অন্তত বেশকিছু কাল ক্ষমতায় আসীন থাকতে চাইলে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ভূমি সংস্কার মুলতবি রাখতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের ভূমি সংস্কার এখন তৃতীয় দুনিয়ার একরকম সর্বত্রই চালু হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটা চলতে থাকবে না তার কোন কারণও আছে বলে মনে হয় না।

শেষপর্যন্ত অবশ্য কোন দেশে সমগ্রভাবে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ধারার সূত্রে ছাড়া কৃষি সমস্যাবলির সমাধান হতে পারে না। কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বহু বিষয়েরই প্রত্যক্ষ তাৎপর্য রয়েছে — সেগুলির মধ্যে দুটো মাত্র হল শহরের বাজারের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের উৎপাদনের সম্পর্ক ঘটিত এবং গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন চাহিদার সঙ্গে যন্ত্রশিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর

সম্পর্ক ঘটিত। তবে, তাছাড়াও, আরও দূরে অবধি বিস্তৃত বিভিন্ন সম্পর্কও রয়েছে — যেমন, যেসব সম্পর্ক জড়াজড়ি হয়ে তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশের কৃষি অর্থনীতিকে বিশ্ব বাজারের বিভিন্ন সম্পর্কের জটিল জালের মতো করে তোলে।

এর থেকে আসছে একটা নতুন প্রসঙ্গ: ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে চলে আসা আর্থনীতিক গড়নের সাধারণ পুনর্গঠনের প্রসঙ্গ।

২। অর্থনীতির বহুমুখীকরণ এখনকার কাজ

এই আলোচনায় আগের একাংশে উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থনীতিক নির্ভরশীলতার বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই দেশগুলির এমন নির্ভরশীলতার অন্যতম কারণ হিসেবে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির সাধারণ মাত্রার নিচু স্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। এখন আবার সেই সমস্যায় ফিরে গিয়ে সর্বপ্রথমে উৎপাদিকাশক্তি, অর্থাৎ শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি সংক্রান্ত ধারণাটার আরও যথাতথ সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করতে হবে। শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশক যে পরিসংখ্যানগত পরিমাপের গৃহীত পদ্ধতি অনুসারে সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য লাভ করে এবং বিভিন্ন আর্থনীতিক প্রক্রিয়া আর ব্যাপার ফুটিয়ে তোলে, এটা প্রতিপন্ন হয়ে আছে। জাতীয় অর্থনীতির কোন কোন নির্দিষ্ট শাখায় শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি হতে পারে বিবেচ্য বিষয়। কিংবা, আবার — যেমন এই বর্তমান প্রসঙ্গে — উন্নয়নশীল দেশগুলির বিভিন্ন রপ্তানি শিল্পে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিই হতে পারে আমাদের বিবেচ্য বিষয়। এটা তো ষোল-আনাই স্বতঃপ্রতীয়মান হবে যে, এক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটলে ইউনিট পিছু ব্যয় কমে যাবে এবং, দাম আর রপ্তানির পরিমাণ অপরিবর্তিত ধরলে, সংশ্লিষ্ট দেশে জাতীয় সম্পদের অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ নিয়োগ করে একই পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার আয় নিশ্চিত হবে।

এই রকমের অগ্রগতি বাস্তবে ঘটছে। তবে, এর ফলাফল উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে কল্যাণজনক হবার কাছাকাছিও নয়। শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি হলে জাতীয় সম্পদ বেঁচে না গিয়ে বরং রপ্তানির যা সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি উৎপাদন হয়, তার দরুন আবার রপ্তানি করার

দ্রব্যসামগ্রীর দাম পড়ে যায়। ফলে দেখা দেয় একটা অদ্ভুত স্ববিরোধী ব্যাপার: কাজ করা হয় যত বেশি, পাওয়া যায় ততই কম।

তবে, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি-নির্দেশকের আওতায় পড়তে পারে কোন দেশের সমগ্র জনসংখ্যা কিংবা জনসংখ্যার কেবল অর্থনীতিগতভাবে সক্রিয় অংশ। সাধারণভাবে, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি-নির্দেশকে হয় রপ্তানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমনসব শিল্পে, নইলে রপ্তানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট নয় এমন দু' রকমেরই শিল্পে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়। যেমন, রপ্তানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন শিল্পে শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদনের ক্রমবৃদ্ধির ফলে অপেক্ষাকৃত কম শ্রম নিয়োগ করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রপ্তানি পণ্য পাওয়া গেলে এইভাবে ছাড়া-পাওয়া শ্রমিকদের উৎপাদনের অন্য কোন ক্ষেত্রে বদলি করা যায়, এইভাবে মোটের উপর জাতীয় শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির মাত্রা বাড়ে, তাতে রপ্তানির জন্যে উৎপাদনের পরিমাণ অপরিবর্তিতই থাকে।

বিষয়টা দাঁড়ায় এই রকমের: রপ্তানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিতে ক্রমবর্ধমান শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির ফলে ছাড়া-পাওয়া জাতীয় সম্পদ (শ্রম, দেশীয় পুঁজি, পরিবহন, শক্তি) জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যথার্থই চালান করা যায় কিনা এবং সেই সব ক্ষেত্রে সেটাকে খাটালে তা উৎপাদনশীল হয় কিনা। এইভাবে দেখা যাচ্ছে এটা হল **জাতীয় অর্থনীতি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে যথার্থ সাধন এবং সম্ভাবনা সংক্রান্ত সমস্যা।**

অর্থনীতি বহুমুখী করা হলে পৃথক পৃথক শিল্পে এবং জাতীয় পরিসরেও শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বাড়ে। বহুমুখীকরণের ফলে যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম ভান্ডার বাড়ে এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন শিল্প গড়ে ওঠে বিস্তৃত জালের মতো। মোট কথা, কোন দেশে জাতীয় অর্থনীতির একপেশে **ঔপনিবেশিক** গড়নটাকে বদলে দেবার জন্যে এটা সক্রিয় হয়। এর ফলে, প্রধানত বহির্বাণিজ্যের মারফত প্রভাব খাটায় যেসব বহিস্থ উপাদান সেগুলির উপর, পুঁজির আন্তর্জাতিক চলাচলের উপর এবং ঐরকমের অন্যান্য উপাদানের উপর ঐ অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরশীল হয়।

অর্থনীতির যেসব ক্ষেত্রে উৎপাদন হয় রপ্তানির জন্যে সেইসব ক্ষেত্রের অবস্থা দিয়েই কোন দেশের সমগ্র অর্থনীতির অবস্থা কার্যত নির্ধারিত হলে -- সার্থক বহুমুখীকরণ দিয়ে সেই পরিস্থিতির অবসান ঘটানো যায়। প্রাক্তন উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলিতে রপ্তানির শিল্পগুলি এবং

অন্যান্য শিল্পের মধ্যে সাধারণত একটা ব্যবধান থাকে, — অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে বিভিন্ন শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির মধ্যে বিরাট অসমতা দিয়ে ঐ ব্যবধানের পরিসর নির্ধারিত হয়।

নিচে সারণীতে অঙ্কগুলিকে ঐসব অসমতার পরোক্ষ নির্দেশক হিসেবে ধরা যেতে পারে। এই সারণীটি বিচার-বিশ্লেষণ করবার সময়ে নিম্নলিখিত কথাটা মনে রাখা দরকার। সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির মাত্রা সমগ্রভাবে জাতীয় অর্থনীতির চেয়ে পৃথক পৃথক শিল্পে বেশি, তার কারণ জাতীয় শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির নির্দেশক হিসেবে ধরা হয়েছে জনসংখ্যার মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদের পরিমাণটাকে, আর, এই সারণীর জন্যে জনসংখ্যা বলতে বুঝাচ্ছে অর্থনীতিগতভাবে নিষ্ক্রিয়দের সমেত সমগ্র জনসংখ্যা। তাছাড়া, 'রপ্তানির শিল্প' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে যন্ত্রশিল্পগুলি প্রসঙ্গে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে খনিশিল্প আর স্বভাবজ উৎপন্ন শিল্পগুলি (নিষ্কর্ষক শিল্প) প্রসঙ্গে। জাতীয় এবং শিল্পগত শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি-

১১ নং সারণী

অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি

(মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলার)

দেশ-সমষ্টি	উৎপাদিকাশক্তি		
	জাতীয় (ক)	রপ্তানির শিল্পগুলি (খ)	অনুপাত (গ)
অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি	১,২৫০	৪,৪৩৭	১: ৩·৫
উন্নয়নশীল দেশগুলি	১২৩	৩,৩৫০	১:২৭

ক) জনসংখ্যার মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদ।

খ) অর্থনীতিগতভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার মাথাপিছু নব্য-সৃষ্ট মূল্য।

গ) জাতীয় আর রপ্তানির শিল্পের মধ্যে অনুপাত।

(হিসাবের ভিত্তি হল জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত *Patterns of Industrial* Growth, 1938-1958, New York, 1960.)

মাত্রার মধ্যে অনুপাত দিয়ে বহুমুখীকরণের মাত্রার পরিমাপ করা হয়েছে: অসমতা যত কম, বহুমুখীকরণের মাত্রা ততই বেশি।

এই পরিস্থিতির একটা পরিণতি হল এই যে, রপ্তানির চিরাচরিত শিল্পগুলি ছাড়া অন্যান্য শিল্পে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির মাত্রা নিচু হবার দরুন উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্বের বাজারে যেসব পণ্য বিক্রি করতে পারে সেগুলির পরিধি সম্প্রসারিত করতে পারে না --- কেননা, বিশেষ বিশেষ ধরনের চুক্তি করা না গেলে, এক্ষেত্রে শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলির প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়, ঐসব রাষ্ট্রের শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির মাত্রা উচ্চতর।

শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির নিচু মাত্রার দরুন উন্নয়নশীল দেশগুলি যেমনটি চায় সেভাবে জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করতে পারে না — ঠিক যেমন বাজারী অর্থনীতির অবস্থায় ছোট ছোট উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর পড়তি দামের সঙ্গে তাল রেখে উঠতে পারে না: তারা নিজেদের ব্যবসা ছেড়ে অন্য কোন ধারায় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হাতে নিতে পারে না — অন্য ধারার জন্যে প্রয়োজনীয় কৃৎকৌশল কিংবা পয়সা কোনটাই তাদের নেই। নিজেদের উৎপাদের ইউনিট পিছু আগেকার দাম পেতে অপারগ হয়ে, আগেকার মাত্রা বজায় রাখার জন্যে ক্রমাগত আরও বেশি কাজ করতে প্রস্তুত না থাকলে তাদের ক্রমাগত আরও কম পরিমাণ আয় মেনে নিতে হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বহুমুখীকরণ হল আর্থনীতিক স্বাধীনতার পথে একটা আবশ্যকীয় পদক্ষেপ।

উন্নয়নশীল দেশগুলি সাধারণত বেশি মাত্রায় কৃষিপ্রধান, কোন কোন ক্ষেত্রে সেটার অনুপূরক হয় কোন খনিজ কাঁচামালের উৎপাদন — তাই, প্রায়ই মনে করা হয় যে, আকারণশিল্পের সম্ভাব্য সমস্ত শাখার বাধ্যতামূলক এবং ত্বরিত উন্নয়নই বুঝি বহুমুখীকরণ। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, বহুমুখীকরণের সমস্যাটা ঢের বেশি জটিল।

প্রথমত, আগেই দেখা গেছে, তৃতীয় দুনিয়ায় অবস্থা বাস্তবে এমনই যাতে তাদের সীমাবদ্ধ সম্পদকে সহসা শিল্পক্ষেত্রে চালান করা হলে অন্তত কোন কোন দেশের পক্ষে তার গুরুতর পরিণতিই ঘটতে পারে, কেননা, তার দরুন খাদ্য সমস্যা হয়ত ক্রমেই বেশি মাত্রায় সংকটজনক হয়ে উঠতে পারে। আসলে, শিল্পোন্নয়নের জন্যে শিল্পের ক্রমবৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য চাই। যেকোন বিচ্যুতির দরুন সংশ্লিষ্ট

দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, অতি মাত্রায় চাপ পড়তে পারে এবং শেষপর্যন্ত উন্নয়নের প্রক্রিয়াটাই সাধারণভাবে ব্যাহত হতে পারে। কৃষির দিকে, বিশেষত কৃষি উন্নয়নের সামাজিক উপাদানগুলির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ না দেবার দরুন, তেমনি, জনসংখ্যার ঝটিতি বৃদ্ধি, আর সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদনের সমতুল উন্নয়ন ছাড়াই ত্বরিত শহর উন্নয়নের দরুনও কতকগুলি উন্নয়নশীল দেশে বাস্তবিক তাইই ঘটেছে। যেসব দেশে জনবহুলতা বিস্তর আর ভূমি-সম্পদ সীমাবদ্ধ সেইসব দেশে ঐ পরিণতিগুলি হয়েছে বিশেষভাবে গুরুতর। এর কোন কোন দেশে, যেমন ভারতে, কৃষি উৎপাদনে পিছিয়ে পড়া অবস্থাটা বহুলাংশেই গ্রামাঞ্চলে অগ্রগতি ব্যাহত করে এমনসব সামাজিক-আর্থনীতিক বাধার সঙ্গে যথেষ্ট কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে না পারবার ফল। অন্যান্য দেশে, যেমন মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে, রাষ্ট্রপতি নাসেরের ভাষায় সেটা হল শিল্পযোজনায় কিছুটা অতি ত্বরার ফল।

কৃষিক্ষেত্রে পরিস্থিতির উপর শিল্পোন্নয়নের নির্ভরশীলতা অন্যান্য ভাবেও প্রকাশ পায়। যেমন, কৃষি উন্নয়নে পিছিয়ে পড়া অবস্থার দরুন ক্রমবর্ধমান দেশীয়-শিল্পোৎপন্নের দেশীয় বাজার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া মন্দিত হয় এবং মুদ্রাস্ফীতির ঝোঁক দেখা দিতে পারে, এটা সুনির্দিষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। তার উপর, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান শিল্পের জন্যে কাঁচামালের একটা মূল্যবান উৎস হল কৃষি। এর উলটো সম্পর্কটাও নিশ্চয়ই সমানই গুরুত্বসম্পন্ন: কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম, সার আর কীটঘ্নের যোগান এবং খাদ্যসামগ্রী আকারণের মতো সমস্যাগুলির কার্যকর সমাধান নির্ভর করে শিল্পোন্নয়নের মাত্রার উপর।

তেমনি, দেশীয় এবং বৈদেশিক বাজারের জন্যে উৎপাদনকারী শিল্পগুলির মধ্যে বিদ্যমান অনুপাত বদলাবার সমস্যাটারও কোন সহজ-সরল সমাধান নেই। আমরা আগে বারবার দেখিয়েছি, সমস্ত রপ্তানি আর আমদানির কারবার উন্নয়নশীল দেশগুলির নেহাত কম লোকসানের কারণ নয়, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, তা ছেড়ে দেওয়াই বুঝি যুক্তিসম্মত হবে। তেমনটা করা হলে ঘটনা-পরম্পরা যা দাঁড়াতে পারে সেটা এই রকমের: রপ্তানির শিল্পগুলিতে উৎপাদন ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়; এইভাবে ছাড়া পাওয়া উৎপাদনের উপকরণ দেশীয় বাজারের জন্যে উৎপাদনে লাগানো হয়; জাতীয় শিল্প সৃষ্টি এবং কৃষির পুনরুজ্জীবনের ফলে বিদেশ থেকে যেকোন

আমদানি ছাড়াই চলা সম্ভব হতে পারে। চিন্তার এই ধারাটায় ফ্যাসাদ হল এই যে, এটা হয়ত নিছক আকাশকুসুম কল্পনাই, কিন্তু বিভিন্ন দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং হঠকারী তত্ত্বের সঙ্গে এর বিস্তর মিল আছে। বহির্বাণিজ্য যেকোন দেশেরই জাতীয় অর্থনীতির একটা অপরিহার্য উপাদান। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির বেলায়, রপ্তানি কমাতে বলার অর্থ হল এই দেশগুলির স্বার্থ অগ্রাহ্য করা — কেননা, বৈদেশিক মুদ্রার একটা সূত্র হিসেবে রপ্তানি থেকে আয় তাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; আর আমদানি কমিয়ে ক্রমে তা বন্ধ করতে বলা তো শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলিতে উৎপন্ন সুফলপ্রদ যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামের ব্যবহার ছাড়াই এই দেশগুলিকে চলতে বলবারই স্যামিল।

কাজেই, উন্নয়নশীল দেশগুলির বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'বহুমুখীকরণ' বলতে ঐ বাণিজ্যের বহুমুখীকরণই বুঝায় — ঐ বাণিজ্য ছেড়ে দেওয়া বুঝায় না। রপ্তানির ক্ষেত্রে বহুমুখীনতা বলতে বুঝাতে পারে বৈদেশিক বাজারে সরবরাহ করা দ্রব্যসামগ্রীর রকম বাড়ানো, সেগুলির মধ্যে থাকবে শুধু কাঁচামাল নয়, আরও থাকবে গোড়ার দিকে বিভিন্ন আধা-সারা পণ্য এবং পরে বিভিন্ন স্থানীয় আকারণশিল্পোৎপন্ন। কোকো-শিম রপ্তানি আর চকলেট রপ্তানির মধ্যে পার্থক্য আছে: চকলেট রপ্তানিতে উৎপাদের ইউনিট পিছু আয় হয় বেশি। আমদানির ক্ষেত্রে বহুমুখীকরণ বলতে বুঝাতে পারে যে, খাদ্যসামগ্রী, টেক্সটাইল, বিলাসদ্রব্য কিংবা কাঁচামালের মতো দফাগুলো এবং আরও বহু জিনিসের উৎপাদন দেশে সংগঠিত হলে যথাসময়ে সেগুলিও আমদানি থেকে যখন বাদ দেওয়া যাবে, তখন জোরটা সরে যাবে অপেক্ষাকৃত জটিল বিভিন্ন আকারণশিল্পোৎপন্ন আমদানির উপর — যেসব জিনিসের উৎপাদনের অভিজ্ঞতা আর কৃৎকৌশল এখন অন্যান্য দেশেরই বেশি।

এইভাবে মোটামুটি বিবৃত করলে বিষয়টাকে সহজ-সরলই মনে হয়। কিন্তু, কোন উন্নয়নশীল দেশ নিজ জাতীয় অর্থনীতির বহুমুখীকরণের কাজ হাতে নিলে দেশটির সামনে করণীয়গুলো যতই স্পষ্ট হোক না কেন, বাধাবিঘ্নও থাকে অসংখ্য; এইসব বাধাবিঘ্ন কিভাবে অতিক্রম করা হবে তারই উপর ব্যাপারটায় সাফল্য নির্ভর করে।

যেমন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ হলে এত রকমের স্বতঃপ্রতীয়মান সুবিধা পাওয়া যায় যার জন্যে তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশই অনেক আগে থেকে তাদের রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলির তালিকা বাড়াতে আরম্ভ করেছে। তবু,

তাদের সাফল্য যা হয়েছে সেটা মাঝারি ধরনেরও কম। তার কারণটা রয়েছে এখানে: বহির্বাণিজ্য এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলি কোনক্রমেই পরিস্থিতির নিয়ন্তা নয়। এই দেশগুলির রপ্তানির দুই-তৃতীয়াংশ যায় অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে — প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পশ্চিম ইউরোপে। কিন্তু সেখানে এইসব রপ্তানি করা পণ্যের উপর সাধারণত শুল্ক ধার্য করা হয়, — উন্নয়নশীল দেশগুলির রপ্তানির বহুমুখীকরণ যাতে রোধ করা যায় ঠিক সেইভাবেই ধার্য হয় ঐসব শুল্ক। ফলে, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সরকারী তথ্য অনুসারেই দেখা যায়, আকারণ না করা বিভিন্ন প্রাথমিক পণ্যই উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানির ৮৮ শতাংশ (১৯৬৬ সালের তথ্য)। অর্থাৎ কিনা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় দুনিয়া থেকে রপ্তানি হয় প্রায় সবটাই বিভিন্ন প্রাথমিক পণ্য।

মনে হতে পারে উন্নয়নশীল দেশগুলির বুঝি রপ্তানি করার মতো অন্য কিছু নেই। কিন্তু, ব্যাপারটা তেমন নয়। কেবল উৎপন্ন জিনিস নয়, উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে আমদানি করা অর্ধোৎপন্ন জিনিসেরও

১২ নং সারণী

অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে আমদানি করা অর্ধোৎপন্ন এবং আধা-আকারণ করা উৎপাদিত বস্তুর উপর ধার্য শুল্ক (%)

না-শু — নামিক শুল্ক

আ-শু — আসল শুল্ক

উৎপাদিত বস্তু	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র		বৃটেন		বারোয়ারী বাজারের রাষ্ট্রগুলি		সুইডেন		জাপান	
	না-শু	আ-শু	না-শু	আ-শু	না-শু	আ-শু	না-শু	আ-শু	না-শু	আ-শু
আধা-আকারিত	৮·৮	১৭·৬	১১·১	২৩·১	৭·৬	১২·০	৩·০	৫·৩	১১·৪	২৩·৮
আকারণ না-করা	১৫·২	২৮·৬	১৭·২	৩৪·৩	১৩·৩	২৮·৩	৮·৫	২০·৮	১৬·৬	৩৪·৫

উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র কী চড়া হারে শুল্ক ধার্য করে সেটা এখানকার সারণী থেকে দেখে নিয়ে পাঠক বোধহয় নির্ভুল সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারবেন।

এই সারণীটাকে বিচার-বিশ্লেষণ করার সময়ে মনে রাখা দরকার যে, অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির বাজারে আকারণ না-করা কাঁচামাল সাধারণত বিনা-শুল্কেই নেওয়া হয়, কোন বাধা-নিষেধ থাকে না। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যেন ঐসব রাষ্ট্রের সরকারগুলো তৃতীয় দুনিয়ার রপ্তানিকারীদের বলে দিয়েছে: তোমাদের প্রাথমিক পণ্যদ্রব্য আমরা নেব, তবে সেগুলোর আকারণের জন্যে যদি শিল্প স্থাপন করো তাহলে কিন্তু তোমাদের আকারণ-করা পণ্যগুলো আমাদের বাজারে সহজে ঢুকতে পাবে বলে আশা কোরো না যেন।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি যখনই তাদের আর্থনীতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করে অমনি দেখা দেয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাধা-বিপত্তি — সেগুলির প্রকৃতি হয় কিছুটা রাজনীতিক সংঘাতের মতো।

বহুমুখীকরণের আর একটা দিক বিচার-বিশ্লেষণ করলেও অনেকটা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে উন্নয়নশীল অর্থনীতিক্ষেত্রে শিল্প আর কৃষির মধ্যে যেকোন অনুপাতই স্থাপিত হোক না কেন, স্পষ্টতই, তাদের আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপে ঝোঁকটা তো মোটের উপর শিল্পের জন্যে বৃহত্তর অংশের দিকেই হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে সংগত প্রশ্ন ওঠে: উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈদেশিক মুদ্রার সম্বল-সংস্থান কি যথার্থই বহুমুখীকরণের স্বার্থে এবং, আরও সুনির্দিষ্টভাবে, সেক্ষেত্রে শিল্পের অংশ বাড়াবার স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে এর দুটো অঙ্গ-উপাদান বিশ্লেষণ করা দরকার, এই অঙ্গ-উপাদান দুটো হল — (ক) কোন দেশের **নিজস্ব** বৈদেশিক মুদ্রা পরিসম্পতের ব্যবহার, এবং (খ) **ধার-করা** বৈদেশিক মুদ্রার কিংবা যে বৈদেশিক মুদ্রার উপর কিছু পরিমাণ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ আছে তার ব্যবহার। অর্থাৎ কিনা, কোন দেশের রপ্তানি থেকে আয় এবং বিদেশ থেকে পাওয়া ঋণ আর অনুদানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে। রপ্তানি থেকে আয় করা অর্থ কিভাবে আমদানির জন্যে ব্যয় করা হয় সেটা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিভিন্ন জাতীয় শিল্প গড়া এবং সম্প্রসারিত করার

জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বিভিন্ন জিনিস পাবার জন্যে সেই অর্থ যথার্থই এবং ক্রমেই বেশি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে অর্থনীতির এবং সেই অর্থনীতিক্ষেত্রে বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগের গড়নের মধ্যে তুলনা করতে গেলে চোখে পড়ে ভিন্ন চিত্র। দেখা যায়, মোটের উপর, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অর্থনীতিতে শিল্পগত ছাঁদের চেয়ে ঐ বৈদেশিক ব্যক্তিগত বিনিয়োগের গড়ন ঢের বেশি ধীরে পরিবর্তিত হয়।

মোটের উপর সিদ্ধান্ত তো এমনই হয় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলির শিল্পযোজনার ক্ষেত্রে বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজি চালিকাশক্তি নয়। বড় জোর বলা যায়, ঐ পুঁজি ঐ প্রক্রিয়াটার সঙ্গে মানিয়ে নেয়। সাধারণভাবে, তৃতীয় দুনিয়ায় বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগের ধাঁচটা পুরন ঔপনিবেশিক ধাঁচেই চলতে চায়, আর উন্নয়নশীল দেশগুলির সৃজনশীল কর্মোদ্যম খাটানো হয় তাদের জাতীয় অর্থনীতি বহুমুখীকরণের কাজে।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির অর্থনীতির চিরাচরিত, ঔপনিবেশিক শাখাগুলির দিকে আকৃষ্ট হয়ে বৈদেশিক পুঁজি স্থানীয় পরিসম্পতের একটা মোটারকমের অংশকে সংশ্লিষ্ট জাতীয় অর্থনীতি বহুমুখীকরণের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে সরিয়ে দেয়। তবু, বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজির কাজের ধারা সম্বন্ধে অন্তত এ কথা বলা চলে যে, যেসব স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি বাজার নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলিই প্রায়-সম্পূর্ণত না হলেও বহুলাংশে ঐ ধারাটাকে প্রভাবান্বিত করে — তাই, ঐ পুঁজির ক্রিয়াকলাপের ফলাফলটাকে কারও বিদ্বেষপ্রসূত হিসেবে দেখা চলে না। তবে, অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলি যেসব সরকারী ক্রেডিট এবং অনুদান পায় সেগুলি সম্বন্ধে ঐ কথা বলা চলে না — যদিও, গড়নের দিক দিয়ে, গ্রহীতা দেশগুলির যা প্রয়োজন তার পক্ষে সেগুলি সমানই অনুপযোগী; সংশ্লিষ্ট দেশগুলির শিল্পযোজনা এবং বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা দিয়েই ঐ প্রয়োজন নির্ধারিত হয়।

বিভিন্ন অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে এখন যেসব সরকারী ক্রেডিট এবং অনুদান যায় সেগুলি আবার কার্যত সেই ঔপনিবেশিক আমলে স্থাপিত ধাঁচেই বিভিন্ন খাতে চালিত হয়।

অন্যান্য উপায়ের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতির বহুমুখীকরণের পথে আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় উন্নয়নশীল দেশগুলি যে অগ্রসর

পঁুজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আর্থনীতিক কর্মনীতি দিয়ে সৃষ্টি-করা বাধাবিপত্তির মধ্যে পড়তে থাকে, এতে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মুশকিল হচ্ছে এই যে, বহুমুখীকরণের জন্যে অন্যান্য বাধাবিপত্তিও অতিক্রম করা চাই: খাস উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই বিদ্যমান বিভিন্ন চলতি সামাজিক আর আর্থনীতিক অবস্থা থেকে সেগুলি উদ্ভূত হয়।

তৃতীয় দুনিয়ার আমদানি বহুমুখীকরণের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, আমদানির তালিকা থেকে যেসব দফা বাদ দেওয়া যায় সেগুলির একটা হল বিলাসদ্রব্য। স্পষ্টতই, জনসংখ্যার সম্পন্ন স্তরগুলির পক্ষে এটা হবে উদ্বেগের বিষয় — কাজেই, তার ফলে সামাজিক সংঘাত দেখা দিতে পারে। তবে, জাতির স্বার্থ অনুসারে আর্থনীতিক পুনঃসংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রমবর্ধমান সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের প্রক্রিয়ার মধ্যে সেটা হবে মাত্র একটা গৌণ ব্যাপার। যা-ই হোক না কেন, বহুমুখীকরণে সামাজিক সম্পদের উপর আরও টান পড়বে এবং অনিবার্যভাবেই প্রশ্ন উঠবে: প্রয়োজনীয় অর্থের বেশির ভাগটা দেবে কোন কোন সামাজিক স্তর? বিত্ত-সম্পত্তিবান, বিশেষসুবিধাভোগী স্তরগুলিকে সেটা দিতে বলা হলে তারা খুব সম্ভব একটা প্রতিক্রিয়াপন্থী বিরোধী পক্ষ সংগঠিত করবে। তার ফলে যে পরিস্থিতি দেখা দেবে তাতে প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তিগুলি জন-স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, তারপর বিভিন্ন রাজনীতিক বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী, সেগুলির পরিণতি অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে হবে বিভিন্ন।

নিছক আর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, বহুমুখীকরণের ফলে এমনসব সমস্যা দেখা দেবে যেগুলির কোন সহজ-সরল সমাধান থাকবে না। যেমন, আমদানির উপর যাতে নির্ভরশীলতা কমে এমনভাবে দেশীয় শিল্পোৎপাদন সংগঠিত করা হলে, এই রকমের বিভিন্ন 'আমদানিবিরোধী' শিল্পের পাশাপাশি উপযুক্ত অনুপূরক বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট শিল্প সৃষ্টি করা না হলে একেবারে বিপরীত ফলই ঘটতে পারে। বিভিন্ন 'আমদানিবিরোধী' শিল্প উন্নয়নের বিষয়টাকে এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা না হলে আমদানি-করা কাঁচামাল, অর্ধোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী এবং শিল্পোৎপাদনের অন্যান্য অঙ্গ-উপাদানের বাবত অযৌক্তিকযুক্ত অতি মাত্রায় খরচ পড়ে যেতে পারে। ১৯৫০—১৯৬৫ সালের কালপর্যায়ে মোট আমদানিতে এই ব্যয়ের অংশটা বেড়েছিল আর্জেণ্টিনায় ৪৪ থেকে ৫২ শতাংশ, ব্রেজিলে ৩৪ থেকে ৪৬ শতাংশ, ভেনেজুয়েলায় ২২ থেকে ২৯ শতাংশ। ভারতে তৃতীয় পাঁচসালা

পরিকল্পনায় দেশীয় শিল্পোৎপাদনের প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় আমদানি-করা জিনিস বাবত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় প্রাথমিক হিসাব অনুসারে হয়েছিল আমদানি-করা নতুন মৌলিক সরঞ্জাম বাবত ব্যয়ের প্রায় দ্বিগুণ। তার উপর, উৎপাদন এবং দেশীয় বাজারের সামগ্রিক সম্প্রসারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে না-বহুমুখী শিল্পোন্নয়ন আর্থনীতিক বিচারে কম লাভজনক। এই-ভাবেও আবার যুক্তিসম্মত অনুপাত বজায় রাখার সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে — এক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত ভারসাম্য চাই আমদানি শিল্প এবং 'আমদানি-বিরোধী' শিল্পগুলির মধ্যে।

জাতীয় অর্থনীতি বহুমুখীকরণ প্রসঙ্গে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির আরও একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করা চাই -- সেটা হল পুঁজিবহুল এবং শ্রমবহুল শিল্পের মধ্যে অনুপাত। কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা বহুমুখী প্রতিষ্ঠানকে অসাধারণ শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিসম্পন্ন আধুনিক জনিত্র দিয়ে সজ্জিত করা হলে সেটাকে বলা হয় পুঁজিবহুল। আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে প্রচেষ্টার মধ্যে শ্রমের জাতীয় উৎপাদিকাশক্তি বাড়ানো উন্নয়নশীল দেশগুলির মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয় — তাই, এই রকমের শিল্প গড়ে তুলতে এই দেশগুলির তো বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হবারই কথা। কিন্তু, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে বাস্তবে যে অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তাতে উঁচু মাত্রায় উৎপাদনশীল পুঁজিবহুল শিল্পায়তন গড়াকে অগ্রাধিকার দেবার কর্মনীতি এবং এই রকমের কল-কারখানার নির্মাণ, সজ্জা আর ব্যবহারের খাতে সমস্ত জাতীয় সম্পদ-সংস্থান চালান করার ফলে ইতোমধ্যেই কণ্টকর বেকার-সমস্যা আরও সঙ্গিন হয়ে উঠতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলির শহর আর গ্রামাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই ইতোমধ্যেই আপেক্ষিক অতিপ্রজতা রয়েছে। নিযুত নিযুত মানুষ ঘুরছে কাজের সন্ধানে: গ্রামাঞ্চলগুলিতে ভূমির অভাব আর অযৌক্তিক বণ্টনের দরুন বহু কর্মক্ষম কৃষক 'বাড়তি' হয়ে রয়েছে, আর শহরাঞ্চলে অনগ্রসর কিংবা আদিম ধরনের শিল্পগুলিতে নিয়োগের সুযোগ-সম্ভাবনা কমই — ফলে, শহরের বিরাটসংখ্যক বাসিন্দা কাজ পায় না, মাঝেসাঝে এখানে-ওখানে কিছু পয়সা রোজগারের সম্ভাবনার উপরই তাদের নির্ভর করে থাকতে হয়।

বিষয়টা স্পষ্ট করে তোলার জন্যে একটা প্রকল্পিত দৃষ্টান্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। ধরা যাক, বিভিন্ন অতি-আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে একটা কারখানা গড়ে সেটাকে সজ্জিত করা হয়েছে, তাতে একটা

নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিস উৎপন্ন করতে শ্রমিক লাগে ২০০ জন। কিন্তু, যদি কিছুটা কম আধুনিক সরঞ্জাম বসানো হত তাহলে সেই একই পরিমাণ জিনিস উৎপন্ন করতে শ্রমিক লাগত ২,০০০ জন। এইভাবে দেখা যাচ্ছে, অতি-আধুনিক সরঞ্জাম বসানোর ফলে জাতীয় শিল্পযোজনার ক্ষেত্রে সেটা হল একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান, কিন্তু বেকারি দূর করার কাজে তার অবদান নামে-মাত্র। বিকল্প ব্যবস্থায় ফলাফল হত তার উল্টো: বেকারি দূর করার কাজে বেশকিছুটা আনুকূল্য, আর জাতীয় শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি উন্নীত করার কাজে মাত্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপ।

না, এটা একটা দুষ্ট চক্র নয়। এ অবস্থা থেকে বের হবার উপায় আছে, কিন্তু উপায়টা আছে একমাত্র যদি যেকোন চরমপন্থা বাতিল ক'রে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটো ঝোঁকই বিবেচনায় রেখে সমাধানের চেষ্টা করা হয়: শ্রমের উচ্চতর উৎপাদিকাশক্তির দিকে ঝোঁক এবং বেকারি দূর করার দিকে ঝোঁক। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, তাইই আসলে করা হচ্ছে ভারতে — সেখানে উঁচু মাত্রায় উৎপাদনশীল বিভিন্ন আধুনিক শিল্পায়তন গড়ার সঙ্গে সঙ্গে, যাকে বলা হয় কুটিরশিল্প তাতেও সাহায্য দেবার ব্যবস্থা আছে — এইসব শিল্পে সুতো, কাপড় এবং আরও বহু রকমের জিনিস উৎপাদনে বহুসংখ্যক শ্রমিক কাজ পায়।

বিষয়টাকে একটু অন্য দিক দিয়ে দেখলে, এটা হল বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে ভারি আর হালকা শিল্পের মধ্যে উপযুক্ত অনুপাত বজায় রাখার ব্যাপার। আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি রয়েছে বলে কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে শুরুতেই ভারি এবং হালকা দু'রকমের শিল্পই গড়া সম্ভব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই রকমের সমাধান জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য শাখায় কল-কারখানার আধুনিকীকরণের সহায়ক হয়। দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশের বেলায়, একদিকে সম্পদ যা ব্যবহার করা সম্ভব তার সীমাবদ্ধতা এবং অন্যদিকে চাহিদার গড়নের কথা বিবেচনায় রেখে বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি ধারাবাহিক পর্বে দু'রকমের শিল্পের মধ্যে উপযুক্ত অনুপাত নির্ধারণ করা নিয়েই সমস্যাটা।

স্থানীয় উৎপন্ন কৃষিজাত কাঁচামালের আকারণের কাজে লাগানো হয় বহু হালকা শিল্প — এইভাবে এইসব শিল্প কৃষি উন্নয়নের সহায়ক হয়। হালকা শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্যপণ্যের আমদানি ক্রমে কমানো যায়, বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্প মজুদের খরচ কমাতে সেটা সহায়ক। সাধারণত

হালকা শিল্পে পর্নজি বিনিয়োগ করতে হয় অপেক্ষাকৃত কম, এই শিল্পের জন্যে কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়াও অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল। তার উপর, এই রকমের বিনিয়োগ উঠে আসে আরও তাড়াতাড়ি, এইভাবে সঞ্চিত তহবিলের বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। আবার, শ্রমবহ্নল হবার ফলে হালকা শিল্প কর্মে-নিয়োগও বাড়ায়। কাজেই, হালকা শিল্পায়তনগন্নলির বাজার সীমাবদ্ধ হলেও এইসব শিল্প নিজেরাই নিজেদের খরচ চালাতে পারে।

হালকা শিল্পের উন্নয়ন তৃতীয় দর্নিয়ার বেশির ভাগ দেশেরই সম্বল-সংগতির নাগালের মধ্যে হলেও এই শিল্প আপনাতেই জাতীয় শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির মাত্রা দ্রত বাড়াবার জন্যে যথেষ্ট নয়।

যেসব শিল্পে যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম উৎপন্ন হয় সেগর্নলিই প্রযর্ক্তিগত এবং আর্থনীতিক অগ্রগতির চালিকাশক্তি। প্রত্যেকটি দেশে না হলেও, অন্তত, পারস্পরিক আর্থনীতিক সহযোগিতা-চুক্তিবদ্ধ দেশ-সমষ্টির ভিতরে উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদনে সর্বাগ্রাধিকার দেওয়া হলে, একমাত্র তবেই দ্রত আর্থনীতিক উন্নয়ন সমানে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনের বিশেষজ্ঞদের মতে, যেকোন কারণেই হোক না কেন উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদনের প্রসার না ঘটাবার সিদ্ধান্তের 'অর্থ হল আর্থনীতিক ক্রমবৃদ্ধির সবচেয়ে সক্রিয় সর্যোগসর্বিধার কিছর কিছর সম্বন্ধে অবহেলা করা'।*

ভারি শিল্পের উন্নয়ন অবশ্য সরলও নয়, সহজও নয়। এতে দরকার হয় মোটা টাকার বিনিয়োগ, তাতে আগম হয় দেরিতে, এতে আরও লাগে দামী দামী আমদানি-করা সরঞ্জাম, উঁচু মাত্রায় দক্ষ বহর বিশেষজ্ঞ এবং বিস্তৃত বাজার। বৈজ্ঞানিক এবং প্রযর্ক্তিগত অগ্রগতিবেগ বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়তনগর্নলির যথোপযর্ক্ত আকার সাধারণভাবে বাড়বার প্রবণতা দেখা দেয় এবং বহর্মর্খী শিল্পায়তন অর্থাৎ পরস্পর-সম্পর্কযর্ক্ত বিভিন্ন শিল্পের বিভিন্ন জোটের প্রয়োজন দেখা দেয়। ভারি শিল্প সন্দেহাতীত-ভাবেই শ্রমবহর্ল হবার চেয়ে বেশি মাত্রায় পর্নজিবহর্ল — কাজেই, শর্রর্তে এই শিল্প বেকারি দ্রর করতে হালকা শিল্পের চেয়ে কম সক্ষম। তবে, এইসব সমস্যার ফলে আর্থনীতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভারি শিল্পের কল্যাণপ্রভাব কোনক্রমেই কমে না, বরং উন্নয়নের পরপর প্রত্যেকটা পর্বে

* Trade Expansion and Economic Integration Among Developing Countries (TD/B/85, Aug. 2, 1966), p. 10.

বিভিন্ন প্রয়োজন এবং সুযোগ-সম্ভাবনা খুঁটিয়ে তুলনা করে দেখবার প্রয়োজনটাই শুধু দেখিয়ে দেয়।

মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে, অল্প কয়েকটি বড় উন্নয়নশীল দেশ ছাড়া অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ আধুনিক মূল ভারি শিল্প-জোট গড়ে তুলতে এবং তার বাঞ্ছিত কার্যকর সদ্ব্যবহার করতে পারে না। আন্তর্জাতিক কর্মবিভাগের প্রকৃত ছাঁদ আর প্রবণতা অনুসারে পরপর প্রত্যেকটা পর্বে মূল শিল্পগুলি বেছে নেওয়া বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়ার গোড়ার দিককার পর্বগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদ কি পাওয়া যায় না-যায় তার উপর অনেককিছু নির্ভর করে। যেমন, তৈলে সমৃদ্ধ দেশগুলিতে বিভিন্ন তৈল-রাসায়নিক শিল্প-জোট গড়ে তুলে শিল্পে দ্রুত অগ্রগতি নিশ্চিত করা যেতে পারে। পরবর্তী পর্বগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্পের গড়নের উপর আর তত প্রবল প্রভাব বিস্তার করবে না। তার জায়গায় শিল্পগত অগ্রগতির জন্যে দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থনীতিক ক্ষমতা আর বাজারের পরিসর, শ্রমিকবাহিনীর দক্ষতা, ইত্যাদি উপাদানই আরও বেশি প্রভাব বিস্তার করবে।

অপেক্ষাকৃত ছোট দেশগুলির বেলায় আঞ্চলিক এবং উপ-আঞ্চলিক আর্থনীতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার উপরই বিভিন্ন ভারি শিল্প প্রকল্পের সম্ভাবনা বহুলাংশে নির্ভর করবে।

জাতীয় অর্থনীতি বহুমুখীকরণের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমাদের এই পর্যালোচনা থেকে নিম্নলিখিত সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি আসছে:

এক, এই সমস্যাটা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং সংস্কারের চেয়ে বেশি কিছু; উন্নয়নশীল দেশগুলি এবং অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রটা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তার অন্যথা হয় না।

দুই, বহুমুখীকরণ মূলত একটা আর্থনীতিক সমস্যা — তাই, এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অনিবার্যভাবেই বিভিন্ন সামাজিক শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-বিরোধ আর সংঘাত প্রকোপিত হয়।

উপরে যে দুটো দফা মন্তব্য করা হল তার অর্থ এই যে, বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়ায় তৃতীয় দুনিয়াকে বিভিন্ন আর্থনীতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে শুধু তাই নয়, — আভ্যন্তরিক এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক আর রাজনীতিক সিদ্ধান্তও নিতে হবে।

তিন, যথাতথ আর্থনীতিক দিক দিয়ে বহুমুখীকরণের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কভাবে চলা দরকার। কোন ব্যতিক্রমহীন ছকে-বাঁধা ব্যবস্থাপত্র দিয়ে কাজ চলবে না। বহুমুখীকরণের আগে বিদ্যমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র অনুসারে বিভিন্ন সযত্ন এবং আদ্যোপান্ত হিসাবাদি করে নেওয়া চাই।

৩। পরিকল্পিত অর্থনীতি বনাম অবাধ বাজার

আর্থনীতিক স্বাধীনতা এবং সাধারণভাবে অনগ্রসর অর্থনীতির মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ, এমনকি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধটার কথা ইতোমধ্যে বারবার বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোন দেশের আর্থনীতিক নির্ভরশীলতা ঘটাবার জন্যে দায়ী সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান হল জাতীয় শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির নিচু মাত্রা। শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির দিক থেকে দেখলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি এক-শ' কিংবা হয়ত দেড়-শ' বছর আগে যে স্তরে ছিল, এখন তৃতীয় দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশ সেই একই স্তরেই রয়েছে, এমনটা বললে কিছু অতিশয়োক্তি হবে না। তবে, তখনকার দিনের ইউরোপে আর্থনীতিক অনগ্রসরতা অতিক্রম করা কিংবা আর্থনীতিক স্বাধীনতার জন্যে প্রচেষ্টার কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। এই রকমের বিভিন্ন করণীয় কাজ সূত্রবদ্ধ করা এবং সেগুলির জাতীয় গুরুত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি সাধারণভাবে বিশ শতকেরই একটা বিশেষ উপাদান — আরও যথাতথভাবে বললে — ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে যুগের সূচনা করল তারই একটা বিশেষ উপাদান। মানবজাতির ভাগ্যের ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের ক্রিয়া খুবই বিবিধ এবং বিস্তৃত, কিন্তু, সামাজিক জীবন যে সচেতনভাবে পরিচালিত করা যায়, এটা হল এই বিপ্লবের একটা শিক্ষা।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবধি সারা পৃথিবীতে ছিল পুঁজিতন্ত্র আর ব্যক্তিগত কারবারের রাজত্ব, জাতীয় অর্থনীতির উপর খাটত আর্থনীতিক নিয়মাবলি বা আর্থনীতিক শক্তিগুলির অবাধ ক্রিয়া। আর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন দেশ অন্য কোন দেশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলে সেটা হত ঐসব নিয়ম বা শক্তির অনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়ার ফলে। আর্থনীতিক ব্যবস্থাটাকে মূলগতভাবে পুনঃসংগঠিত করার কাজ সুচিন্তিতভাবে হাতে নিল পৃথিবীতে সেই প্রথম দেশ সোভিয়েত রাশিয়া।

প্রবল বেগে আর্থনীতিক উন্নয়ন এবং প্রধান প্রধান পঁুজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগাল ধরা আর শেষপর্যন্ত সেগুলিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার কাজ হাতে নিল সোভিয়েত রাশিয়া। চতুর্থ দশকে প্রথম প্রথম সোভিয়েত পাঁচ-সালা পরিকল্পনাগুলির সাফল্য দেখে পৃথিবীর সর্বত্র কোটি কোটি চিন্তাশীল মানুষ চমকে গেল। পঁুজিতান্ত্রিক পশ্চিম যখন মহা মন্দার যন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্র সমানে দ্রুত এগিয়েই চলল, উৎপাদন কমানো হল না একটুও, কোন উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত পড়ে থাকল না, কোন বেকারি কিংবা ঢিলেমির কোন উদ্বেগ রইল না। চতুর্থ দশকেই বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা নিজেদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে সতর্ক পুনর্বিবেচনা আরম্ভ করেছিল। তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান বিশারদেরা আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা না হলেও কোন না কোন উপায়ে অন্তত নিয়মনের প্রয়োজন সম্বন্ধে যুক্তি দিতে আরম্ভ করলেন। আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে অরাজকতাটাকে পঁুজিতন্ত্র দেখত স্বাধীনতার একটা অভিব্যক্তি হিসেবে — সেই অরাজকতার কুৎসিত দিকটা সহসা উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। 'অবাধ ব্যক্তিগত কারবার' ঘিরে ছিল যে পবিত্রতার ছটা সেটা ম্লান হয়ে গেল, উবে গেল।

একটা ধারণা হিসেবে পরিকল্পনা পশ্চিমী আর্থনীতিক পরিচিন্তনের মধ্যে চুইয়ে চুইয়ে ঢুকতে থাকল — সেটা দীর্ঘকাল যাবত চলল বৃহৎ কারবারিদের হন্যে বিরোধিতার মুখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা পশ্চিম ইউরোপে পরিকল্পনার পক্ষে কথা বললে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কমিউনিস্ট লেবেল পেতে হত, তাতে ঝুঁকি ছিল।

নিকট অতীতের এইসব তথ্য লক্ষণীয় — কেননা, পৃথিবীতে এমন দেশ কমই আছে যেখানে কোন না কোন রকমের আর্থনীতিক উন্নয়ন কর্মসূচি নেই — এমন কর্মসূচিকে প্রায়ই বলা হয় জাতীয় পরিকল্পনা। এগুলি খুবই বিভিন্ন ধরনের — তার প্রত্যেকটারই প্রবল উৎসাহী প্রবক্তারা আছে, তারা অবিরাম এবং প্রায় উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে যায়। তাদের তর্ক-বিতর্কের মর্মের বিষয়টা না ধরেও সেগুলি সম্বন্ধে একটা গুরুত্বসম্পন্ন তথ্য উল্লেখ করা দরকার: পরিকল্পনা থাকা দরকার কিনা সেটা নয় বিতর্কের বিষয়; এমন পরিকল্পন হবে কি রকমের সেটাই বিতর্কের বিষয়।

তৃতীয় দুনিয়ার বেলায়, আর্থনীতিক জীবনে পরিকল্পন এসে গেল জয়যুক্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষে। রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্যে

সংগ্রামের কর্মসূচিতে একটা দফা ছিল পরিকল্পনা। তার একটা খাসা দৃষ্টান্ত হল সুবিদিত 'বোম্বাই পরিকল্পনা' (১৯৪৩), সেটা ছিল আর্থনীতিক ব্যবস্থার একটা কর্মসূচি, — ভারতে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মহল সেটাকে স্বাধীনতার পরে হাতে নিতে মনস্থ করেছিলেন।

আর্থনীতিক প্রক্রিয়াগুলোর সচেতন পরিচালনের নীতি হিসেবে পরিকল্পন হল অবাধ কারবারের চিরাচরিত পুঁজিতান্ত্রিক নীতির ঠিক বিপরীত। তবু, এখন দেখা যাচ্ছে, রাজনীতিক মুক্তির অবস্থায় আর্থনীতিক উন্নয়নের পদ্ধতি বেছে নেবার বেলায় প্রাক্তন উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলি পরিকল্পনের পথ ধরছে, জাতীয় অগ্রগতির জন্যে পরিকল্পনের গুরুত্ব মেনে নিচ্ছে, — তাদের দৃষ্টিতে পুঁজিতন্ত্র যে বেশকিছুটা অপদস্থ হয়ে গেছে তারই একটা লক্ষণ এটা। গত পঞ্চাশ বছর যাবত বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে সাধারণ সংকটে পড়ে গেছে তারও একটা লক্ষণ এটা।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া দরকার। উপনিবেশবাদীরা এইসব দেশের জন্যে রেখে গেছে যেসব জটিল আর্থনীতিক সমস্যা সেগুলির সমাধান কি অবাধ বাজারের বন্দোবস্তের মধ্যে ছেড়ে রাখা চলে? ব্যক্তিগত কারবারের উপর কোন সংযমনও খাটে না, নিয়মনও খাটে না— এই ব্যক্তিগত কারবার কি এই দেশগুলির জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাতে পারে? তৃতীয় দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশই এই দুটি প্রশ্নেই 'না' জবাব দিয়েছে। জোরটা অবশ্য এক-এক ক্ষেত্রে এক-এক রকমের হয়েছে। কেউ কেউ 'না' বলেছে জোরাল গলায়, আবার কেউ কেউ সুর একটু নামিয়ে বলেছে 'না, কিন্তু তবু...' কিংবা 'না, যদি-না...'।

পরিকল্পন সম্বন্ধে বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনীতিক শক্তির মনোভাবে এইসব তারতম্য যে তাদের বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেটা চট করেই বোঝা যায়। পরিকল্পনের কিংবা আর্থনীতিক কার্যকরণের ক্ষেত্রে যেকোন রকমের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতায় নেতৃত্ব করে সাধারণত সামন্ততান্ত্রিক মহল এবং বড় পুঁজিপতিরা। তাদের শ্রেণী-স্বার্থ জাতীয় প্রগতির লক্ষ্যের বিরোধী — সেটা খুবই বোধগম্য, কেননা, যেসব বৈষয়িক সম্পদে সমগ্র দেশের জরুরী প্রয়োজন তার বেশির ভাগ তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। রাষ্ট্র যদি দেশের কাজ-কারবারে সক্রিয় হস্তক্ষেপ করে তখন দেশের সম্পদ

জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে লাগানো হলে স্বভাবতই তারাই তাদের সম্পদের একটা অংশ থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু, অবাধ বাজার এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত কারবারের নীতি জয়যুক্ত হলে স্বভাবতই সমাজের বিত্ত-সম্পত্তিবান উচ্চতর স্তরের বিশেষ অধিকারের অমন কোন বিপদ দেখা দেবে না।

তবে, একথাও বলা দরকার যে, পরিকল্পনার এমন ঘোর বিরোধী উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তত বেশি নয়। জাতীয় অর্থনীতি নিয়মনের মূর্ত-নির্দিষ্ট বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজন জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যেও খুবই ব্যাপকভাবে স্বীকৃত — কেননা, তৃতীয় দুনিয়ায় গতিবেগ বজায় রেখে আর্থনীতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মতো উপযুক্ত শক্তি কিংবা উপায়-সংস্থান কোনটাই জাতীয় বুর্জোয়াদের খুব বড় অংশটার নেই। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আর্থনীতিক প্রগতির পথে যত বাধাবিঘ্ন আছে সেগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সহায়তার মুখাপেক্ষী না হয়ে এ'টে উঠতে বুর্জোয়ারা নিতান্তই অপারগ। এই কারণেই যেসব দেশে চালক বুর্জোয়ারা সেসব দেশে জাতীয় অর্থনীতির প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত উপায়-উপকরণ চালান করার কাজ দেওয়া হয় রাষ্ট্রের হাতে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাতীয় উৎপাদন সম্পদের একটা প্রধান অংশের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণই — সর্বোপরি এটাই — পরিকল্পন। জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচি অনুসারে বিভিন্ন মূল শিল্প প্রকল্প নির্মাণ এবং বিশেষভাবে গুরুত্বসম্পন্ন বলে বিবেচিত শিল্পগুলিতে উৎপাদন বাড়াবার খাতে ঐসব সম্পদ চালিত করে রাষ্ট্র।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দীর্ঘকাল যাবতই জাতীয় উন্নয়নের জন্যে অর্থনীতিগতভাবে সুযুক্তিপূর্ণ কর্মসূচি রচনা করাই পরিকল্পনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্যে বিশেষজ্ঞেরা বিজ্ঞান এবং প্রচেষ্টা নিয়োগ করেছেন, বহু ক্ষেত্রে বেশকিছু সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। তবে, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অর্থনীতিগতভাবে সুযুক্তিপূর্ণ কর্মসূচি রচনা করাই যথেষ্ট নয়। এশিয়া এবং দূর প্রাচ্যের জন্যে জাতিসংঘ আর্থনীতিক কমিশনের বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, এশিয়ার বহু উন্নয়নশীল দেশ বৃহদায়তনের বাস্তবতাসম্মত, বিশদ এবং সুসংগত পরিকল্পনা রচনার কাজ বেশ চমৎকারভাবেই করেছে। কিন্তু সেগুলির রূপায়ণ দেখা যাচ্ছে শ্লথ, অকার্যকর এবং অসম্পূর্ণ। এই রকমের কোন পরিকল্পনা না থাকলে যা পরিণতি ঘটতে পারত তার চেয়ে ঢের বেশি গুরুতর পরিণতিই ঘটতে

পারে এর ফলে। জাতিসংঘের অন্যান্য অঞ্চলগত সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞেরা এবং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞেরাও কম-বেশি এই একই ধারায়ই মন্তব্য করছেন।

এই পরিস্থিতির উদ্ভবের উৎসটা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিকল্পন সম্বন্ধে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আলোচনার মধ্যে একথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন পরিকল্পন সংস্থার সিদ্ধান্তগুলো ব্যক্তিগত-মালিকানাধীন ক্ষেত্রের উপর কোনক্রমেই বাধ্যতামূলক ছিল না। ব্যক্তিগত-মালিকানাধীন ক্ষেত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করার একমাত্র — সেটাও পরোক্ষ — উপায় ছিল দাম, কর, সুদের হার এবং আর্থনীতিক বন্দোবস্তের ঐ রকমের অন্যান্য উপাদানের প্রয়োগ।

কিন্তু, সাফল্য নিশ্চিত করার জন্যে ঐটুকুই কি যথেষ্ট? একজন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ স.ক. নাথ'এর রচনা থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটার মধ্যে যেন প্রশ্নটার স্পষ্ট উত্তর রয়েছে: 'দেশে যথেষ্ট বৃহদায়তনের মধ্য শ্রেণী থাকলে, এই মধ্য শ্রেণীর মধ্যে যথোপযুক্ত প্রাণবন্ত কাজ-কারবারী গ্রুপ থাকলে, আর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং আর্থনীতিক ব্যবস্থাদি থাকলে আর্থ এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবর্তনা যথেষ্ট হবার কিছুটা সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু, ভারত এইসব শর্ত পূরণ করে নি — নইলে এ দেশ কম-অগ্রসর থাকত না।'* এই লেখক ঠিক জায়গাটাতেই ঘা দিয়েছেন: আর্থনীতিক নিয়মনের বিভিন্ন পরোক্ষ পদ্ধতির ক্রিয়া ঘটতে পারে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতির শুধু খুবই সীমাবদ্ধ একটা ক্ষেত্রেই — সেটা হল জাতীয় অর্থনীতির সেই ক্ষুদ্র অংশ যেটা ব্যক্তিগত-মালিকানাধীন এবং যেটাকে মালিক পর্যাপ্ত মাত্রায় আধুনিক করে তুলেছে।

বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে লোক-বল এবং সম্ভাব্য উৎপাদনশক্তিগুলির সবচেয়ে বড় অংশটা ঐ আধুনীকিকৃত ক্ষেত্রের বাইরে। শহর আর গ্রামাঞ্চলের নিযুত নিযুত, প্রকৃতপক্ষে কোটি কোটি ছোট উৎপাদনকারীর আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোন রাষ্ট্রীয় নিয়মন খাটে না। তাদের দিক দিয়ে দেখলে, জাতীয় পরিকল্পনা আদৌ না-থাকারই সামিল।

এর যা পরিণতি তাতে সমাজের একটা বিরাট অংশ পরিকল্পনা এবং তার ব্যবস্থাগুলোকে অগ্রাহ্য করেই চলতে পারে। শুধু তাই নয়; এশিয়া

---

* *Planning and Growth in Rich and Poor Countries,* London, George Allen & Unwin Ltd., 1966, p. 161.

এবং দূর প্রাচ্যের বহু দেশ সম্বন্ধে এশিয়া এবং দূর প্রাচ্যের জন্যে জাতিসংঘ আর্থনীতিক কমিশনের বিভিন্ন কর্মিদল যা বারবার বলেছে: এই রকমের দেশগুলিতে সরকার নিজেরাই যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার প্রতি তাদের অনুগত থাকায় তারা নিজেদের কতটা বাধ্য বলে মনে করে সেটা এখনও বলা শক্ত। এমন অবস্থায়, পরিকল্পনা বাস্তবে কেবল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভিতরেই আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করবে, সেই গণ্ডির বাইরে নয়, এটা তো স্বাভাবিকই।

কাজেই, সিদ্ধান্ত আসে এই যে, জাতীয় অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ে তুলে সেটাকে শক্তিশালী করাই ব্যাপক পরিসরে পরিকল্পনা চালু করার এবং বাজারকে প্রভাবিত করে যেসব স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণাধীন করার উপায়।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতে উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হবার এবং একচেটিয়া কারবারগুলোর আর্থনীতিক আর রাজনীতিক ক্ষমতাবৃদ্ধির একটা ফল হল রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র। মুক্ত দেশগুলিতে জাতীয় অর্থনীতি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথক বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। কয়েকটি প্রাক্তন ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক দেশে বিভিন্ন বৈদেশিক কারবারের জাতীয়করণ হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করা এবং সেটাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান — এই কথাটা স্মরণে আনলে ঐসব দেশে ঐ নতুন আর্থনীতিক ব্যবস্থাটার প্রগতিশীল, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রকৃতিটা বেশ স্বতঃপ্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

এখন প্রশ্ন হল — এই রকমের বিকাশ জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের অনুযায়ী কিনা? এর ফলে যে পরিমাণে বৈদেশিক আর্থনীতিক আধিপত্যের অবসান ঘটে তাতে এটা তো তাদের স্বার্থের অনুযায়ীই। স্থানীয় বুর্জোয়ারা যেখানে রাজনীতিক ক্ষমতা পরিচালনা করে, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকারও এমন কয়েকটা দেশে বৈদেশিক-মালিকানাধীন শিল্পায়তন, রেলপথ, জাহাজ চলাচল, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থ কাজ-কারবারের জাতীয়করণের বহু ঘটনা থেকে ঐ সিদ্ধান্ত সঠিক প্রতিপন্ন হচ্ছে। যেমন, সিংহলে কলম্বো বন্দরের ব্যবস্থাদি এবং মার্কিন তৈল কারবারগুলোর বিভিন্ন বিক্রয়ের সংস্থাকে সরকার জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। ভারতে বৃটিশ-মালিকানাধীন সোনা আর হীরকের খনির সঙ্গে

সঙ্গে বৃটিশ-মালিকানাধীন বিভিন্ন গুরুত্বসম্পন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক কারবারের জাতীয়করণ হয়েছে। বলিভিয়ায় বড় বড় তিনটে বৈদেশিক মালিকানাধীন বিভিন্ন টিনের খনি নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রের হাতে। মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল এবং চিলিতে তৈল নিস্কাশনের উপর রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কায়েম করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, লাতিন আমেরিকার কয়েকটা দেশে জাতীয় বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আসীন হবার পরে বৈদেশিক মালিকানাধীন সম্পত্তি জাতীয়করণের অধিকার রাষ্ট্রের হাতে দেবার জন্যে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ে তোলা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিতে তার নিয়ত ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নিশ্চিত করার বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে একটা হল বৈদেশিক মালিকানাধীন কোম্পানির জাতীয়করণ। এই রকমের অন্যান্য ব্যবস্থা হল: সরকারী খরচে এবং সরকারের তরফে নতুন নতুন কল-কারখানা গড়া, বিভিন্ন স্থানীয় ব্যক্তিগত কারবার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন করা; উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র কেবল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র হিসেবে সংরক্ষিত করে সেগুলিতে দেশী বা বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজির প্রবেশ বন্ধ করা; লাইসেন্স ব্যবস্থা; মূল্য নিয়ন্ত্রণ, এবং ব্যক্তিগত কারবার নিয়মনের অন্যান্য উপায়।

এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে বৈদেশিক একচেটিয়া কারবারগুলির কিংবা দেশীয় আর্থিক এবং শিল্পগত পুঁজির মালিকানাধীন সম্পত্তির জাতীয়-করণই সবচেয়ে মূলগত ব্যবস্থা। জাতীয় অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঐসব পুঁজির ক্রিয়াকলাপের উপর কোন কোন বাধানিষেধ মাত্র নয় -- ঐসব ক্ষেত্রে ঐসব পুঁজির ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধই করা হয় এতে।

সাংগঠনিক এবং আর্থনীতিক সংস্কার হিসেবে উদ্ভূত হয়ে এই সমস্ত ব্যবস্থাই পরে সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে চলে যায়। উপরে বর্ণিত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সংগঠিত করার প্রক্রিয়াটা স্পষ্টতই খুবই বিরোধাত্মক হতে পারে। যেমন, রাষ্ট্র হয়ত নতুন নতুন রাস্তা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, কয়লাখনি, এমনকি ধাতুশিল্পকারখানা নির্মাণেরও বিস্তৃত কর্মসূচি অনুসারে কাজ চালাতে পারে, যদিও এমন হতে পারে ঐ সমস্ত সুযোগসুবিধা আর কল-কারখানা বিভিন্ন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কারবারের জন্যে পরিবহন, বিদ্যুৎ, জালানি আর ধাতুর যোগান দিতেই কাজে লাগবে। সেটা হবে রাষ্ট্রীয়-পুঁজিতান্ত্রিক ধারার প্রকাশ। তেমনি, বিভিন্ন বৈদেশিক কোম্পানির

জাতীয়করণ হতে পারে সেগুলিকে বিভিন্ন দেশীয় ব্যক্তিগত কারবারের হাতে তুলে দেবারই জন্যে। সেইভাবেই, এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে উৎপাদন সম্পর্কের বুর্জোয়া ব্যবস্থা কোনক্রমেই লঙ্ঘিত হবে না। আবার, ব্যক্তিগত কারবার নিয়মনের কিংবা গণ্ডিবদ্ধ করার বিভিন্ন ব্যবস্থা বুর্জোয়াদের কোন একটা জোটের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ব্যক্তিগত পুঁজির অন্যান্য প্রতিনিধিদের স্বার্থের অনুযায়ী হতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়া এবং তার চালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এইসব ব্যাপার বুর্জোয়াদের আচরণে অসংগতির দোষ দেখিয়ে দেয়। তার উপর, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র হয়ে ওঠে জাতীয় স্বার্থ এবং সমগ্র দেশীয় বুর্জোয়া কিংবা তার কোন একটা জোটের মধ্যে সংঘাতের ক্ষেত্র।

জাতীয় স্বার্থ যখন প্রাধান্য পায় তখন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উন্নয়ন ব্যক্তিগত পুঁজির বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রকৃতি ধারণ করে, — জাতীয় অর্থনীতির মূল অবস্থানগুলি থেকে ব্যক্তিগত পুঁজিকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়। তখন থেকে, উৎপাদন সম্পর্কের নতুন ব্যবস্থাটার বনিয়াদ হয় জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা বৈদেশিক আর দেশীয় কারবারগুলি, নূতন গড়া রাষ্ট্রীয় শিল্পায়তনগুলি, সরকারী ব্যাংক, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান আর পরিবহন-সংগঠনগুলি। এই অবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র থেকে জাতীয় মালিকানায় রূপান্তরিত হবার ঝোঁক দেখা দেয়।

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অপরিহার্য। বহির্বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে গেলে রপ্তানি এবং আমদানির কাজ-কারবারের উপর ষোল-আনা কিংবা আংশিক রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কায়েম হতে পারে — এই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণও ব্যক্তিগত পুঁজির ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতা গণ্ডিবদ্ধ করতে সহায়ক হয়।

প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির বিকাশের বিবরণী থেকে দেখা যায়, যখনই কোন দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সমগ্রভাবে দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে কাজে-কর্মে কেবল নিজ শ্রেণী-স্বার্থ অনুসারেই চালিত হয় তখন অনিবার্যভাবেই দেখা দেয় বিভিন্ন বিপজ্জনক সামাজিক-রাজনীতিক পরিস্থিতি -- তার চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করে তখন সংশ্লিষ্ট দেশে বিদ্যমান

বাস্তব অবস্থার উপর। কোন কোন দেশে এই রকমের সন্ধিক্ষণের অবস্থায় শেষে বুর্জোয়াদের পরাজয় এবং বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির জয় হয়েছে, এই রকমের ক্ষেত্রগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করে 'পরিকল্পিত অর্থনীতি বনাম অবাধ বাজার' সংক্রান্ত সমস্যা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের স্বাভাবিক পরিণতিটা চোখে পড়ে।

যেমন, মিসরে ১৯৫২ সালের বিপ্লব রাজতন্ত্রের ইতি করে দিল। রাজা ফারুক দেশ ছেড়ে পালালেন, তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁর সম্পদের একটা অংশ, কিন্তু ঐ সম্পদের একটা মোটারকমের অংশ দেশেই ছিল এবং সেটা যথাযথভাবে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ছিল তাঁর ৫৭,৮০,০০০ ডলার দামের অতি বিলাসপূর্ণ কেবিন ক্রুজার, আশিখানা মোটরগাড়ি, ডজনখানেক প্রাসাদ, প্রায় ১০,০০,০০০ ডলার দামের মুদ্রা আর ডাকটিকিটের সংগ্রহ, ২০,০০০ ডলার দামের সোনা আর হীরক দিয়ে তৈরি 'ঈস্টার এগ', খুব দামী দামী আসবাব — তার মধ্যে ৭৫,০০০ ডলার দামের একটা ডেস্ক এবং অন্যান্য জিনিস। রাজবংশের (ফারুক ছাড়াও) অন্যান্যদের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আইন অনুসারে ৫০,০০,০০,০০০ ডলার দামের সম্পত্তি রাষ্ট্রে বাজেয়াপ্ত হয়।

এইভাবে মিসরে রাজতন্ত্রের পতনের প্রত্যক্ষ আর্থনীতিক ফলে রাষ্ট্রে বাজেয়াপ্ত হয়ে রাজ পরিবার এবং তাদের অনুগামীদের স্থাবর বিষয়-সম্পত্তি এল মোটামুটি ১০০ কোটি ডলার। ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হতে পারত বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু ধরা যাক, নতুন সরকার যদি মহামূল্যবান 'ঈস্টার এগ' আর রাজকীয় 'ক্যাডিলাক' গাড়িগুলোকে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তিত ক'রে সেই টাকা দিয়ে তখনই যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জাম সংগ্রহ ক'রে কতকগুলো শিল্পায়তন, বিদ্যুৎকেন্দ্র আর রাস্তা তৈরি করত। তাতে মিসরে শিল্পোন্নয়নে কিছুটা গতিবেগ সঞ্চারিত হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নটা হল তার ফলে লাভবান হত কে? সেইসব ঘটনা-পরম্পরায় নীলনদের ধারে এই প্রাচীন ভূভাগে কি কি মৌলিক পরিবর্তন ঘটত?

তখন মিসরে সমাজের গড়ন যা ছিল তাতে — সহজেই অনুমান করা যায় — অপ্রত্যাশিতভাবে ঢুকানো ঐ অর্থে লাভবান হত সেদেশে সক্রিয় বৈদেশিক একচেটিয়া কারবারগুলো, দেশীয় টাকার কুমিরগুলো, তুলোর বাজারে মুনাফাখোরেরা এবং বৃহৎ কারবারি বুর্জোয়ারা ছাড়া অন্য কেউ

নয়। সমাজের এইসব সম্পদশালী স্তর এবং নিযুত নিযুত ফেল্লা (কৃষক) আর শহুরে প্রলেতারিয়ানদের মধ্যেকার ব্যবধানটা অল্প সময়ের মধ্যেও আরও বেড়ে যেত। দেখা দিত 'খুদে-ফারুকের' দঙ্গল — তারা রাজা উপাধি ধারণ না করলেও বিলাসপূর্ণ মোটরগাড়ি, কেবিন ক্রুজার আর প্রাসাদ বাগাতে পারত সহজেই। বিপ্লব শেষ হয়ে যেত অর্ধ-পথেই।

এমন নিদারুণ বিপর্যয়ের খুবই বাস্তব আশঙ্কাই ছিল। প্রকৃতপক্ষে, রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হবার পরে গোড়ার ক'বছরে মিসরের শাসক মহল বুর্জোয়াদের বেশ মোটারকমের সুযোগসুবিধা আর বিশেষ অধিকারই দিয়েছিল — শাসক মহল মনে করেছিল, সরকারী সাহায্য পেয়ে দেশীয় পুঁজিপতিরা বিভিন্ন বৃহদায়তন কাজ-কারবারে নামবে, সেটা বাঞ্ছিত আর্থনীতিক অগ্রগতি ঘটাবে। তবে, এই প্রত্যাশা সার্থক হয় নি।

সরকার যা পেরেছিল যাবতীয় উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত পুঁজি শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োজিত হতে অনিচ্ছুক ছিল। বুর্জোয়ারা কল-কারখানা না গড়ে কিনতে থাকল স্থাবর সম্পত্তি। বিদেশে অর্থের চালান সর্বনাশা রূপ ধারণ করল: ধনী মিসরীরা একটুও কালক্ষেপ না করে সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে টাকা পাচার করে দিল। ফালাও হল মুনাফাখোরি।

সেই পরিস্থিতিতে, স্বভাবতই, দেশটির সামাজিক-রাজনীতিক জীবনে দানা বেঁধে উঠল সম্পূর্ণ বিপরীত দুটো ধারা — তার একটাতে প্রতিফলিত হল বিপ্লবের বিকাশ এবং শক্তিবৃদ্ধি, আর অন্যটার লক্ষ্য হল বুর্জোয়াদের এবং অন্যান্য শোষক শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ অধিকার সংহত করা এবং রাজতন্ত্র আর বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মিসরের জনগণের অর্জিত সব সাফল্যকে বুর্জোয়া এবং অন্যান্য শোষক শ্রেণীর হাতে তুলে দেওয়া। দেশের নেতাদের পথ বেছে নেবার সময় এসে গেল। জেনারেল নজিবের মতো কেউ গেল বুর্জোয়াদের পক্ষে।

১৯৫৪ সালে সংকট ফেটে পড়ল। মোটের উপর সমগ্র জনগণ ছিল বিপ্লবকে প্রবলভাবে এগিয়ে নিয়ে চলবার পক্ষে। শ্রমিকদের সভা-মিছিল হতে থাকল, সাধারণ ধর্মঘট হল। এইভাবে অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত জনমতের সমর্থনে বৈপ্লবিক শক্তিগুলি জয়যুক্ত হল — ১৯৫৪ সালে এপ্রিল মাসে নাসেরের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব পরিস্থিতিটাকে সম্পূর্ণতি আয়ত্ত করে ফেলল।

বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কারের কাজ আরম্ভ হল। তবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, সেই ১৯৫২ সালে চালু-করা ভূমি সংস্কারের আওতায় পড়ল সমস্ত ভূমির মাত্র ৬·৪ শতাংশ; আবাদযোগ্য সমস্ত ভূমির ৩৫ শতাংশের মালিক রইল ভূস্বামীরা। শহর আর গ্রামাঞ্চলের বিশেষ অধিকারভোগীদের বিলাস-ব্যসনের জীবন চলতেই থাকল। মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১·৫ ভাগ হলেও তাদেরই হাতে রইল জাতীয় আয়ের ৩৫ শতাংশ। নিদারুণ দারিদ্র্যপীড়িত হয়ে রইল জনগণ।

তবে, সেই তখনও বুর্জোয়াদের মধ্যে থেকে প্রতিবাদ উঠতে থাকল — সমস্ত রকমের সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলে দেবার কথা উঠল। বিস্তৃত গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থাবলির জন্যে দেশের দাবি এবং শোষক শ্রেণীগুলির সংকীর্ণ স্বার্থের মধ্যে একটা নতুন সংঘাত পাকিয়ে উঠতে থাকল। এই সংঘাত দানা বেঁধে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, ১৯৬১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব ব্যক্তিগত পুঁজিকে শায়েস্তা করার প্রবল ব্যবস্থা অবলম্বন করল।

জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ঢের বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই ছিল ১৯৬১ কালের ডিক্রিগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। সমস্ত শিল্পায়তন, ব্যাঙ্ক, বীমা, পরিবহন, আমদানি-রপ্তানি কারবার এবং দেশীয় পাইকারী ব্যবসায়ের ৯৫ শতাংশেরও বেশির উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হল। ব্যক্তিগত কারবারকে কার্যত খুচরা বাণিজ্য এবং গৌণ শিল্প আর কারিগরির ক্ষেত্রে গণ্ডিবদ্ধ করে দেওয়া হল।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তিগত কারবারকে গণ্ডিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে চলল 'কোটিপতিবিরোধী অভিযান'। দেশটির অর্থনীতি ছিল এক শ'টি পরিবারের হাতে — তাদের প্রায় ১০০ কোটি ডলার দামের সম্পত্তি রাষ্ট্রে বাজেয়াপ্ত হল। তাছাড়াও, ৭০০ জন প্রধান প্রধান পুঁজিপতির সম্পত্তি রাষ্ট্র কেড়ে নিল, ঐসব মালিকদের অনেকে গ্রেপ্তার হল।

১৯৬৩ সালে বৈপ্লবিক সরকার দেশীয় পুঁজিপতিদের উপর আরও একটা আঘাত হানল: বহু রকমের খাদ্য, রাসায়নিক এবং অন্যান্য শিল্প, আমদানি-রপ্তানি কারবার আর নির্মাণকাজের কারবার জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হল — তার অনেকগুলি আগেই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। জাতীয় পরিষদে গৃহীত জাতীয় সনদে সমস্ত জাতীয়কৃত সম্পত্তিকে সাধারণের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হল।

বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কারের মধ্যে বিত্ত-সম্পত্তিশালী সমস্ত শোষক শ্রেণী যাদের বিশেষ বিশেষ অধিকার বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল তাদের সবারই যেকোন রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণও নিষিদ্ধ হল।

এইসব ঘটনের ফলে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের আক্রোশ আবার ফেটে পড়ল, সেটা হবে তা আগেই অনুমান করা গিয়েছিল। গুপ্তভাবে সক্রিয় এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী মহলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত চরম প্রতিক্রিয়াপন্থী ধর্মীয় এবং জাতীয়তাবাদী সংগঠন 'মোসলেম ভ্রাতৃসংঘ' বিপ্লবের বিরুদ্ধে কতকগুলো হানা চালাল, তারা রাষ্ট্রপতি নাসেরকে হত্যা করার চেষ্টায় ব্যর্থ হল।

১৯৬৫ সালে দেশের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে জনগণের বিস্তৃত অংশকে প্রত্যক্ষ এবং ক্রমবর্ধমান বহুমুখী আর সক্রিয় অংশগ্রহণে টেনে আনবার ব্যবস্থা অনুসারে আরও নতুন নতুন প্রশাসনিক এবং রাজনীতিক সংস্কার চালু করে জাতীয় নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াপন্থীদের কার্যকলাপের পাল্টা জবাব দিল। 'আরব সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের' ভিতরে একটা রাজনীতিক সংগঠন স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হল, এই সংগঠন পার্টির কাজ করবে — জনগণের রাজনীতিক-সচেতন সমাজতান্ত্রিক অগ্রগামী বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক-বৈপ্লবিক কর্মসূচিটিকে ধাপে ধাপে বাস্তবে রূপায়িত করতে এবং দেশটিকে সমাজতন্ত্রের দিকে যাবার মতো বিকাশের পথে তুলে ধরবার জন্যে মিসরের বৈপ্লবিক শক্তিগুলির সময় লেগেছিল এক দশকের একটু বেশি। রাষ্ট্রপতি নাসের নিজেই বলেছেন, মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে ঘটনাবলি আরম্ভ থেকেই শেষ অবধি ছিল বিভিন্ন বৈপ্লবিক লক্ষ্যের মূর্ত প্রকাশ, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে এমন কোন বিশদ এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ১৯৫২ সালের বিপ্লবের নেতাদের ছিল না। তা তো নয়ই, — 'স্বাধীন অফিসারেরা' এবং সংগ্রামে যাদের তাঁরা সমবেত করেছিলেন তাঁরা প্রথমে লড়াইয়ে নেমেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এবং দেশীয় পুঁজিপতিদেরও বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার প্রয়োজন তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন পরে — সংঘাতের প্রক্রিয়াটার মধ্যে। লড়াই চালাতে চালাতে তাঁদের রাজনীতিক মনোভাব দানা বেঁধে উঠেছিল। নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রে নিজেদের ভুলভ্রান্তি এবং সাফল্যগুলির বিশ্লেষণ করতে করতে মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী-গণতন্ত্রী নেতারা ক্রমেই বেশি মাত্রায়

সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়েছিলেন। জাতীয় উন্নয়নের অপুঁজিতান্ত্রিক পথ ধরার জন্যে তাঁদের সিদ্ধান্তটা ছিল বিস্তৃত গণতান্ত্রিক কর্মসূচির সংগতিপূর্ণ রূপায়ণেরই ফল।

মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন ঘটে গেছে তার অন্যতম কারণ হল **অবাধ বাজারের ব্যক্তিগত পুঁজিতন্ত্রকে মূর্ত-নির্দিষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা** এবং মিসরীয় বুর্জোয়াদেরও প্রত্যাখ্যান করা, এই বুর্জোয়ারা জাতীয় প্রগতির খাতিরে নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থপরতা অতিক্রম করতে পারে নি।

হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী বর্মায়ও সাম্প্রতিক কয়েক বছরের ঘটনাবলিতে অনেকটা মিসরী বিপ্লবের ধাঁচটার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

১৯৪৮ সালে বর্মা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন উচ্ছেদ করার পর দেশটি স্বদেশে রাজনীতিক সংগ্রামের একটা তালগোল-পাকানো অবস্থায় পড়েছিল। দেশটিকে পুঁজিতন্ত্রে ঠেলে নেবার জন্যে দেশীয় বুর্জোয়াদের চেষ্টার দরুন দেশটি আর্থনীতিক বিপর্যয়ের কিনারে গিয়ে পড়েছিল। ১৯৬২ সাল নাগাত বর্মার মোট শিল্পোৎপাদন যুদ্ধপূর্ব পরিমাণ থেকে ১৫ শতাংশ নেমে গিয়েছিল, তেমনি চালের ফলনের বেলায়ও (চাল বর্মায় খাদ্যের প্রধান উপাদান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য)। তৈল আর টিন খনি থেকে তোলার পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলের পরিমাণের যথাক্রমে অর্ধেকে এবং এক-পঞ্চমাংশে। আগে যে ভূমি সংস্কার ঘোষিত হয়েছিল সেটাকে রূপায়িত করার জন্যে কিছু করা হয় নি। দেশীয় এবং বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজিকে একটার পরে একটা বিশেষসুবিধা দেওয়া হয়েছিল। মেহনতী জনগণের ক্লেশ বেড়ে চলেছিল। সরকারী কর্মকর্তাদের চলছিল অসাধু উপায়ে। অবস্থাটা সম্বন্ধে জেনারেল নে উইন পরে বলেছিলেন, 'প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ফৌজ, ব্যবসা-বাণিজ্য আর রাজনীতি, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশেই দুর্নীতি পরিব্যাপ্ত ছিল।'*

জেনারেল নে উইন তখন দেশের সামরিক শক্তির নেতৃত্বে ছিলেন — তিনি ১৯৬২ সালে মার্চ মাসে একটা কুদেতা ঘটালেন। ক্ষমতা দখল করল একটি বৈপ্লবিক পরিষদ — তার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন দেশপ্রেমিক মনোভাবাপন্ন অফিসারেরা।

---

* নে উইন, 'বর্মা নতুন পথ ধরল', 'বিজ্ঞান' প্রকাশন, মস্কো, ১৯৬৫, পৃঃ ৪৮ (রুশ সংস্করণ)।

এই কুদেতার পরে বছরখানেক ধরে দেশীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে সহযোগিতা ভিত্তিতে আর্থনীতিক কানাগলি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে বৈপ্লবিক পরিষদ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, সে পথে যে কোথাও পেঁছন যাবে না সেটা সেই নতুন বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক সরকার শিগগিরই বুঝতে পেরেছিল। নে উইন লিখেছিলেন: 'গোড়ায় আমরা মনস্থ করেছিলাম সরকার যেগুলিকে চালাতে পারে না এইরকমের কতকগুলি কল-কারখানা ব্যক্তিগত শিল্পপতিদেরই চালিয়ে যেতে দেওয়া হবে। কিন্তু তাতে কী পেলাম আমরা? নিজেদের মুনাফা বাড়াবার জন্যে মালিকেরা সরকারী কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে আরম্ভ করল। আমরা দেখলাম, নতুন নতুন ব্যক্তিগত শিল্পায়তন স্থাপন করতে দেওয়া হলে বৈদেশিক নাশকতামূলক কার্যকলাপের মধ্যে পড়তে হবে... ব্যক্তিগত ক্ষেত্র আমাদের লক্ষ্যের পরিপন্থী: সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলনীতি হল জাতীয়করণ। ব্যক্তিগত শিল্প যেগুলি রয়েছে সেগুলিকে চলতে দেওয়া হবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত সেগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হবে।'*

যেখানেই বুর্জোয়াদের সংকীর্ণ শ্রেণী-স্বার্থের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের সংঘাত লাগে সেখানে একটা পথ বেছে নেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বর্মাও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। প্রতিকারের যেসব সাধারণ লক্ষ্য সাধনের জন্যে বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক সরকার 'কুদেতা' করেছিল সেগুলিকে হয় বর্জন করতে হত, নইলে ক্রমাগত বেশি বেশি কঠোর ব্যবস্থা বাস্তবে রূপায়িত করে সেগুলি সাধনের জন্যে কাজ করতে হত। কুদেতার ঠিক পরেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়াকে জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। বর্মী বৈপ্লবিক পরিষদ যখন দেশীয় প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গেল তখন যথোপযুক্ত রাজনীতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে রচিত দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক কর্মসূচি তাঁদের হাতে প্রস্তুত ছিল। দেশীয় বুর্জোয়াদের অন্তর্ঘাত আর নাশকতার সম্মুখীন হবার মুহূর্তেই বৈপ্লবিক নেতৃত্ব শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে সামাজিক সম্পর্কের মূলগত পুনঃসংগঠনের কাজ চালাল দৃঢ়সংকল্প হয়ে।

বছর দুয়েকের মধ্যে সবচেয়ে বড় বড় বৈদেশিক কারবারগুলোকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছিল। দেশটিতে বৈদেশিক পুঁজির সমস্ত অবস্থানই মূলত নষ্ট হল। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হল উৎপাদনের

* নে ইউন, 'বর্মা নতুন পথ ধরল', পৃঃ ৪২-৪৩।

সমস্ত প্রধান প্রধান শাখা, দেশীয় আর বৈদেশিক সমস্ত বাণিজ্য, পরিবহন এবং ক্রেডিট ব্যবস্থা। ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের যেকোন নতুন কারবার খোলা নিষিদ্ধ হল।

* * *

বইখানির এই অংশটার শিরোনামা দেওয়া হয়েছে 'পরিকল্পিত অর্থনীতি বনাম অবাধ বাজার'। হঠাৎ মনে হতে পারে, তার মানে এটা বুঝি অর্থশাস্ত্রের দুটো বিমূর্ত ধারণার আপেক্ষিক গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা। কিন্তু, পাঠক দেখে থাকবেন, প্রকৃতপক্ষে ধারণাদুটোর পিছনে রয়েছে খুবই বাস্তব এক-একটা সামাজিক-রাজনীতিক শক্তি, সেগুলি — ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক -- পরিস্থিতির বলে এসে পড়ে সামাজিক সংঘাতের ঘূর্ণাবর্তে। এই সংঘাতের পরিণতি মিসর কিংবা বর্মার মতো একই হবেই এমন কোন কথা নেই। সবচেয়ে প্রবলভাবে জোর দিয়ে যে কথাটা আমরা বলতে চাই সেটা হল, আর্থনীতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের মধ্যে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলির সমাধান সব সময়ে কোন মন্ত্রিদপ্তরের প্রশান্ত আবহাওয়ায় হয় না। জনসংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী, স্তর আর গ্রুপের চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন স্বার্থের সঙ্গে এই রকমের সমস্যাগুলো যে পরিমাণে সংশ্লিষ্ট তাতে সেগুলো আর 'নিছক আর্থনীতিক' সমস্যা থাকে না— সেগুলো হয়ে ওঠে সামাজিক তর্কবিতর্ক আর সংঘাতের বিষয়বস্তু।

আমরা দেখেছি, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের যে পর্বে প্রধান লক্ষ্য ছিল **রাজনীতিক স্বাধীনতা** অর্জন করা সেই পর্ব থেকে আন্দোলনটা চলে যায় এক নতুন পর্বে — তখন **আর্থনীতিক স্বাধীনতা** অর্জন করাই প্রধান লক্ষ্য। **আর্থনীতিক স্বাধীনতার** জন্যে এই সংগ্রাম স্বভাবতই গিয়ে পড়ে জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের আরও একটা পর্বে — তখন প্রধান জোরটা ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে পড়ে **সামাজিক সংস্কারের** উপর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পথ বাছা

তৃতীয় দুনিয়ার যেকোন দেশের জটিলতাগুলো সমেত তার জীবন বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার প্রত্যেকটা দিকই বিকাশের পথ বেছে নেবার ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই সমস্যাটা এখন এইসব দেশের পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। এই সব দেশের ভিতরকার রাজনীতিক কিংবা সামাজিক-আর্থনীতিক কিংবা মতাদর্শগত প্রক্রিয়ার আঁকাবাঁকা গতিপথ কিংবা শ্রেণী-সংঘর্ষ; কিংবা পুঁজিতান্ত্রিক কিংবা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, এর যেকোনটাই বিবেচনা করলে দেখা যায়, তারা একদিন না একদিন ঐ কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হয়, আর, পুঁজিতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে যেটাকে তারা শেষপর্যন্ত বেছে নেয় তার উপর তাদের নিজেদের কল্যাণ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির অনুপাত এই দুইই বহুলাংশে নির্ভর করে।

১। উত্তরণের কালপর্যায়

এশিয়া এবং আফ্রিকার উঠতি দেশগুলি এখন চলেছে একটা উত্তরণ-কালপর্যায়ের ভিতর দিয়ে। দূরপাল্লার নিরিখে দেখলে, এটাকে বলতে হয় পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্যায়। অপেক্ষাকৃত নিকটপাল্লার নিরিখে দেখলে, অনগ্রসর ঔপনিবেশিক গড়ন থেকে আধুনিক বিকশিত সমাজে পৌঁছবার পথে কয়েকটা পর্ব নিয়ে এই কালপর্যায়টা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঔপনিবেশিক সমাজ হলে সেটা যে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ হবেই

এমন কোন কথা নেই। সেটা এমন সমাজ হতে পারে যেখানে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কই প্রধান, আবার সেখানে মালিকানার বিভিন্ন প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক রূপেরও প্রাধান্য থাকতে পারে।

প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ কখনও গোড়ার পর্ব পার হয় নি -- তাই, এই দেশগুলির শ্রেণীগত আর সামাজিক গড়ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুবই পৃথক, সেটাই আবার তাদের সামাজিক সম্পর্কের অপরিণত অবস্থার কারণ। অনেক সময়ে একই দেশের মধ্যে পাশাপাশি দেখা যায় গোষ্ঠীগত, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক এবং আরও নানা রকমের সামাজিক সম্পর্ক। এশিয়ায় এবং, বিশেষত, আফ্রিকায় বেশির ভাগ দেশে শ্রেণীগত পৃথগ্‌ভবনের প্রক্রিয়াটা অসম্পূর্ণ, ফলে দেখা দিয়েছে একটা অদ্ভুত অবস্থা -- তাতে কোন একটা সামাজিক শ্রেণী একাই দেশের সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক বিকাশ পরিচালিত করতে সক্ষম নয়: শ্রমিক শ্রেণী পারে না, তার কারণ তারা সংখ্যায় দুর্বল, তাদের সংগঠন যথেষ্ট নয়, রাজনীতিগতভাবে তারা অপরিণত, আর বুর্জোয়ারা পারে না, তার কারণ আলোচ্য দেশগুলির বেশির ভাগেই তারা হয় এখনও শ্রেণী হিসেবে ষোল-আনা সুপরিণত নয়, যদিও তাদের কোন কোন অঙ্গ-উপাদান (যেমন, বণিক, মহাজন) ইতোমধ্যেই রয়েছে, নইলে, তারা শ্রেণী হিসেবে বর্তমান থাকলেও, তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক সুস্থিতি আসে নি।

এই রকমের বিভিন্ন বিষয়গত পরিস্থিতির দরুন আলোচ্য উত্তরণ নিষ্পন্ন করতে হয়ত একটা গোটা ঐতিহাসিক যুগ লেগে যেতে পারে, কিন্তু, নতুন সমাজের উপযোগী অবস্থা সুপরিণত হয়ে উঠবার জন্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ পুঁজিতন্ত্র বদ্ধমূল হওয়া অবধি নিষ্ক্রিয় হয়ে অপেক্ষা করাটাকেই অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলির অবধারিত অদৃষ্ট হিসেবে ধরে নেবার প্রয়োজন নেই। উপনিবেশগুলিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের আগে পুঁজিতন্ত্র আসতে হবেই, এই ধারণাটাকে লেনিন দৃঢ়ভাবে বাতিল করে দিয়েছিলেন।

সবাই জানে, সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ এবং অধীনস্থ দেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত করেছে — যদিও এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সেটাকে বাঁকাচোরা এবং বিকৃত করে দিয়েছে। পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রার উপর জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের পরিসর আর গভীরতা নির্ভর করে। যেখানে নিচু মাত্রায় পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ ঘটেছে, প্রধানত এমনি সব দেশ নিয়েই

এখন তৃতীয় দুনিয়া। পুঁজিতন্ত্র যেখানে অপেক্ষাকৃত বিকশিত এমন রাষ্ট্র — যেমন, ভারত কিংবা তুরস্ক — নিয়ন না হয়ে বরং ব্যতিক্রমই।

এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলির রাজনীতিক স্বাধীনতার পরে সেসব দেশে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে যেসব অবস্থার ক্রিয়া ঘটে সেগুলি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সেটা বের করা যায় কিনা দেখা যাক: এইসব দেশ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করার পর থেকে জাতীয় পুঁজিতন্ত্র বিকাশের সুযোগ বেড়েছে, না, কমেছে? এই দেশগুলির সামাজিক-আর্থনীতিক গড়নের বিভিন্ন বিশেষক উপাদান এবং তাদের সামাজিক বিকাশের উপায়, রূপ এবং হার বিচার-বিবেচনা করতে হলে ঐ প্রশ্নের উত্তরটা গুরুত্বসম্পন্ন।

প্রথমেই বলা দরকার, স্বাধীনতার পরেও এশিয়া এবং আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রের মধ্যে রয়ে গেছে। তবে, তাই বলে জাতীয় পুঁজিতন্ত্র বিকাশের অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে কিংবা তার প্রকৃতি আর গড়নে বেশকিছু পরিবর্তন ঘটে নি, তা নয়। বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হলে তারই ফলে আপনা থেকেই জাতীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ কখনও শেষ হয়ে যায় না: তার ফলে এতে আসতে পারে শুধু কোন কোন বিশেষ উপাদান। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় উপাদান বোধহয় এই যে, ক্ষমতায় বসেছে যে জাতীয় বুর্জোয়ারা তাদের আর্থনীতিক দুর্বলতার দরুন, তেমনি, পুঁজি রাশিকৃত হবার সুযোগসুবিধার সীমাবদ্ধতার দরুন জাতীয় পুঁজিতন্ত্র প্রায় সর্বত্রই রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রূপ ধারণ করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বৈদেশিক একচেটিয়া পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশের পথ রোধ করে — কাজেই, বিভিন্ন গুরুত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগত কাজ-কারবারের বৃদ্ধিও ব্যাহত করে, এইসব কাজ-কারবারের বিকাশ সরাসরিই বৈদেশিক একচেটিয়া কারবারগুলির উপর নির্ভর করে। ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ক. ম্যাথু কুরিয়ান খুব ঠিকই বলেছেন যে, 'স্বাধীনতার পরবর্তী কালপর্যায়ে একচেটিয়া কারবার এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে আর্থনীতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার দিকে গতিটাকে সুগম করাই হয়েছে ভারতে বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজির ভূমিকা।'*

---

* K. Mathew Kurian, *Impact of Foreign Capital on Indian Economy*, New Delhi, 1966, p. 273.

উঠতি দেশগুলিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিকাশের ক্ষেত্রটা হরেক রকমের বাধাবিপত্তি আর দ্বন্দ্ব-বিরোধে ঠাসা হলেও আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের এই ক্ষেত্রটিই তার অস্তিত্বের বাস্তবতা দিয়েই সাধারণভাবে জাতীয় পুঁজিতন্ত্রের এবং বিশেষভাবে বৃহৎ পুঁজির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রোধকের কাজ করে। আসলে, কেবল জাতীয় বুর্জোয়াদের নয়, পেটি বুর্জোয়াদেরও এবং কিছু পরিমাণে, মেহনতিদের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজনীতিক শাসক কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির চাপে জাতীয় স্বাধীনতার স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নিহিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং পুঁজিতন্ত্রবিরোধী ধারাগুলোকে এগিয়ে নিয়ে না চলে পারে না। ঠিক এই কারণেই, যেসব দেশে রাজনীতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণতই জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে সেইসব দেশেও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ভূমিকাটাকে সামাজিক বিচারে প্রগতিশীল বলা যায়। অন্যদিকে, কোন কোন দেশে (যেমন ভারতে এবং তুরস্কে) শাসক বুর্জোয়ারা কখনও কখনও পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটাকে ব্যবহার করার উপায় বের করে ফেলে। তবে, এখানেও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিকাশ রোধ করার জন্যে কিংবা তার ক্রিয়াকলাপের পরিধি গণ্ডিবদ্ধ করার জন্যে বুর্জোয়াদের স্পষ্ট ঝোঁকই দেখা যায়। বুর্জোয়ারা যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সমালোচনা করে, বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের 'অযোগ্যতার' অভিযোগ তোলে তার একটা কারণ হল এই যে, ঐ ক্ষেত্রটার ভিতরে থাকে নতুন সামাজিক সম্পর্কের বীজ।

সমগ্রভাবে তৃতীয় দুনিয়ায় ব্যক্তিগত কারবারের বৃদ্ধির হার গড়পড়তার চেয়ে নিচে, এটা জাতিরূপস্বরূপ। জাতীয় ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগের বেশির ভাগই চালানো হয় কৃষি, বাণিজ্য (মাঝারি এবং ক্ষুদ্র) এবং জনপ্রয়োজনীয় কার্যাদির ক্ষেত্রে। এইসব ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজির প্রসার সাধারণত সরকারী রাজস্বসংক্রান্ত কর্মনীতি এবং অন্যান্য আর্থনীতিক ব্যবস্থা দিয়ে সংযত করা হয়।

যেসব দেশ নিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থাটা তার মধ্যে আর্থনীতিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে সবচেয়ে অনগ্রসর এই আলোচ্য দেশগুলিতে আগেরই মতো প্রধান অবলম্বন হল খুদে অর্থনীতি। এই দেশগুলির আর্থনীতিক গড়ন রূপধারণ করেছে একটা বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিতে — তখন পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের উপর মালিকানার বিভিন্ন প্রাক্‌সামন্ততান্ত্রিক এবং সামন্ততান্ত্রিক ধরনধারনের প্রবল প্রভাব পড়ছিল, কাজেই, পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক বিকাশের সুযোগসুবিধার অভাব ছিল। আমাদের একালে

পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ পড়েছে নতুন নতুন বাধাবিঘ্নের মধ্যে, তার একটা বিশেষ লক্ষণীয় রূপ হল নতুন নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্র, এগুলির রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপ কিছু পরিমাণে (কোথাও বেশি, কোথাও কম) ব্যক্তিগত কাজ-কারবারের ক্ষেত্রটাকে গণ্ডিবদ্ধ করে। শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া নিয়মনব্যবস্থা সক্রিয় হতে আরম্ভ করে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের সর্বোচ্চ পর্বে — এক্ষেত্রে তেমন নয়, এক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্র যথেষ্ট শক্তিশালী এবং টেকসই আর্থনীতিক এবং সামাজিক বনিয়াদ আয়ত্ত করার আগেই পুঁজিতন্ত্র পরিণত হয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রে। এই পরিস্থিতির প্রগতিশীল এবং প্রতিকূল দুটো দিক আছে। বৈদেশিক এবং গুরুত্বসম্পন্ন দেশীয় পরিসম্পতের জাতীয়করণ এবং তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সৃষ্টির ফলে, বিদ্যমান পুঁজিতান্ত্রিক রাজের আমলে বিশেষসুবিধাভোগী স্তরগুলো সবচেয়ে বেশি লাভবান হলেও, সেটা প্রগতিশীল দিক — কেননা, এটা উঠতি দেশগুলির সামাজিক প্রগতির পথে উত্তরণের জমিন তৈরি করে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটাকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে ধরে প্রগতিপন্থীরা সেগুলির মধ্যে সুপ্ত প্রগতিশীল ধারাগুলিকে বিকশিত করতে পারে এবং, এইভাবে, পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের দীর্ঘ এবং যন্ত্রণাকর প্রক্রিয়ার পর পর বিভিন্ন পর্বের ভিতর দিয়ে চলার হাত থেকে অনগ্রসর জাতিগুলিকে বাঁচাতে পারে।

জাতীয় পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের নিচু মাত্রার প্রতিকূল পরিণতি সম্বন্ধে কথা হল এই যে, এইসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রাক্‌সামন্ততান্ত্রিক এবং সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রেখে দীর্ঘস্থায়ী করার সুপরিকল্পিত কর্মনীতির দরুন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলি মধ্যযুগীয় অনগ্রসরতা থেকে বের হবার জন্যে পুঁজিতন্ত্রের সৃজনীশক্তিগুলির পর্যাপ্ত সদ্ব্যবহার করতে পারে না — এইভাবে প্রকাশ পায় ঐ প্রতিকূল পরিণতি। লেনিন লিখেছেন: 'সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তুলনায় পুঁজিতন্ত্র একটা সর্বনাশা বস্তু। মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র পরিসরে উৎপাদন এবং খুদে উৎপাদনকারীদের বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়া থেকে উদ্ভূত আমলাতন্ত্রের অশুভ সব পরিণতির সঙ্গে তুলনায় পুঁজিতন্ত্র একটা আশীর্বাদ।'* উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্রের অপ্রতুল বিকাশ জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 32, p. 350.

চরিত্র আর দাবির মধ্যে, কর্মিবাহিনীর মধ্যে, কর্মীদের শ্রেণী-চেতনার মধ্যে, বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল।

প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে দীর্ঘকাল যাবত জাতীয় এবং বৈদেশিক এই দুটো আর্থনীতিক ক্ষেত্রের সহাবস্থান ছিল, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল যৎসামান্যই, প্রকৃতপক্ষে, আজও এখানে-ওখানে তা টিকে রয়েছে। কৃষি (প্রধানত জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংক্রান্ত), কারিগরী এবং কুটিরশিল্প নিয়ে জাতীয় ক্ষেত্রে প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রাধান্য ছিল, আর বৈদেশিক ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্ক ছিল উন্নীত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ধাঁচের। প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে স্থাপিত প্রথম প্রথম শিল্পায়তন-গুলির ষোল-আনা মালিক ছিল বৈদেশিক একচেটিয়া পুঁজি। এই সব কল-কারখানায় যেসব স্থানীয় অধিবাসী কাজ নিত তারা অনেক সময়েই হত বিভিন্ন পশ্চাদভূমির বাসিন্দা, সেইসব অঞ্চলে ছিল গোষ্ঠীপতিদের শাসন আমলের রীতিনীতি — এরা ঐসব কল-কারখানায় কাজ নিলে বলা যায় তারা পার হয়ে আসত কয়েকটা ঐতিহাসিক যুগ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আর্থনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগের ফলে তারা যেসব রাজনীতিক এবং মতাদর্শগত ধারণা পেত সেগুলি হত তাদের নিজেদের জাতীয় বনিয়াদ থেকে প্রতিফলিত ধারণার চেয়ে ঢের বেশি প্রগতিশীল — এইভাবে আলোচ্য দেশগুলিতে রাজনীতিক উপর-কাঠাম গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটার উপর বৈদেশিক ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত প্রভাব পড়ত প্রবলভাবে। এই পরিস্থিতি থেকে প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির উপর গুরুতর ক্রিয়া ঘটেছিল এবং তাদের রাজনীতিক উপর-কাঠামে এমন কোন কোন ব্যাপারের উদ্ভব ঘটিয়েছিল যেগুলি পরে তাদের বিভিন্ন রাজনীতিক দাবিদাওয়া, রাজনীতিক প্রশাসনব্যবস্থার গড়ন, শাসনপ্রণালী, ইত্যাদি নির্ধারণ করেছিল।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বনিয়াদ আর উপর-কাঠামের মধ্যেকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ ক'রে কোন কোন বুর্জোয়া লেখক বলেছেন, ইউরোপীয় দেশগুলিতে সামাজিক পরিবর্তন এসেছিল আর্থনীতিক উন্নয়নের পরে, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তা নয় — এখানে বিভিন্ন সামাজিক দাবিদাওয়া আর্থনীতিক উন্নয়নকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যেমন, ফরাসী সমাজতত্ত্ববিৎ আলবার্ট মেইস্তার লিখেছেন: 'নতুন দেশগুলিতে উল্টো সামাজিক পরিবর্তন আসে (আর্থনীতিক) উন্নয়নের আগে; উৎপাদনের সুযোগসম্ভাবনা দিয়ে যা

মেটানো যেতে পারে তা ছাড়িয়ে যায় চলতি চিন্তাধারা আর আশা-আকাঙ্ক্ষা।'* এই লেখক স্বীকার করেছেন, এইসব আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিকল্পিত নয় — পরদেশী জীবনযাত্রার সঙ্গে যোগাযোগ থেকে এগুলি উদ্ভূত। এই লেখক স্পষ্টতই বদ্ধপরিকর হয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলির দুরদৃষ্ট অবধারিত, তারা কত গরিব সেটা বুঝে তাদের শিক্ষা, এমনকি জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমিয়ে সর্বনিম্ন মাত্রায় নামানো উচিত, কেননা, তিনি বলেন, জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার ফল হল 'লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি, ঐসব লোক জাতীয় উৎপাদের অপচয়কারী'।**

নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলি বিকাশের যে পর্বের ভিতর দিয়ে এখন চলেছে সেটাকে পুঁজিতান্ত্রিক পশ্চিমে এবং ঐ রাষ্ট্রগুলির কোন কোন মহলে প্রায়ই 'তৃতীয় পন্থা' বলে উল্লেখ করা হয়। নয়া-উপনিবেশবাদের কোন কোন মতাদর্শওয়ালার মতে এইসব দেশ তাদের যে নিজস্ব পথের কথা ভাবছে সেটা মতাদর্শগত বিচারে পড়ে কমিউনিস্ট তত্ত্ব এবং পশ্চিমী শিল্পোন্নত দুনিয়ার তত্ত্বের মাঝামাঝি কোথাও।*** মারিও রোস্সি নামে আর একজন লেখক বলেন, এশিয়া আর আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলি নিয়ে হয়েছে একটা তৃতীয় দুনিয়া, 'তার কারণ শুধু এই নয় যে, অন্য দুটো দুনিয়া এসেছে তার আগে, তারা ইতিহাসের দৃশ্যপটে ছাপিয়ে উঠেছে, তার আরও কারণ হল যে পরিমাণে এই দুনিয়ার একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে — ঠিক যেমনটি আছে অন্য দুটির। কোন পক্ষে যোগ দেবে বলে অপেক্ষমান দুনিয়া এটা নয় — কেননা, স্বয়ং সত্তা হবে বলে সে ইতোমধ্যেই স্থির করেছে।'****

'তৃতীয় পন্থা' সংক্রান্ত ধারণাটা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনপ্রিয়ই বটে — কেননা, এইসব দেশে বিদ্যমান অবস্থা যথার্থই খুবই পৃথক, অনন্যসাধারণ, — এবং সামাজিক বিকাশের ইতোমধ্যে পরিচিত বিভিন্ন

---

* Albert Meister, *L'Afrique peut-elle partir? Changement social et développement en Afrique Orientale,* Paris, 1966, p. 335.

** ঐ, পৃঃ ৪১১।

*** Richard Löwenthal, Ernest Halperin, Jurgen Domes, Franz Ansprenger, *Entwicklungsländer zwischen nationaler und kommunistischer Revolution,* Hannover, 1965, S. 83.

**** Mario Rossi, *The Third World. The Unaligned Countries and the World Revolution,* New Jork, 1963, p. 4.

পন্থা-উপায় এবং ধাঁচের সঙ্গে সেটা প্রায়ই মেলে না। তৃতীয় দুনিয়ার এই অনন্যতাটাকে অনেক সময়ে বিকাশের একটা পৃথক পন্থার সঙ্গে এক করে দেখা হয়ে থাকে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বরাবর এই মত পোষণ করে আসছেন যে, প্রত্যেকটি দেশের সমস্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখা দরকার, আর, এই অকাট্য সত্য মেনে চলা দরকার যে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ব্যাপারে গণতন্ত্রের রূপের ক্ষেত্রে এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের অবলম্বিত হারের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব পৃথক অবদান থাকবে। এই প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছিলেন: 'প্রাচ্যের দেশগুলিতে রয়েছে ঢের বড় বড় জনসংখ্যা এবং সামাজিক অবস্থার ঢের বেশি বিপুল বৈচিত্র্য — এই প্রাচ্যের দেশগুলিতে পরবর্তী সব বিপ্লবে যে নিঃসন্দেহেই রুশ বিপ্লবের চেয়েও বৃহত্তর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হবে, এটা আমাদের ইউরোপীয় ফিলিস্টাইনেরা স্বপ্নেও ভাবে না।'*

অনগ্রসর দেশগুলির অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশসংক্রান্ত মার্কসবাদী তত্ত্বটি তৃতীয় দুনিয়ার সমস্ত বিশেষ এবং অনন্যসাধারণ উপাদানগুলির বিষয়গত বিশ্লেষণ এবং সমস্ত বিচার-বিবেচনারই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

২। অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থা

অনগ্রসর দেশগুলি যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে পুঁজিতান্ত্রিক পর্বটাকে এড়িয়ে চলতেও পারে, এই ধারণাটাকে প্রথমে তুলে ধরেছিলেন মার্কস এবং এঙ্গেলস, পরে লেনিনের বিভিন্ন রচনায় ধারণাটিকে আরও বিশদ এবং মার্জিত করে তোলা হয়। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে উপনিবেশবাদ এবং জাতিসমস্যা সম্বন্ধে বিবরণীতে লেনিন বিষয়টিকে এইভাবে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন: '...অনগ্রসর জাতিগুলি এখন মুক্তির পথে, তাদের মধ্যে যুদ্ধের পর প্রগতির দিকে কিছুটা অগ্রগতি দেখা যায় — এই দেশগুলির পক্ষে আর্থনীতিক উন্নয়নের পুঁজিতান্ত্রিক পর্বটা অপরিহার্য, এই উক্তিটাকে কি আমাদের নির্ভুল বলে ধরতে হবে? আমরা 'না' উত্তর দিয়েছি।'**

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 33, p. 480.

** ঐ, ৩১শ খণ্ড, পৃঃ ২৪৪।

সোভিয়েত রাশিয়া, অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী এবং নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন, এই তিনটি মূল বৈপ্লবিক শক্তির মৈত্রী হিসেবে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে লেনিনের ধারণার সঙ্গে অনগ্রসর দেশগুলির সামাজিক প্রগতিসংক্রান্ত তত্ত্বটা ষোল-আনাই মেলে। বিষয়টিকে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন জ্ঞান করে এটাকে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যাপ্তভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে বলে লেনিন বিবেচনা করেছিলেন।

'অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থা' এই পারিভাষিক শব্দটা দেখা দিয়েছিল কিছু পরে। ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বৈপ্লবিক আন্দোলনসংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের দলিলে কথাটা প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল। খুবই গুরুত্বসম্পন্ন এই যে তত্ত্বগত কাজ লেনিন নির্দেশ করে গিয়েছিলেন সেটা নিষ্পন্ন করার প্রয়োজনের কথা ও. কুসিনেন ঐ কংগ্রেসে তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঐ কাজটা হল 'অনগ্রসর দেশগুলিতে অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের সম্ভাবনাটার তত্ত্বগত বাস্তবায়ন। গুরুত্বসম্পন্ন এই তত্ত্বগত বাস্তবায়ন এই খসড়া থিসিসে দেওয়া হয় নি, সেটা নিষ্পন্ন করার চেষ্টাও করা হয় নি। বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার সুযোগ আমরা পাই নি।'* আলোচনায় মতদ্বৈধতা প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু বক্তারা মোটের উপর একমত হয়েছিলেন যে, যেসব দেশে স্থানীয় বুর্জোয়ার অস্তিত্ব নেই এবং যেসব দেশে আমদানি-করা পুঁজিতন্ত্র আছে কিন্তু বুর্জোয়া রাজ নেই, কেবল সেইসব দেশেই অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ সম্ভব। ভারত কিংবা চীনের মতো যেসব দেশ চলছিল তাদের বিপ্লবের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পর্বের ভিতর দিয়ে সেখানে অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের প্রশ্নই একেবারেই ওঠে না এমনটা বলা হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন কোন জাতির এবং মঙ্গোলিয়া জনগণের প্রজাতন্ত্রের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েও ধারণাটা পরে যথার্থ প্রতিপন্ন হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা এখন চারদিকে দ্রুত ভেঙে পড়ছে, বিকাশের পথ বেছে নেওয়াটা উঠতি দেশগুলির সামনে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠছে — এখন বৈজ্ঞানিক আর রাজনীতিক উভয়

---

* 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৬ষ্ঠ কংগ্রেস', কার্যবিবরণী, ৪ নং সংখ্যা, মস্কো-লেনিনগ্রাদ, ১৯২৯, পৃঃ ৬ (রুশ সংস্করণ)।

দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক প্রগতিসংক্রান্ত তত্ত্ব আবার খুব জরুরী হয়ে উঠেছে।

এই জটিল প্রশ্নটার সমস্ত দিক এখনই সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাস্তবায়িত করে তুলে বিবেচনা করবার সময় এখনও হয় নি। মোটের উপর এখন আলোচিত হচ্ছে তিনটে বিষয়: (ক) 'অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ' এই কথাটা আলোচ্য প্রক্রিয়াটার অর্থ কতখানি পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করছে? (খ) এই ধারণাটা নিয়ে একটা বিস্তৃত ভাষ্য দেওয়া উপযোগী, না, কোন অনগ্রসর দেশে **বিকাশের পুঁজিতান্ত্রিক পর্ব এড়িয়ে** সমাজতন্ত্র গড়ার সম্ভাবনা হিসেবে — সম্পূর্ণত এই হিসেবেই 'অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশকে' বুঝতে হবে? (গ) উঠতি দেশগুলির বিকাশের দুটো পর্বের মধ্যে, অর্থাৎ কিনা অপুঁজিতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক পর্বের মধ্যে, যথাতথ কোন পার্থক্য টানার যথার্থ কোন অর্থ হয়, না, ঐ দুটো মূলত একই?

আলজিরিয়ার 'এল-মুজাহিদ' পত্রিকার ১৯৬৮ সালের ১২ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত একটা প্রবন্ধে কার্যত 'অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থা' কথাটার ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছিল, কথাটাকে 'ব্যবহার করা হচ্ছে এলোমেলোভাবে -- তাতে অনেক সময়ে এমন বিভিন্ন ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যেগুলি তাদের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াপ্রণালী উভয়তই সম্পূর্ণ অসদৃশ'। কথাটা সম্বন্ধে পত্রিকাটির প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, ''অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থা' কথাটা তার শব্দপ্রয়োগেই নেতিবাচক। এতে যে ব্যবস্থা ধরে নেওয়া হয়েছে সেটা এমন পথে চলে যা গিয়ে পড়ে 'অপুঁজিতন্ত্রে', অর্থাৎ, পুঁজিতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছুতে — যদিও সেই 'কিছু'টা যে কী তার কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয় নি। যদি ধরে নিই যে, এই 'কিছু'টা সমাজতন্ত্রও নয় — কেননা, এতে সমাজতান্ত্রিক পন্থার কোন উল্লেখ নেই — তাহলে আলোচ্য কথাটা কোন তৃতীয় পন্থারই নির্দেশ করছে না কি?'

যে লেখকের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল তিনি অবধারণ-প্রক্রিয়ায় পরিভাষাকে গুরুত্বসম্পন্ন বিবেচনা করে খুব ঠিকই করেছেন। পরিভাষার অযথাতথতা এবং অসামঞ্জস্য মত-বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং অনেক সময়ে আলোচ্য বিষয়ের মর্ম সম্বন্ধে বিকৃতিও ঘটায়। কাজেই, যথাতথ পরিভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন। এই অর্থে, 'অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থা' বলতে যা বুঝাতে চাওয়া হয় সেই প্রক্রিয়াটার যথেষ্ট যথাতথ এবং পূর্ণাঙ্গ

বর্ণনা হয়ত ঐ কথাটা দিয়ে হয় না। কিন্তু, উদ্ধৃত প্রবন্ধটির লেখক যেটাকে আলোচ্য কথাটার একটা ত্রুটি বলে মনে করেন (তিনি মনে করেন, ''অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থা' কথাটা তার শব্দপ্রয়োগেই নেতিবাচক') ঠিক সেটাকেই আমরা কথাটার গুণ বলে মনে করি — কেননা, উত্তরণ-প্রক্রিয়ার মর্মটাই কথাটায় নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, এই উত্তরণকালে নঞর্থক লক্ষ্যগুলিই তো প্রধান।

অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে নিম্নলিখিত তিনটে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান বিবেচনায় ধরা দরকার:

ক) তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির আর্থনীতিক অনগ্রসরতা এবং সেখানে সামাজিক সম্পর্কের অপ্রতুল বিকাশ;

খ) চলতি জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব বিকশিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবার সম্ভাবনা, এবং

গ) সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অস্তিত্ব এবং বিশ্ব ঘটনা বিকাশের উপর তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব।

উঠতি দেশগুলির সামাজিক-আর্থনীতিক অনগ্রসরতা থেকেই সাধারণত 'তৃতীয় পন্থার' কথা ওঠে — ঐ অনগ্রসরতা সামাজিক প্রগতির প্রতিবন্ধক হতে পারে না। উপনিবেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্রের প্রবর্তন ঐ দেশগুলির সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত, এই ধারণাটাকে লেনিন প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করে গেছেন। আর্থনীতিক বিচারে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি শিল্পে-অনগ্রসর দেশগুলির চেয়ে সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি, এটা অনস্বীকার্য — কেননা, 'রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র হল সমাজতন্ত্রের জন্যে পূর্ণাঙ্গ **বৈষয়িক** প্রস্তুতি, সমাজতন্ত্রে প্রবেশস্থল — ইতিহাসের সিঁড়িতে যে ধাপটা আর সমাজতন্ত্র নামে ধাপটার মধ্যে কোন **অন্তর্বর্তী ধাপ নেই**'।* এই অর্থে 'সমাজতন্ত্র নিছক রাষ্ট্রীয়-পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া **যেটাকে দিয়ে সমগ্র জনগণের স্বার্থের সেবা করানো হয়** এবং সেই পরিসরে সেটা আর পুঁজিতান্ত্রিক একচেটিয়া **থাকে না**'।** লেনিন যে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'একটা স্পষ্ট-নির্দিষ্ট মাত্রার পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ না থাকলে আমরা সাফল্য লাভ করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'***, এটাও প্রাসঙ্গিক।

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 25, p. 359.

** ঐ, পৃঃ ৩৫৮।

*** 'লেনিন রচনা-সংগ্রহ-১১', পৃঃ ৩৯৭।

অতি-সরলভাবে এবং হড়বড়িয়ে কেউ সিদ্ধান্ত করে বসতে পারে যে, নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশ এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণ বুঝি সহজেই ঘটানো যেতে পারে যেন প্রচন্ড প্রচেষ্টা ছাড়াই, যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে প্রধানত ঐ রাষ্ট্রগুলির নিজেদেরই — এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি রয়েছে লেনিনের বক্তব্য থেকে ঐ উদ্ধৃতিকটিতে।

অবশ্য তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, সমাজতন্ত্রের জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বৈষয়িক পূর্বশর্ত সুপরিণত হওয়া অবধি এবং, বিশেষ-নির্দিষ্টভাবে, রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র কায়েম হওয়া অবধি অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলির নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকাই যেন 'অদৃষ্টের বিধান'। এইরকমভাবে দেখাটা সাফল্য নিশ্চিত করতে অপারগ বলে মার্কসবাদ এটাকে প্রত্যাখ্যান করে। এ ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট প্রতীক্ষার অর্থ হল উপনিবেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্রকে বদ্ধমূল হবার সুযোগ দেওয়া, — স্মরণ থাকতে পারে, তেমন সুযোগ দেবার মনোভাব যারা অবলম্বন করে তাদের সবারই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন লেনিন।

বিশেষত পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রার দিক থেকে উঠতি দেশগুলি বিভিন্ন রকমের। এর কোন কোন দেশ গড়পড়তা মাত্রায় উঠেছে। অন্য কোন কোন দেশকে বলা যায় আধা-পুঁজিতান্ত্রিক — এইসব দেশে রয়েছে সামন্ততন্ত্রের এবং অনেক সময়ে গোষ্ঠীতন্ত্রের বিভিন্ন জোরালো অবশেষ। আরও কোন কোন দেশ রয়েছে আদিম পুঁজিতান্ত্রিক পুঞ্জীভবনের একেবারে সবার নিচের ধাপে। কখনও কখনও আরও এক রকমের কোন কোন দেশ দেখা যায় — সেগুলির বিকাশ সামন্ততান্ত্রিক কিংবা প্রাক্‌সামন্ততান্ত্রিক পর্বেই থেমে রয়েছে। নতুন স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে এমন একটি দেশও নেই যার অর্থনীতি বিশুদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক — যাতে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের কোন সংমিশ্রণ নেই। পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রার দিক থেকে, পুঁজিতান্ত্রিক সুপরিণত অবস্থার দিক থেকে এই দেশগুলি পৃথক পৃথক, কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক পর্ব এড়িয়ে এগিয়ে যায় নি এর কোন দেশই। কাজেই, পথ বেছে নেবার প্রশ্ন কিংবা অপুঁজিতান্ত্রিক ধারায় বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির শুধু কোন একটা গ্রুপেরই সামনে, এমন কথা বলা সমীচীন হবে না। যেসব দেশ অপুঁজিতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছে, যারা চলেছে পুঁজিতান্ত্রিক

পথ ধরে, আর যারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও করে নি — সমস্ত উন্নয়নশীল দেশেই সংঘাতের রশ্মিকেন্দ্রটা হল মূল সমস্যা।

যেসব দেশে পুঁজিতন্ত্র কিছুটা বদ্ধমূলই হয়েছে সেগুলি সমেত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি সামাজিক এবং আর্থনীতিক দিক দিয়ে অগ্রসর দেশগুলির থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, এই বাস্তবতাই অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের সমস্যাটার মোটামুটি ব্যাখ্যা দেবার প্রেরণা যুগিয়েছে। এই সামাজিক-আর্থনীতিক অনগ্রসরতার দরুন এই দেশগুলিতে সক্রিয় বিভিন্ন প্রক্রিয়া আরও জটিল হয়ে ওঠে, তেমনি এই দেশগুলির অনগ্রসর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে অগ্রসর সমাজে উত্তরণের ক্ষেত্রে প্রায়ই সহজেই রাজনীতিক সুস্থিতি নষ্ট হয়, আকস্মিক দিকপরিবর্তন ঘটে, ঘটে বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় আর সুতীব্র শ্রেণী-সংঘাত।

উন্নয়নশীল দেশগুলির একটা বিশেষক উপাদান হল এই যে, পুঁজিতন্ত্র যখন একটা সমাজ-ব্যবস্থা হিসেবে নিজের সময় ফুরোবার পরও টিকে রয়েছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থনীতিক বিকাশ আর সামাজিক প্রগতি সুনিশ্চিত করতে অপারগ, এমনই একটা যুগে উন্নয়নশীল দেশগুলি বিকাশের পথে স্বাধীনভাবে যাত্রা শুরু করছে।

আলোচ্য দেশগুলিতে আর্থনীতিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিতন্ত্রের কোন ভবিষ্যৎ নেই, তেমনি রাজনীতিক ক্ষেত্রেও পুঁজিতন্ত্র আক্রমণস্থল। সমকালীন পুঁজিতন্ত্রের বিভিন্ন প্রতিনিধিও বাধ্য হয়ে স্বীকার করেন যে, 'কোন কোন লাতিন আমেরিকান ছাড়া জাতীয়তাবাদী নেতারা বিকাশের পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালীটাকে শ্লথ, অকার্যকর এবং তাঁদের অবস্থায় অনুপযোগী বলে প্রত্যাখ্যান করায় একমত।'*

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের প্রাক্তন ঔপনিবেশিক উপান্তে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথই শুধু পরিষ্কার করে দেয় — আমাদের একালের জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলিকে সেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসেবে দেখা চলে না, এই জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের প্রকৃতি থেকেই এসেছে অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থার ধারণাটা। জাতীয়-মুক্তির আর সমাজতান্ত্রিক, এই দুই রকমের বিপ্লব আমাদের একালে পরস্পরের আরও কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব প্রায়ই গোড়ায় পরিচালিত

---

* *The Ideologies of the Developing Nations,* New Jork, London, 1963, p. 12.

হয় সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক রাজের বিরুদ্ধেই শুধু নয় — এটা পরিচালিত হয় কিছু পরিমাণে পুঁজিতন্ত্রেরও বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কিনা, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় সেই একই শত্রুর বিরুদ্ধে। তবে, ঐ কারণে জাতীয় মুক্তির বর্তমান পর্বটাকে সমাজতান্ত্রিক পর্বের সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরাটা ভুল হবে --- কেননা, জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের লক্ষ্যের প্রকৃতি হল সাধারণ গণতান্ত্রিক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সমকালীন জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনকে বলা যায় উত্তরণকালীন ধরনের বিপ্লব --- এতে বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন কোন উপাদান বজায় থাকলেও এই বিপ্লব ক্রমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিভিন্ন বিশেষক উপাদান পায়। লেনিন তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন যারা 'মার্কসবাদকে এমন একটা শোচনীয় উদারনীতিক বিকৃত রূপে পরিণত করে যাতে তাদের দৃষ্টিতে বুর্জোয়া বিপ্লব আর প্রলেতারীয় বিপ্লবের মধ্যে প্রতীপ-স্থাপনার (অ্যাণ্টিথিসিস্) বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, আর ঐ প্রতীপ-স্থাপনাকেও তারা চূড়ান্ত নির্জীবভাবেই ব্যাখ্যা করে'।*

তাহলে, জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে অভিন্ন অঙ্গ-উপাদান কী, আর এই দুই বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্যই বা কী? অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের অর্থের ক্ষেত্রে ঐ প্রশ্নটার প্রত্যক্ষ তাৎপর্য আছে।

মানবজাতি এখন চলেছে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্যায়ের ভিতর দিয়ে, বহু বিভিন্ন ধরন আর রকমের বৈপ্লবিক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিয়ে এই কালপর্যায়; এইসব আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অভিন্ন, কিন্তু বিভিন্ন চলতি করণীয় কাজের দিক দিয়ে সেগুলি বিভিন্ন। কাজেই, বিভিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলন আর ধারাকে কৃত্রিমভাবে বিভিন্ন বর্গে শ্রেণীবিভক্ত করা এবং সেগুলির মধ্যে কোনই পার্থক্য না ধরা, এই দুই সমানই বিপজ্জনক।

আলোচ্য দুই ধরনের বিপ্লব চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিক দিয়েই শুধু নয়, বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক সংস্কার সাধনের কোন কোন পদ্ধতি আর কৌশলের দিক থেকেও অনুরূপ।

যেসব করণীয় কাজ সাধারণত নিষ্পন্ন হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দিয়ে, এমন বিভিন্ন কাজ সমকালীন জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব হাতে নেয় এবং অনেক

V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 25, p. 416.

সময়ে সেগুলি নিষ্পন্নও করে। এই সম্ভাবনা আগেই লক্ষ্য করে লেনিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে বলেছিলেন, 'বিশ্ব বিপ্লবের ক্ষেত্রে আসন্ন সব চূড়ান্ত লড়াইয়ে পৃথিবীর জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু অংশের আন্দোলন গোড়ায় জাতীয় মুক্তির অভিমুখ পরিচালিত হয়ে পুঁজিতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘুরে যাবে।'*

তবু, এই দুই ধরনের বিপ্লবের মধ্যে মোটারকমের পার্থক্যও আছে। যেমন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিষ্পন্ন করার পরে সংশ্লিষ্ট দেশটি সঙ্গে সঙ্গেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার কাজ হাতে নেয়। সেটা পারে তার কারণ বিদ্যমান বিভিন্ন আবশ্যিক সামাজিক-আর্থনীতিক উপাদানের অনুপূরক হয় সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের জন্যে অত্যাবশ্যক বিভিন্ন রাজনীতিক উপাদানের উপস্থিতি — সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রেণী এবং তার পার্টির পরিচালনা।

বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক সংস্কার জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের আশু লক্ষ্য নয়। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক উপাদান সুপরিণত হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট সময় কেটে গেলে একমাত্র তবেই ঐসব সংস্কার হাতে নেওয়া হয়। কাজেই, জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব নিষ্পন্ন হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট মুক্ত দেশটিতে সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ বাস্তবে আরম্ভ হবার সময়ের মধ্যে থাকে একটা ঐতিহাসিক কালপর্যায় — সেটার দৈর্ঘ্য এবং বিভিন্ন বিশেষক উপাদান সম্ভবত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হবে।

অন্যদিকে, এই সবেতে একটা অভিন্ন উপাদান আছে: মুক্ত দেশগুলিতে শেষপর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজের সূচনা করার জমিন তৈরি করবে যেসব সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক প্রক্রিয়া, ঐ রকমের কালপর্যায়ে সেগুলির ভার থাকে বিভিন্ন অপ্রলেতারীয় স্তরের উপর। প্রলেতারিয়েত যখন রূপ ধারণ করে, এই প্রলেতারিয়েত যখন শ্রেণী হিসেবে নিজ সত্তা সম্বন্ধে সচেতন, এই প্রলেতারিয়েত যখন মেহনতী এবং শোষিত জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবার ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনীতিক শক্তি হয়, আর এই প্রলেতারিয়েতের যখন থাকে রাজনীতিক পার্টি, যে-পার্টি সংগ্রামের লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণত অবহিত, যে-পার্টির থাকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচি, তখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিষ্পন্ন

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 32, p. 482.

হয়। যেসব দেশে জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব নিষ্পন্ন হয়েছে সেগুলিতে এইসব গুরুত্বসম্পন্ন রাজনীতিক উপাদানের কোনটাই এখন অবধি নেই। ঐসব দেশে মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল যেসব পার্টি, যেসব পার্টি ছিল জাতীয় বুর্জোয়াদের এবং কিছু পরিমাণে অপ্রলেতারীয় পেটি বুর্জোয়া স্তরগুলির প্রতিনিধি, সমাজের পুনঃসংগঠনের কোন সুস্পষ্ট এবং নিশ্চিত কর্মসূচি তাদের ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী-ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানোই ছিল ঐসব পার্টির মূল লক্ষ্য। এর কোন দেশই এখনও অবধি যথার্থই সমাজতন্ত্র গড়তে আরম্ভ করে নি। সমাজতান্ত্রিক বিকাশ, যা আরম্ভ হবে পরে, ক্রমে তার জন্যে **প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলি জড়ো করে তোলার** পর্বেই তারা এখন রয়েছে।

কাজেই, বেশির ভাগ মুক্ত দেশে জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের পরে যে উত্তরণ-কালপর্যায় আসে তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে আরব্ধ পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্যায়কে এক এবং অভিন্ন করে দেখা ভুল। জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের পরবর্তী কালপর্যায়ের দুটো পর্ব থাকে। মুক্ত দেশগুলি এখন চলেছে তার প্রথম পর্বের ভিতর দিয়ে — এটা হল সামাজিক-শ্রেণীগত এবং রাজনীতিক শক্তিগুলির ক্রমবৃদ্ধি, গঠন আর সংগঠনের কাল, অর্থাৎ কিনা, পরে সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক উপাদানগুলির সমাবেশের কাল। দ্বিতীয় পর্বে আসে যথার্থ সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ। কাজেই, এই দুটি পর্বকে, কিংবা, 'অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থা' আর 'সমাজতান্ত্রিক বিকাশ' এই দুটি ধারণাকে কখনও তালগোল পাকিয়ে দেখা চলে না। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের উপাদানগুলিকে খাটো করে দেখা, আর সমাজতন্ত্রের অবস্থানকে বাড়িয়ে দেখা, এই দুইই সমান বিপজ্জনক; ঐ দেশগুলি কোন্ পথে চলবে সে সম্বন্ধে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে, এই রকমের ভুয়া ধারণা উভয় ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হতে পারে। এই গুরুত্বসম্পন্ন সমস্যাটার ব্যাপারে যেকোন হঠকারী কিংবা একপেশে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঘানা এবং আরও কোন কোন দেশের ঘটনাবলি হুঁশিয়ারি হয়ে এসেছে।

যেসব দেশে একাধিক রকমের আর্থনীতিক উপাদান আর অপরিণত সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে সেইসব দেশে একটা আবশ্যিক পর্ব হিসেবে দেখলে অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের অর্থ হল, সর্বোপরি, বিভিন্ন সামাজিক

আর শ্রেণীগত শক্তির বিকাশ এবং আরও সুস্পষ্ট পৃথগভবন, ঐসব শক্তির এমন ক্রমবিন্যাস যাতে যেসব শ্রেণী আর রাজনীতিক শক্তি সমাজতন্ত্রের উত্তরণ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের সার্থক রূপায়ণ নিশ্চিত করতে পারে তাদেরই হাতে বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক আর রাজনীতিক প্রক্রিয়ার পরিচালন আসে। শ্রমিক শ্রেণী এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর অবস্থানকে মজবুত করে তোলাই আসল গুরুত্বসম্পন্ন ব্যাপার। প্রগতিশীল অপ্রলেতারিয়ানদের রাজনীতিক এবং মতাদর্শগত চিন্তাধারা ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের দিকে ঝোঁকে — যদিও, নিঃসন্দেহেই, এই প্রক্রিয়াটার জন্যে সময় লাগে, হয়ত কয়েক দশকই। এই প্রক্রিয়াটায় সময় যত কম লাগবে ততই ছোট হবে অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের কালপর্যায় — সেটা অবশ্য বহিস্থ উপাদানের চেয়ে বিভিন্ন আভ্যন্তরিক উপাদানের উপরই বেশি নির্ভর করবে।

জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের বিকাশের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরিক এবং বহিস্থ উপাদানগুলির বিকাশের মধ্যেকার যে সম্পর্ক তার একটা গুরুত্বসম্পন্ন তাৎপর্য রয়েছে অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপলব্ধির ক্ষেত্রে। এটা তো সবারই জানা কথা যে, বিভিন্ন বহিস্থ উপাদান, সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রসার আর শক্তিবৃদ্ধি এবং সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ারের মতো উপাদানগুলি জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে আসছে। পৃথিবীতে শক্তির অনুপাত শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়ে চলবার ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সমর্থনপুষ্ট কোন ক্ষুদ্র দেশও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজ স্বার্থ অনুযায়ী বিকাশের পথ বেছে নিতে পারে।

তবে, অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশ থাকলে তারই ফলে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান আপনা থেকে নিশ্চিত হয়ে যায় না, বিভিন্ন আভ্যন্তরিক কর্মনীতিক্ষেত্রে তো নয়ই। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশু আর সবচেয়ে প্রবল প্রভাব পড়ে বিভিন্ন আভ্যন্তরিক উপাদানের — যেমন, বিভিন্ন সামাজিক, শ্রেণীগত আর রাজনীতিক শক্তির অনুপাত, জনগণের সক্রিয়তার মাত্রা, জাতীয় বিপ্লবের কাজে প্রাপ্তিসাধ্য সমস্ত বৈষয়িক সম্পদ আর লোকবলের সফল

সমাবেশ এবং জাতীয় বিপ্লবের সেবায় সেগুলি লাগানোর ক্ষমতা। সামাজিক প্রগতির আভ্যন্তরিক এবং বহিস্থ উপাদানগুলির যুক্তিসম্মত পারস্পরিক ক্রিয়া নিশ্চিত করার মতো সুফলপ্রসূ রাজনীতিক আর আর্থনীতিক কাঠামের মজবুত বনিয়াদ সংশ্লিষ্ট দেশে থাকলে একমাত্র তবেই সেখানে বাইরের সাহায্য কার্যকর হতে পারে।

শিল্পে অগ্রসর দেশগুলির দেওয়া বাইরের সাহায্য ছাড়া তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির চলে না, এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু, এ কথাও মানতে হয় যে, বাইরের সাহায্য যতই বিস্তৃত হোক না কেন, সাহায্য-গ্রহীতা দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার সমর্থন ছাড়া সেটা কার্যকর হতে পারে না। সর্বাত্মক সৃজনশীল প্রচেষ্টায় সমগ্র জাতির সমবেত হওয়াই যথেষ্ট নয় — যদিও, সেটা ছাড়া কোন নতুন সমাজ কখনও গড়া যায় না। বিপ্লবের ফল সম্বন্ধে সমগ্র মেহনতী জনগণকে অবহিত করা দরকার — এটা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। অর্জিত সাফল্যগুলিকে সক্রিয়ভাবে রক্ষা করতে সেটা সহায়ক হবে।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার যে, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিভিন্ন পশ্চিমী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়যাত্রা সূচিত করে দেবে, আর এইভাবে অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে বিকাশের যন্ত্রণাকর পুঁজিতান্ত্রিক পর্ব এড়িয়ে এগিয়ে চলা সম্ভব করে তুলবে, এমন মনে করেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থার তত্ত্বটিকে রচিত এবং বিকশিত করে তুলেছিলেন। প্রধান প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হলে অনগ্রসর দেশগুলির বিভিন্ন অগ্রসর দেশের নাগাল ধরে ফেলা ঢের বেশি সহজ হত নিশ্চয়ই। তবে, একমাত্র অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সমাজতন্ত্রের জয়ের উপরই সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রসার নির্ভর করে না — এই প্রসারের ক্ষেত্রে অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলিরও অবদান আছে। দৃষ্টিগোচর ভবিষ্যতেই আর্থনীতিক এবং সামাজিক বিচারে অনগ্রসর দেশগুলি পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবার ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রসার ঘটা সম্ভব। এই সম্ভাবনার বিষয়ে সমস্যাটার আরও ধীর-স্থির বিচার-বিশ্লেষণ দরকার।

কখনও কখনও বলা হয়ে থাকে, পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক বিজয় না হওয়া অবধি নতুন স্বাধীন দেশগুলির প্রগতিশীল মহল পরিস্থিতি ষোল-আনা আয়ত্ত করে তাদের দেশগুলিকে সমাজতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে

সাধারণত বলা হয়ে থাকে, কোন দেশকে বিকাশের অপ্রঁজিতান্ত্রিক পন্থায় তুলে ধরবার উপযোগী বিভিন্ন মূলগত সংস্কার চালু করবার জন্যে সংশ্লিষ্ট দেশে বৈপ্লবিক-মনোভাবাপন্ন জাতীয়-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি যখনই চেষ্টা করেছে তখনই জাতীয় বিপ্লব হোঁচট খেয়েছে, স্থানীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীরা জয়লাভ করেছে। ঘানার ব্যাপারে এই যুক্তিটা প্রতিপন্ন হয়েছে বলে মনে হতে পারে। তার থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়, যেহেতু মুক্ত দেশগুলির অপ্রঁজিতান্ত্রিক ধারায় বিকাশকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পুরোপুরি নিশ্চিত করতে পারে না, তাই কার্যক্ষেত্রে সমস্যাটার কোন বাস্তব সমাধান নেই — কাজেই, ওটা নিছক তত্ত্বগত কথা হয়েই থাকবে। কেউ কেউ এমন কথাও তোলে যে, এমন পরিস্থিতিতে প্রগতিপন্থীরা কিছু ঘটাবার চেষ্টা না করে শুধু অপেক্ষা করে দেখতে থাকুক কবে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিকাশের মাত্রা এমন হবে যাতে রাজনীতিক কিংবা আর্থনীতিক কোন রকমের আভ্যন্তরিক জটিলতা সৃষ্টি না করেই প্রায় আপনা থেকেই মুক্ত দেশগুলির অপ্রঁজিতান্ত্রিক পন্থায় উত্তরণ ঘটে যাবে। ইতোমধ্যে, কার্যক্ষেত্রে কম-বেশি যেকোন লক্ষণীয় প্রচেষ্টা থেকে বিরত থেকে অপ্রঁজিতান্ত্রিক পন্থা সম্বন্ধে কেবল প্রচার চালানোই যথেষ্ট।

অল্প কিছুকাল আগে অবধিও অপ্রঁজিতান্ত্রিক বিকাশসংক্রান্ত আলোচনায় প্রায় সবটা জোরই দেওয়া হত বাইরের উপাদানের উপর — এই সমস্যার সমাধানটাকে সহজ-সরলই বলা হয়েছে,* আর আজকাল, বিশেষত ঘানা আর ইন্দোনেশিয়ার ঘটনাবলির পর থেকে মতামত একেবারে উল্টো প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনও প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে যে, উন্নয়নশীল

---

* সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন কোন জাতি প্রঁজিতান্ত্রিক পর্ব এড়িয়ে বিকাশের সমাজতান্ত্রিক পর্বে প্রবেশ করেছিল, তাদের অভিজ্ঞতাটাকে এশিয়া আর আফ্রিকার মুক্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে খাটাবার জন্যে কখনও কখনও চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এই চেষ্টার মধ্যে ভুলে যাওয়া হয়েছে যে, ঐসব জাতির ক্ষেত্রে সামাজিক বিকাশ ঘটেছে একই রাষ্ট্র আর একই আর্থনীতিক ব্যবস্থার কাঠামের মধ্যে আর সেখানে সরকারের পরিচালক হল একই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি। একই রাষ্ট্রের ভিতর কোন অনগ্রসর জাতিকে অগ্রসর জাতির স্তরে তোলা এক-জিনিস, আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের অপ্রঁজিতান্ত্রিক পন্থায় উত্তরণ ঘটানো একেবারে অন্য জিনিস। দুঃখের কথা, এই সব মৌলিক পার্থক্য সব সময়ে বিবেচনায় ধরা হয় নি।

দেশগুলির অপুঁজিতান্ত্রিক পথ ধরা অসম্ভব — দৃষ্টিগোচর ভবিষ্যতে তো নয়ই। যেমন, বলা হয়, অপুঁজিতান্ত্রিক পথ ধরার চেয়ে 'গণতান্ত্রিক' পুঁজিতন্ত্রের জন্যে চেষ্টা করাই হবে ঐ দেশগুলির পক্ষে বেশি বাস্তবতা-সম্মত এবং তাদের এখনকার সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের মাত্রার অনুযায়ী।

নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশে উত্তরণের সঙ্গে অনেক সময়ে যেসব বাধাবিঘ্ন আর জটিলতা আসে তাতে এই ধারণাটাই সুষ্ঠু নয় বলে প্রমাণিত হয় না। অনেক সময়েই বরং দেখা যায়, বিভিন্ন বহিস্থ এবং আভ্যন্তরিক উপাদান যথোপযুক্তভাবে বিবেচিত হয় নি এবং সেগুলির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয় নি বলে, কালসংক্রান্ত বিষয়টা উপেক্ষা করা হয়েছে ব'লে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেকোন প্রগতিশীল সংস্কারকে সমাজতান্ত্রিক ব'লে যারা ধরে নেয় তাদের অধৈর্যপনার দরুনই ঐসব বাধাবিঘ্ন ঘটে।

অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের কালপর্যায়ে যেসব কাজ নিষ্পন্ন করতে হয় তার বেশির ভাগেরই প্রকৃতি খণ্ডনমূলক, — পূরন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক আর্থনীতিক আর সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা এবং পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানার উপর অল্প-বিস্তর বাধানিষেধ চাপানোর সঙ্গে সেগুলি সংশ্লিষ্ট। পরবর্তী পর্ব — বিকাশের সমাজতান্ত্রিক পর্বটি প্রধানত সৃষ্টি আর নির্মাণের সমস্যাবলিরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট — সেই পর্বে এগিয়ে যাবার আগে কোন কোন অগ্রসর উঠতি দেশের ক্ষেত্রে যেসব বাধাবিঘ্ন আসে, যেগুলি প্রধানত আর্থনীতিক, সেগুলির উৎস সম্ভবত ওটাই। এই দ্বিতীয় পর্বটা সম্ভবত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর হবে — কেননা, চূড়ান্ত আর্থনীতিক আর সামাজিক অনগ্রসরতার অবস্থায়ই চালাতে হবে সমাজতান্ত্রিক গড়ার কাজ। স্বাধীনতা অর্জিত হবার আগে কোন দেশ যত বেশি অনগ্রসর, উপনিবেশবাদীদের রেখে-যাওয়া জেরগুলো যত বেশি গুরুভার, সংশ্লিষ্ট দেশ সামাজিক প্রগতির কর্মসূচি অনুসারে কাজ আরম্ভ করলে সে দেশের মানুষের সামনে সমস্যাবলিও হবে ততই বেশি জটিল, নতুন সমাজ গড়ার জন্যে প্রচেষ্টাও দরকার হবে ততই বেশি।

এখন বলা চলে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক আর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে এইসব দেশের সম্পর্কটা বিকাশের পথ বেছে নেবার এই সমস্যার উপর নির্ভর করছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলি শেষপর্যন্ত কোন্ পথ বেছে নেয় সেটা দিয়ে বহুলাংশে নির্ধারিত হয় যেমন ঐসব দেশের ভাগ্য, তেমনি, শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর আপেক্ষিক শক্তিও।

৩। রাষ্ট্রের ভূমিকা

উত্তরণকালে রাষ্ট্রের ভূমিকা অসাধারণ গুরুত্ব ধারণ করে; জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব এবং সামাজিক প্রগতির লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করাই তখন রাষ্ট্রের কাজ। সংশ্লিষ্ট উঠতি দেশটিতে বিদ্যমান অনন্যসাধারণ সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অনুসারেই রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হওয়া চাই। এইসব অবস্থা কী সেটা আরও খুঁটিয়ে দেখা যাক।

এক, জনসংখ্যায় কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা; রাষ্ট্রীয় কর্মনীতি নির্ধারণের উপর কৃষকের প্রভাব কখনও কখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক হয়।

দুই, জাতীয় বুর্জোয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ যেকোন সময়েরই মতো তীব্র থাকে, তার ফলে জাতীয় বুর্জোয়ারা সম্মিলিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় সমাবেশে এসে পড়ে — সেটা রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের কালপর্যায়েই কেবল নয়, বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কারসাধনের সময়েও।

তিন, প্রলেতারিয়েত গড়ে ওঠে জাতীয় বুর্জোয়াদের বিকাশের চেয়ে দ্রুত; উঠতি দেশগুলির জাতীয় সম্পদ হস্তগত করে বৈদেশিক একচেটিয়া কারবারগুলি — প্রধানত সেগুলিরই বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম পরিচালিত হয়।

চার, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করার জন্যে ঔপনিবেশিক জাতির সংগ্রাম চালাবার সময়ে জাগ্রত হয় জাতীয়তার মনোভাব, সেটা সমস্ত দেশপ্রেমিককে সমবেত করে। এই জাতীয় মনোভাব আর জাতীয় ঐতিহ্য দীর্ঘকাল যাবত উপনিবেশবাদীদের পদদলিত হয়ে এসেছে — উপনিবেশবাদীরা বিজিত জাতিগুলির উপর বিজাতীয় জীবনযাত্রা আর ভাব-ধারণা চাপিয়ে ব্যক্তিত্ব বর্জিত করে তুলতে চেষ্টা করেছে। কাজেই, স্বাধীনতার জন্যে যারা সংগ্রাম চালিয়েছে এমন অনেক দেশেই জাতীয়তাবাদ হয়ে উঠেছে একটা চালিকাশক্তি এটা আশ্চর্য হবার কিছু নয়।

বিভিন্ন জাতীয় এবং সামাজিক লক্ষ্যের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয়সাধন করা উত্তরণকালের রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন কাজগুলিরই একটা। এই পর্বে রাষ্ট্র কোন একটা শ্রেণীর একনায়কত্ব নয়। বহু ক্ষেত্রেই, সমস্ত জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমিক শক্তির সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্যে রাষ্ট্র সচেষ্ট হয়, এইসব শক্তি — কৃষককুল, শ্রমিক শ্রেণী, জাতীয় বুর্জোয়া, মধ্যবিত্তরা এবং বুদ্ধিজীবিসম্প্রদায় — জোটবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন হয়। কিন্তু, তাই, বলে, বিভিন্ন শ্রেণী কিংবা তাদের বৈরিতার সমন্বয়সাধনের জন্যে রাষ্ট্র চেষ্টা করে, এমন নয়। এশিয়ায় এবং, বিশেষত, আফ্রিকায় দেখা গেছে, কোন কোন রাষ্ট্র দেখা দেয় যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-বিরোধ বিষয়গতভাবে সমন্বয়সাধনের অতীত, কেবল এমন ক্ষেত্রেই নয়, আরও এমন ক্ষেত্রেও যেখানে এইসব দ্বন্দ্ব-বিরোধ সুপরিণত হয়ে তীব্র বৈরিতা রূপে দেখা দেয় নি — সেক্ষেত্রে শ্রেণীগত পৃথগ্ভবন ঘটে জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হবার পরে। এর থেকে আলোচ্য দেশগুলিতে রাষ্ট্রসংক্রান্ত প্রশ্নে এবং শ্রেণী-সংগ্রামের প্রকৃতিতে একটা নতুন দিক দেখা দেয়। বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীগত বৈরিতা প্রকোপিত হবার আগেই জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে।

চীনের নেতাদের একটা পুরন এবং এখনও চালু তত্ত্ব আছে যে, সমাজতন্ত্র যত কাছে ঘনিয়ে আসে শ্রেণী-সংঘাতও ততই বেশি তীব্র হয় — কখনও কখনও প্রশ্ন ওঠে উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে, নির্দিষ্টভাবে এবং বিশেষত যেসব দেশ বিকাশের অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থা বেছে নিয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে ঐ তত্ত্ব কী পরিমাণে প্রয়োজ্য হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতায় তো ঐ তত্ত্ব ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। নির্ভুল কর্মনীতি থাকলে, কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিভিন্ন আকস্মিক-অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটলেও তার ফলে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রকোপবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী নয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে তো দেখা যায় ঐ তত্ত্বের প্রয়োজ্যতা আরও বেশি সংশয়জনক। যেসব দেশে স্বাধীনতা অর্জন করার আগেই পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথে চলা শুরু হয়েছে, স্বাধীনতার পরে পুঁজিতন্ত্র আরও বেশি দৃঢ়মূল হয়েছে, সেইসব দেশ একটা পৃথক শ্রেণীতে পড়ছে — কেননা, পুঁজিতন্ত্র বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব দেশে বিভিন্ন শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং শ্রেণী-সংঘাত সত্যসত্যই তীব্রতর হয়েছে। কিন্তু, যেসব দেশ পুঁজিতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করেছে কিংবা কোন্ পথ ধরবে সেটা এখনও সঠিকভাবে নির্ধারণ করে নি সেসব দেশে বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনীতিক

শক্তির পৃথগ্‌ভবন যা রাজনীতিক স্বাধীনতার পরে ঘটেই তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রকোপবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবীই, এমন নয়।

তত্ত্বগতভাবে, অগ্রসর মুক্ত দেশগুলিতে ক্ষমতাসীন প্রগতিশীল জাতীয় মহলগুলি জাতীয় স্বাধীনতার স্বার্থে সমস্ত কিংবা প্রায় সমস্ত শ্রেণীর মূর্ত-নির্দিষ্ট অবদান ব্যবহার করবে, শ্রেণী-সংগ্রাম প্রকোপিত হবে না, এমনটা সম্ভব। এই রকমের দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রকোপবৃদ্ধি ঘটে যখন কোন একটি শ্রেণী নিজ অধিকারের গণ্ডি পার হয়ে অন্যান্য শক্তির উপর কর্তৃত্ব চালায় এবং জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অর্জিত জাতীয় স্বাধীনতাকে নিজ স্বার্থপর সুবিধার জন্যে ব্যবহার করতে চায়। তবে, সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির মৈত্রী দিয়ে এটা রোধ করা যায়। এরই থেকে এসেছে সম্মিলিত জাতীয়-গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ধারণাটা — এটাকে সামগ্রিক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সঙ্গে বিসদৃশ নিছক সাময়িক কৌশল হিসেবে দেখা চলে না। কোন কোন দেশ যুক্তভাবে নতুন সমাজ গড়ার জন্যে সমস্ত প্রগতিশীল জাতীয় শক্তির রাজনীতিক সম্মিলনের গ্রহণযোগ্য ছাঁদ বের করতে পারে। স্মরণ থাকতে পারে, লেনিন এমন সম্ভাবনাও বাদ দিয়ে রাখেন নি যাতে পুঁজিপতিদের বাধ্য করা যেতে পারে 'শান্তিপূর্ণভাবে সব মেনে নিতে এবং মার্জিত আর সংগঠিত কায়দায় সমাজতন্ত্রের পক্ষে চলে আসতে — যদি তাদের বেশ ভালরকম খেসারত দেওয়া হয়।'* রাশিয়ার বুর্জোয়ারা যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে গঠনমূলক সহযোগিতার ধারণাটাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তার অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য দেশে ভিন্ন পরিস্থিতিতে বুর্জোয়ারা আনুগত্য দেখাতে পারে না। অন্যদিকে, এমনও অবশ্য হতে পারে যে, দেশীয় বুর্জোয়ারা অর্থনীতিগতভাবে দাঁড়িয়ে উঠে রাষ্ট্রের সাহায্যে অন্যান্য শ্রেণী আর সামাজিক গ্রুপের উপর নিজেদের আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা করল এবং দেশটিকে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথে তুলে নিল। এই কারণেই, যা অপুঁজিতান্ত্রিক ধারায় বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এমন জাতীয়-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্যে সংগ্রাম, যা পরিচালিত হয় সরকারী যন্ত্রের ভিতরেও এবং বাইরেও, তাতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীগত শক্তির অনুপাত আর শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা প্রতিফলিত হয়।

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 32, p. 339.

সামাজিক এবং আর্থনীতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর দেশগুলিতে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করার কাজে আর্থনীতিক বিচার-বিবেচনা মুখ্য গুরুত্বসম্পন্ন -- এই কারণেও রাষ্ট্রের ভূমিকা আরও বেশি। সংখ্যা আর অর্থনীতি দু'দিক থেকেই জাতীয় বুর্জোয়ারা দুর্বল — তাই, আর্থনীতিক অগ্রগতির উচ্চতর হার নিশ্চিত করা এবং আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন সংগঠিত করার কাজ পড়ে রাষ্ট্রেরই উপর।

সামাজিক, রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের কার্যত সমস্ত ক্ষেত্রেই জাতীয়-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ক্রমেই বেশি বেশি মাত্রায় জড়িয়ে পড়ে · তাই, নতুন স্বাধীন দেশগুলিতে এই রাষ্ট্রের স্থান আর বিভিন্ন কাজ সুস্পষ্ট করে তোলাটা বিশেষভাবে গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে। অর্থনীতি এবং রাজনীতি ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। তা যে হয়েছে সেটা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের দ্রুত বৃদ্ধি থেকে দেখা যায়; জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে এবং রাজনীতিক, মতাদর্শগত, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত বিভিন্ন সংস্থা স্থাপনের ব্যাপারেও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ক্রমেই বেশি বেশি মাত্রায় গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠছে।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে রাজনীতিক স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রের অধিকতর স্বায়ত্তক্ষমতার ফলে পুরন সরকারী যন্ত্রটাকে গুটিয়ে ফেলা হয় না, তা না ক'রে, সাধারণত ক্রমে এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি আর বিভিন্ন শ্রেণীগত এবং রাজনীতিক শক্তির মধ্যে ক্ষমতার অনুপাত অনুসারে রাষ্ট্রের পুরন কাজ আর করণগুলোকে বাদ দিয়ে দিয়ে সেগুলির জায়গায় নতুন নতুন কাজ আর করণ আনা হয়। ঔপনিবেশিক আমলে রাষ্ট্র যত কম গণতান্ত্রিক থাকে ততই বেশি আদ্যোপান্ত সেটাকে বাতিল করা হয়, তেমনি, উল্টো দিকে, ঔপনিবেশিক আমলে সেটা যত বেশি গণতান্ত্রিক থাকে তার বিভিন্ন কাজ আর করণ ততই বেশি সংখ্যায় নতুন অবস্থায় ব্যবহার করা যায়।

পুরন সরকারী যন্ত্র আর তার বিভিন্ন করণ বাতিল করার এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নতুন বন্দোবস্ত স্থাপন করার প্রক্রিয়াটা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন, — বহু বিভিন্ন ঐতিহাসিক আর সামাজিক উপাদান এবং সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন জাতীয় আর গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উপর সেটা নির্ভর করে। তবে, বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন হল রাষ্ট্রের উপর প্রগতিশীল শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব — এই প্রভাব রাষ্ট্রের শ্রেণীগত বনিয়াদ বদ্‌লে, গণতন্ত্র

বিকশিত করিয়ে এবং সরকারী যন্ত্রের ভিতরে বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির জন্যে বিভিন্ন মূল অবস্থান আয়ত্ত করিয়ে ক্রমে রাষ্ট্রের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায়। বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ অবস্থা থাকলে ঐসব শক্তি অগ্রসর জাতীয়-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশকে সবলে এগিয়ে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক ধরনের রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। জাতীয়-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সুদূরপ্রসারী বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কারের সমর্থক বৈপ্লবিক শক্তিগুলির হাতিয়ারে রূপান্তরিত করার সংগ্রামের ভিতর দিয়ে জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।

বিভিন্ন মূলগত সামাজিক সংস্কারসাধন যা বাস্তবে নিশ্চিত করতে পারে এমন রাষ্ট্র স্থাপনের প্রয়োজনটাকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রগতিশীল শক্তিগুলি ক্রমেই বেশি বেশি করে উপলব্ধি করছে। তাদের বিবেচনায়, অর্থনীতিক্ষেত্রে জাতীয়-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন মূল লক্ষ্য হল: (ক) ঔপনিবেশিক এবং সামন্ততান্ত্রিক আমলের জেরগুলো বিলুপ্ত করা; (খ) কৃষকের অনুকূলে ভূমিসমস্যার সমাধান; (গ) জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্র থেকে বৈদেশিক একচেটিয়া পুঁজি উচ্ছেদ করা; (ঘ) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং শক্তিবৃদ্ধি; এবং (ঙ) জীবনযাত্রার মানের বেশকিছুটা উন্নতিসাধন।

জাতীয়-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনীতিক বনিয়াদ হল বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তির মৈত্রী, তেমনি তার আর্থনীতিক বনিয়াদ হল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মালিকানার বনিয়াদ ব্যক্তিগত মালিকানার চেয়ে উন্নততর এবং বেশি প্রগতিশীল — একমাত্র এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রই বৈদেশিক পুঁজির বিরুদ্ধে নিজের কোট বজায় রাখতে পারে, জাতীয় অর্থনীতি গড়ে চলতে পারে এবং দেশে শিল্পক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনার কাজে শ্রমিক শ্রেণী থেকে লোকের অংশগ্রহণ সংগঠিত করতে পারে। উপযুক্ত অবস্থায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অস্তিত্ব বেশ ভালভাবেই হতে পারে মুক্ত দেশের বিকাশের অপুঁজিতান্ত্রিক পথে উত্তরণের জন্যে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক উপাদান, আর বিকাশের ঐ অপুঁজিতান্ত্রিক পথ ধরে যাওয়া যায় সমাজতন্ত্রে।

রাজনীতিক্ষেত্রে জাতীয় গণতন্ত্রের রাষ্ট্রের বিভিন্ন মূল লক্ষ্য হল শাসনব্যবস্থা আর সমাজব্যবস্থার ব্যাপক গণতন্ত্রীকরণ এবং স্বাধীন শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবায়ন।

নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির স্বরাষ্ট্রীয় এবং পররাষ্ট্রনীতিতে বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক উপাদানের ছাপ থাকে — এইসব

উপাদান হল, যেমন, শিল্পোন্নয়নের মাত্রা; বৈদেশিক পুঁজির উপর অর্থনীতির নির্ভরশীলতা; সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের অবশেষের অস্তিত্ব; মেহনতী জনগণের রাজনীতিক পরিপক্কতা এবং চেতনা; জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের পরিসর এবং প্রাবল্য, ইত্যাদি। কোন কোন দেশ স্বাধীন স্বরাষ্ট্রীয় এবং পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে পারে, আবার কোন কোন দেশ বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়েই থাকতে পারে এবং সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণাত্মক কর্মনীতির দোসর হয়, যদিও তাদের হয়ত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। এই রকমের বিভিন্ন দেশের সরকার চরম প্রতিক্রিয়াশীল উপরতলার বুর্জোয়াদের এবং কিছু পরিমাণে সামন্ত-জমিদারদের স্বার্থের পাহারাদারি করে, জনগণের প্রাথমিক অধিকারগুলোও কেড়ে নেয় এবং এই জনগণের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী সাম্রাজ্যবাদঘেঁষা কর্মনীতি নিয়ে চলে। উপরে উল্লেখিত আগের ধরনের দেশগুলি স্বভাবতই প্রগতিশীল জাতীয়-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের পক্ষে আরও ভাল অবস্থায় থাকে।

যেসব নতুন জাতীয় রাষ্ট্রে প্রগতিশীল বুর্জোয়া আর পেটি বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় থাকে সেখানে জনসাধারণের বিস্তৃত অংশ বিভিন্ন রাজনীতিক অধিকার পায়, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী প্রশাসনে মেহনতিদের অংশগ্রহণ করানো হয়।

কিন্তু, বৃহৎ বুর্জোয়া আর জমিদারেরা ক্ষমতায় থাকলে জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী গণতন্ত্রবিরোধী কর্মনীতি অনুসরণ করা হয়। জাতীয় উন্নয়নের কাজ থেকে প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সরিয়ে দেবার জন্যে জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা দমন-পীড়ন চালায়। যেকোন চলতি ক্লেশ-অসুবিধা থেকে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে দেবার মতলবে এবং সরকারের বিভিন্ন একনায়কত্বমূলক পদ্ধতি আর একের শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধ আর ঘৃণা দমন করবার জন্যে ঐরকমের কর্মনীতি তৈরি করে। একনায়কত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক সমর্থনপুষ্ট বিভিন্ন স্বৈরাচারী পদ্ধতি বুর্জোয়াদের শক্তির পরিচায়ক না হয়ে বরং তাদের দুর্বলতারই প্রকাশ।

জনগণের ব্যাপক অংশ যেখানে কর্মনীতি রচনায় অংশ নেয় সেই রাষ্ট্র শক্তিশালী। জাতীয় গণতন্ত্রে শাসনের একনায়কত্বসুলভ এবং স্বেচ্ছাচারী পদ্ধতিগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয় --- এই রাষ্ট্র ঐরকমের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

এমন রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ ছাড়া কোন পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে চলতে পারে না। এমন রাষ্ট্র শান্তির একটা শক্তি, সেটা স্বাভাবিক — কেননা, যেকোন রূপের কিংবা যেকোন ছদ্মবেশধারী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায় যে দেশ সে দেশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে ওঁৎ পেতে থাকা যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেই।

একটা কিংবা কয়েকটা বিশেষক উপাদান দেখা গেলেই কোন রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক ধরনের রাষ্ট্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ার মধ্যেকার প্রগতিশীল জাতীয় গণতন্ত্র বলে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। তেমনি, এই রকমের রাষ্ট্রের সমস্ত বিশেষক উপাদানই অবশ্য একই সঙ্গে দেখা দেয় না। সেগুলি একটা কালপর্যায় ধরে একটা একটা করে দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে এখনও বলা যেতে পারে, কোন কোন দেশ এই রকমের রাষ্ট্র হয়ে উঠবার দিকে অন্যান্য কোন কোন দেশের চেয়ে বেশি এগিয়েছে।

স্পষ্টতই, কোন জাতীয়-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বিকাশের কয়েকটা অন্তর্বর্তী পর্বের ভিতর দিয়ে চলতে হবে; সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বিভিন্ন লক্ষ্য কিংবা ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি এবং গুরুত্বের দিক দিয়ে সেটা পৃথক পৃথক হবে। প্রথম পর্বে বোধহয় প্রধান হবে বহিস্থ ক্রিয়াকলাপ, অর্থাৎ কিনা, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের লক্ষ্য অনুসারে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা। জাতীয় গণতন্ত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম সম্প্রসারিত আর প্রবলতর করা এবং রাজনীতিক স্বাধীনতা দৃঢ়তর করা আর আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করার মতো কাজগুলি অগ্রাধিকার পাবে।

বিপ্লব এবং ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে জাতীয় গণতন্ত্র বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ক্রমে সমাজ গড়ে তুলবে — যে সমাজে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কই হবে প্রধান সেই সমাজে ধাপে ধাপে উত্তরণের জন্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করবে। জাতীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য এবং ঐতিহাসিক করণীয় সেটাই।

সংগ্রামের সংসদীয় এবং অন্যান্য রূপ আর পদ্ধতি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে গণ-সংগ্রাম ব্যবহার ক'রে মেহনতী জনগণের পক্ষে চরম প্রতিক্রিয়াপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব, রাষ্ট্রের উপর চাপ দেওয়া সম্ভব — এইভাবে, জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলি যারা সাধন করতে সক্ষম সেইসব সবচেয়ে প্রগতিশীল মহলের প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসতে পারে ক্রমে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে।

বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে জাতীয়-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ক্রমেই বেশি বেশি মাত্রায় নির্ভর করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার উপর এবং সমাজের বৈপ্লবিক পুনঃসংগঠনের কাজে তাদের প্রচুর অভিজ্ঞতার উপর।

এখন যা অবস্থা তাতে যেকোন দেশ ঔপনিবেশিক জোয়াল ছুড়ে ফেলে দিলে, তার সামাজিক-আর্থনীতিক আর রাজনীতিক বিকাশের মাত্রা যা-ই হোক, সে দেশের পক্ষে জাতীয়-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়া এবং সামাজিক প্রগতি ঘটানোর কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব। রাজনীতির অনুপাত, সংশ্লিষ্ট দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতার মাত্রা এবং পুঁজিতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র এই দুই বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার গতি আর পরিণতির উপরই শেষপর্যন্ত সবকিছু নির্ভর করে।

৪। সশস্ত্র শক্তি এবং রাজনীতি

এশিয়া এবং আফ্রিকার অনেকগুলি নতুন রাষ্ট্রে মিলিটারি সম্প্রতি রাজনীতিক ঘটনাবলির সামনে এসে পড়েছে। বিষয়গত বিকাশের ফলে কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়েছে, — দেশে সাম্রাজ্যবাদী আর আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে এবং জাতীয় আর সামাজিক প্রগতির জন্যে সংগ্রামে প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার উপায়াদি নির্ধারণের জন্যে ঐসব সমস্যার তত্ত্বগত বিশ্লেষণ কার্যক্ষেত্রে বিপুল তাৎপর্যসম্পন্ন। এইসব সমস্যা যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার মধ্যে আছে, যেমন জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে ফৌজের ভূমিকা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের উপর ফৌজের প্রভাব, আর জনগণ এবং তাদের বিভিন্ন সংগঠনের পরিচালিত সংগ্রামের তাৎপর্য।

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে মিলিটারির ভূমিকা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। কোন কোন লেখক তাদের কোন প্রগতিশীল ভূমিকার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সামরিক চোটের জোরে কায়েম করা যেকোন সরকারকে তাঁরা প্রতিক্রিয়াপন্থী এবং সমরবাদী বলে দেন। কেউ কেউ আবার দেখাতে চান যে, মিলিটারিই যেন জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবে নেতৃত্ব করতে সমর্থ হবার মতো প্রায় একমাত্র জাতীয় শক্তি। কখনও কখনও কাউকে বলতে শোনা যায়, জনগণের সমর্থন ছাড়াই এবং কোন প্রগতিশীল রাজনীতিক পার্টি না

থাকলেও মিলিটারি কোন মুক্ত দেশে রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক উন্নয়নের সমগ্র দায়িত্ব নিতে সক্ষম।

এর কোন মতেরই উপযুক্ত বনিয়াদ নেই -- তার কারণ এইসব মতের প্রবক্তারা ঘটনাবলির ভাসাভাসা উপলব্ধির বেশি কিছুর প্রয়োজন বোধ করেন না, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির গভীরে সক্রিয় সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক প্রক্রিয়াগুলোর দিকে তাঁরা নজর দেন না, তাছাড়া, কোন সামাজিক আন্দোলনের প্রকৃতি কেবল তার ভারপ্রাপ্তদের পরিচয় দিয়েই নির্ধারিত হয় না — যাতে তার **বাস্তব** সাধন এবং **বাস্তব** উদ্দেশ্যগুলির আনুকূল্য হয় সেটা দিয়েও নির্ধারিত হয়, এই কথাটা তাঁরা স্পষ্টতই ভুলে যান।

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্যান্য যেকোন সামাজিক ব্যাপারের মতো মিলিটারির ভূমিকার মূল্যায়নেও শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি চাই। সংশ্লিষ্ট সমাজের প্রকৃতি, বিভিন্ন শ্রেণীগত আর রাজনীতিক শক্তির মধ্যে সম্বন্ধ এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিধি আর প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে সমাজে মিলিটারির স্থান। যেকোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মেহনতী জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম মিলিটারিকে টেনে আনে রাজনীতিক জলাবর্তের মাঝে — এটা অবশ্যম্ভাবী। লেনিন লিখেছেন, 'সৈনিকেরা নিরপেক্ষ হতে পারে না, তা কখনও হয় নি, কখনও হবে না।'*

এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ফৌজ নিরপেক্ষ হয়ে থাকা তো দূরের কথা, বরং তাদের দেশে দেশে রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে এবং ঘটনাবলির বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে একটা নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকায় এসেছে। এমন ঘটবার কারণ আছে কয়েকটা।

এক, যখনই কোন বুর্জোয়া সমাজে মূল শ্রেণীগুলির পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটে না সেক্ষেত্রে বাস্তবে বিভিন্ন অন্তর্বর্তী স্তরের ক্রমবৃদ্ধি ঘটে, এইসব স্তরের মধ্যে অসামরিক আর সামরিক বুদ্ধিজীবিসমাজ, — যেসব দেশে শ্রেণীগত গড়ন আরও বেশি বিকশিত সেখানকার অনুরূপ স্তরগুলির চেয়ে অমন ক্ষেত্রে ঐসব বুদ্ধিজীবী স্তর বিভিন্ন শ্রেণী থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীন হয়।

আলোচ্য দেশগুলিতে অফিসারেরা সাধারণত জমিদার শ্রেণী আর বৃহৎ

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 9, p. 465.

বুর্জোয়াদের সঙ্গে তেমন সম্বন্ধযুক্ত নয়। অফিসারেরা আসে প্রধানত শহুরে আর গ্রামাঞ্চলের পেটি বুর্জোয়া পরিবারগুলি থেকে, অর্থাৎ কিনা, এমনসব সামাজিক স্তর থেকে যেগুলির সামাজিক অবস্থান অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলিতে উপরতলার বুর্জোয়াদের চেয়ে মেহনতিদেরই ঢের বেশি কাছাকাছি। এই কারণেই দেশপ্রেমিক মনোভাবাপন্ন অফিসারেরা যেমন সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদের তেমনি পুঁজিতন্ত্রেরও বিরোধী।

দুই, অগ্রসর সমাজে মিলিটারিই অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশি জড় আর নিষ্ক্রিয়, কিন্তু শিল্পে কম-অগ্রসর দেশগুলিতে তেমন নয় — এই দেশগুলিতে মিলিটারিই সবচেয়ে ওয়াকিবহাল এবং কর্মশক্তিসম্পন্ন শক্তি। তার কারণ, এইসব দেশের মিলিটারিকে যুদ্ধবিগ্রহের আধুনিক উপকরণাদি নিয়ে কাজ করতে হয় — ঐসব উপকরণ আয়ত্ত করবার জন্যে তাদের প্রায়ই বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন অগ্রসর দেশে অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে হয়। তারাই বোধহয় দেশের অন্য যেকোন স্তরের আগে নিজেদের দেশগুলির আর্থনীতিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রসরতার অসুবিধাগুলোর কথা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে। বৃটেনে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক কেইথ্ হপ্‌কিন্স্ বেশ লাগসই কথাটাই বলেছেন যে, 'এরই থেকে আসে মিলিটারির আধুনিকীকরণের উৎসাহ এবং এই রকমের পরিপ্রেক্ষিত যাদের নেই কিংবা সেটাকে যারা অবহেলা করে সেইসব রাজনীতিকের কাছ থেকে ক্ষমতা হাতে নেবার জন্যে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা।'*

বিভিন্ন আধুনিক উৎপাদন-প্রণালীর সঙ্গে অফিসারদের যোগাযোগের অর্থ হল প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ। দেশে ফিরে তারা রাজনীতিক এবং সামাজিক-আর্থনীতিক পরিবর্তনের জরুরী প্রয়োজন সম্বন্ধে বিশেষ প্রখরভাবে অবহিত হয়ে ওঠে — যদিও, নতুন সমাজ গড়ার সুস্পষ্ট কর্মসূচি তাদের হাতে কখনও কখনও প্রস্তুত না-থাকতেও পারে।

তিন, জাতীয় মুক্তির জন্যে জনগণের সংগ্রাম থেকে মিলিটারি কখনও

* Keith Hopkins, "Civil-Military Relations in Developing Countries", *The British Journal of Sociology,* London, 1966, June, Vol XVII, No. 2; p. 170. তবে, এই লেখকের নিম্নলিখিত বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া শক্ত: 'তাহলে, জাতির রক্ষক হিসেবে ভূমিকায় ফৌজ নিজেকে রাজনীতিক তর্ক-বিতর্কের স্বার্থপর খেয়ালখুশির ঊর্ধ্বে বলে মনে করতে পারে, আর অন্যান্যেরাও তাকে সেইভাবে দেখতে পারে; আর তার এই ভাবমূর্তিই 'জাতীয় স্বার্থে' তার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের বৈধতার সপক্ষে কাজ করতে পারে।' (ঐ, পৃঃ ১৭১)।

দূরে দূরে থাকে নি — গোড়ার দিককার পর্বেই স্বাধীনতার ভাবধারা তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এশিয়া আর আফ্রিকার বহু দেশেই জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের পাশাপাশিই জাতীয় সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল — এইভাবে এইসব সৈন্যবাহিনী একেবারে গোড়া থেকেই একটা প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি। এমনই হয়েছিল আলজিরিয়ায় -- সেখানে দেশের কৃষক, শ্রমিক এবং পেটি বুর্জোয়াদের নিয়ে গড়া জাতীয় মুক্তি-ফৌজ ঔপনিবেশিকতাবিরোধী যুদ্ধে লড়েছে এবং আলজিরিয়ার সমগ্র জনগণের স্বার্থ আর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করেছে। বর্মা থেকে জাপানী আক্রমণকারীদের এবং বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের ঝেঁটিয়ে দেবার কাজে গুরুত্বসম্পন্ন অংশগ্রহণ করেছিল বর্মী স্বাধীনতা-ফৌজের কেন্দ্রী অংশটা — এই ফৌজও কৃষক, শ্রমিক এবং শহরের নিচতলার স্তরগুলোর মানুষ নিয়ে গড়া।

চার, বহু মুক্ত দেশে জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধের সময়েও, আবার রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জিত হবার পরে বরং আরও বেশি পরিমাণে রাজনীতিক পার্টিগুলির গড়ন যা অস্পষ্ট ছিল তাতে সেগুলি নিজ নিজ দেশের উন্নয়নের ভার নিতে পারবার মতো অবস্থায় ছিল না। মুক্ত দেশগুলির কার্যত কোনটিতেই শাসন চালাবার উপযোগী শক্তিসম্পন্ন কোন বুর্জোয়া পার্টি ছিল না — তাতে ব্যতিক্রম বোধহয় শুধু ভারত। আলোচ্য দেশগুলির বেশির ভাগে কমিউনিস্ট পার্টি হয় ছিল না, নইলে সেগুলির উপর চলত হিংস্র দমন-পীড়ন, সেগুলি গুপ্ত অবস্থায় থাকতে বাধ্য হত — কাজেই, ঘটনাস্রোতের উপর যথেষ্ট সক্রিয় প্রভাব খাটাতে পারত না।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেসব পার্টি ক্ষমতায় এল সেগুলিকে জাতীয় ফ্রন্ট ধরনের সংগঠন হিসেবেই গণ্য করা চলে — সেগুলিতে সম্মিলিত হয়েছিল সামাজিক, রাজনীতিক এবং আদর্শগতভাবে অসদৃশ বিভিন্ন শক্তি; যেসব জাতি সার্বভৌমত্ব অর্জন করল তাদের সামনে ছিল অতুলনীয়ভাবে জটিল যেসব কাজ সেগুলি নিয়ে এঁটে ওঠার মতো যথেষ্ট প্রস্তুতি তাদের ছিল না।

তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশেই রাজনীতিক ঘটনাস্রোতে সমাজের সবচেয়ে উচ্চ-মাত্রায় সংগঠিত শক্তি হিসেবে মিলিটারি কেন সামনে এসে গেল তার কিছু পরিমাণ ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে উল্লেখিত উপাদানগুলি থেকে।

তবু, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক-

আর্থনীতিক সমস্যাগুলো অগ্রাধিকার পাওয়া এবং নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে অর্থনীতি ক্রমাগত আরও বেশি গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ফৌজের কাজ আর অবস্থান অনেকটা বদলে যায়, এটাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা তত্ত্বক্ষেত্রে এবং কার্যক্ষেত্রেও ভুল। ফৌজের সাহায্যে যেসব সামরিক নেতা ক্ষমতাসীন হন তাঁরা বুঝতে আরম্ভ করেন যে, ফৌজে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মূলে থাকে আদেশ-নির্দেশ, কিন্তু সেটা কোন সমাজের বিভিন্ন গণতন্ত্রসম্মত প্রতিষ্ঠানাদির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না -- ঐসব প্রতিষ্ঠানাদি না থাকলে জাতীয় বিপ্লবের সুষ্ঠু অগ্রগতি ঘটতে পারে না।

সরাসরি বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে এইসব সামরিক নেতাদের অনেকেই ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যে, ফৌজে কোন মূর্ত-নির্দিষ্ট রাজনীতিক এবং মতাদর্শগত কর্মপন্থা নেই, জনগণের রাজনীতিক সংগঠন এবং আর্থনীতিক উন্নয়নের ব্যাপারে ফৌজ অনভিজ্ঞ — কাজেই, সমাজের পরিচালক শক্তি হিসেবে ফৌজ পার্টির জায়গা নিতে পারে না; তার উপর, জীবনযাত্রার নতুন প্রণালী গড়ে তুলবার জন্যে এবং সাম্রাজ্যবাদ আর নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত সংগ্রাম চালাবার জন্যে মেহনতী জনগণ আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার।

কোন প্রগতিশীল পার্টি না থাকলেও বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে উঠতে আর নিশ্চিত হতে পারে — এমনও সম্ভব। কিন্তু, বিপ্লবের জয় নিশ্চিত করতে হলে এবং নতুন সমাজ গড়তে হলে এমন পার্টি চাইই যাতে প্রতিফলিত হয় মেহনতী শ্রেণীগুলির মতাদর্শ, আর সামাজিক বিকাশের বিষয়গত নিয়মাবলি সম্বন্ধে জ্ঞান হয় যার ক্রিয়াকলাপের বনিয়াদ। ফৌজ এই রকমের পার্টির বদ্‌লি হতে পারে না, কেননা, ফৌজের থাকে বিশেষ করণীয় কাজ, -- সর্বোপরি, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগুলো এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের হস্তক্ষেপ থেকে বৈপ্লবিক সাফল্য নিরাপদ করার সঙ্গেই সেই কাজ সংশ্লিষ্ট। তার উপর, ফৌজে সামাজিক আর মতাদর্শগত ঐক্য না থাকলে, জাতির বিকাশের পথ বেছে নেবার প্রশ্ন এলেই ফৌজ পরস্পরবিরোধী দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায় — কেননা, রাজনীতিক স্বাধীনতার পরে প্রকোপিত শ্রেণীগত পৃথগ্‌ভবনের প্রক্রিয়াটা তো ফৌজের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় না।

এই পরিস্থিতিতে, দেশভক্ত অফিসারেরা, যারা জনগণের মেজাজ

প্রতিফলিত করে, জন-সমর্থনপুষ্ট হয়, তারা বিনা দ্বিধায় জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব চালায় এবং তাদের নিজ নিজ দেশ যাতে পরে সামাজিক প্রগতির পথে এগোতে পারে তার পথ প্রশস্ত করার উপযোগী বিভিন্ন মূলগত সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কার সাধন করে। তবে, অন্যান্য অফিসার যারা সাম্রাজ্যবাদী আর দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রভাবাধীন তারা হয় দেখা-যাক-কি-হয় মনোভাব নেয়, নইলে প্রকাশ্যে বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এশিয়া এবং আফ্রিকার কয়েকটা দেশে সামরিক চোটে ক্ষমতাদখলের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে ফৌজ যেমন প্রগতিশীল ভূমিকায় আসতে পারে, তেমনি, গণতন্ত্রসম্মত ভাবধারণার প্রভাব সংকুচিত হয়ে গেলে ফৌজ সহজেই প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তিগুলোর হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে ফৌজ সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রগতিশীল বিকাশ ত্বরান্বিত করার সহায়ক হতে পারে, আবার অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ফৌজ অমন বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কোন সমাজের কাঠামের মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠান হল ফৌজ — সংশ্লিষ্ট সমাজে গণতান্ত্রিক ভাবধারণা আর প্রতিক্রিয়াপন্থী মতামত মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি থাকতে পারে: প্রতিক্রিয়াশীল মতের কোন কোন সমর্থক ফৌজকে কিংবা তার একটা অংশকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার চেষ্টা করবে এমন বিপদ সৃষ্টি হয় তার দরুন। কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বে ফৌজের ভিতরকার এই গণতান্ত্রিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল ধারার ঠিক কোন্‌টা প্রাধান্য পাবে সেটা বহু উপাদানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু, সর্বোপরি, সংশ্লিষ্ট দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিসর এবং মাত্রার উপর, যা ফৌজের ভিতরে মানসিক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতে পারে এবং গোটা ফৌজকে কিংবা তার বেশ একটা অংশকে বিপ্লবের পক্ষে আনতে পারে।

কখনও কখনও সামরিক 'কুদেতা'র নেতারা রাজনীতিক বিচার-বিবেচনার চেয়ে নিছক ব্যক্তিগত ভাগ্যান্বেষী স্বার্থ অনুসারে পরিচালিত হয়েই ক্ষমতা দখল করে। কাজেই, মিলিটারির মধ্যে এই রকমের যেকোন ঝোঁক গড়ে উঠবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরা অতি লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, সেটাকে নয়া-উপনিবেশবাদী স্বার্থে ব্যবহার করবার জন্যে তারা সদা-প্রস্তুত থাকে, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ মিলিটারির

উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে — আফ্রিকার কোন কোন দেশে সামরিক চোটে ক্ষমতাদখলের বিভিন্ন ঘটনা এবং আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ঐ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্যে সম্পর্কটা নজরে না পড়া অসম্ভব। আফ্রিকার অনেক দেশে সশস্ত্র শক্তির প্রকৃতি এবং গড়ন উপনিবেশবাদীরা চলে যাবার পর পরিবর্তিত হয়েছে সামান্যই, — উপনিবেশবাদীরা সুনিপুণভাবে এই অবস্থাটার সুযোগ নিচ্ছে। এইসব সামরিক শক্তির বেশির ভাগই এখনও পশ্চিমীদের হাতে ট্রেনিং পাওয়া ভাড়াটে ফৌজ হয়েই রয়েছে। এখানে-ওখানে দক্ষিণপন্থী মিলিটারির সক্রিয় হয়ে উঠবার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, — ঐ দক্ষিণপন্থী মিলিটারি বেশকিছুকাল হল তলে তলে কাজ চালিয়ে আসছে, কিন্তু এখন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির উপর আঘাত হেনেছে। যেমন, ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতা রয়েছে প্রকৃতপক্ষে ফৌজের হাতে — এই ফৌজের মধ্যে দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী এই দুটো ধারার মধ্যে সর্বক্ষণ সংগ্রাম চলেছে — যদিও সেটা সব সময়ে স্পষ্ট দেখা যায় না। প্রসঙ্গত, এটা খুবই বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ঐ দুটো ধারার মধ্যে মিলজুল করিয়ে ফৌজের অন্তত একটা সাময়িক ঐক্যসাধনের জন্যে সামরিক নেতাদের চেষ্টা চলেছে — সেটা আগের মতো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কিংবা ঔপনিবেশিকতাবিরোধী স্লোগানে নয়, সেটা হচ্ছে কমিউনিজমবিরোধী স্লোগান তুলে।

ফৌজের মধ্যে রাজনীতিক প্রচারের মূল্যটাকে খাটো করে দেখা এবং ফৌজকে আগের মতো রাজনীতির পক্ষে বিজাতীয় বলে গণ্য করা হলে জাতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে তার শোচনীয় পরিণতি ঘটতে পারে — এ কথা জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন নেতা ক্রমেই বেশি বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলছেন। কোন কোন আরব দেশে, যেমন সিরিয়ায় কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে অপারগ হয়েছিল — এই কর্তৃপক্ষের অস্থিত অবস্থার ফলে ঘটেছিল ফৌজের রাজনীতিক তৎপরতা। এমন পরিস্থিতিতেই দেশপ্রেমিক অফিসারেরা সবচেয়ে সুদক্ষভাবে সংগঠিত শক্তি হিসেবে ফৌজকে ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন। এইসব ঘটনা ছিল মূলত বৈপ্লবিক — কেননা, এইসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেশটি জনগণের স্বার্থের অনুযায়ী সামাজিক প্রগতির পথে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এই অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও সিরিয়ার নেতারা কিন্তু ফৌজের সমর্থনটাকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করেও কেবল ফৌজের

মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ থাকেন নি, — মেহনতী জনগণকে তাঁরা সরকারী এবং রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপে টেনে আনার চেষ্টা করলেন, এমনকি, বিপ্লবের ভাগ্য যখন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল তখন তাঁরা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসৈন্যদল অবধি সংগঠিত করে সেগুলিকে অস্ত্রসজ্জিত করেছিলেন। আরও কয়েকটি আরব দেশের মতো সিরিয়ায়ও রাজনীতিক পরিস্থিতিটাকে বদ্‌লে দেবার ব্যাপারে ফৌজ গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকায় থাকলেও, কেউ কেউ যে বলে যে, ফৌজই বাস্‌ পার্টিকে বাঁয়ে ঠেলে নিল, বাস্‌ পার্টির ভিতরে বিভিন্ন শ্রেণীর পৃথগ্‌ভবন প্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করল, দেশটিকে তুলে ধরল রাজনীতিক বিকাশের নতুন পথে, আর বাস্‌ পার্টির ভিতরে মূলগত পরিবর্তন ঘটাল যেন ঐ বামপন্থী ঝোঁকটাই, এমন কথা মনে করা শক্ত। প্রগতিশীল আরব দেশগুলিতে ফৌজের অবস্থান বিভিন্ন শ্রেণী এবং রাজনীতিক পার্টির ঊর্ধ্বে, এমন ধারণা কেবল অসতর্ক পর্যবেক্ষকদেরই হতে পারে।

আসলে পরিস্থিতিটা আরও জটিল। শ্রেণীগত প্রকৃতির দিক দিয়ে দেখলে, আলোচ্য দেশগুলিতে রাষ্ট্রক্ষমতা রয়েছে পেটি বুর্জোয়াদের হাতে। রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হচ্ছে ব্যাপক পেটি বুর্জোয়া স্তরের এবং সর্বাগ্রে কৃষকের স্বার্থ — যদিও, বহুলাংশে ফৌজকে এবং বিশেষত দেশপ্রেমিক অফিসারদেরই প্রধান অবলম্বন বলে ঐ রাষ্ট্র মনে করে। বুর্জোয়া লেখকেরা মাঝে মাঝে বলেন, এশিয়া আর আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ফৌজ যেন একটা তথাকথিত অন্তর্বর্তী শ্রেণী, আর ঐসব দেশে ফৌজের ভূমিকাটা যেন আসছে বহুলাংশে তারই ফলে, আর অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে ফৌজ নাকি সেই শ্রেণীরই সঙ্গে সমসত্ত হতে চাইছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকার উইলিয়ম আর. পল্‌ক্‌ নামে একজন লেখকের মত তাইই। তিনি লিখেছেন, 'যেখানে নতুন নতুন রাষ্ট্রীয় সংস্থা স্থাপিত হয়েছে সেখানে সেগুলিতে যারা কর্মী প্রায়ই তারা সম্প্রতি ছিল ফৌজী অফিসার। যেমন, মিসরে সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ এবং তৈল কর্তৃপক্ষে বহু ফৌজী অফিসার রয়েছে। তেমনি, সুদান, তুরস্ক এবং ইরাকে বিভিন্ন অফিসার বিভিন্ন অসামরিক কাজ নিয়েছেন।'* এর থেকে ঐ লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ফৌজ একটা তথাকথিত বিশেষ অন্তর্বর্তী শ্রেণী। অন্যান্য রচনায় ফৌজের

* William R. Polk, *The United States and the Middle East*, New Jersey, 1964, p. 47.

স্বাধীন ভূমিকার উপর অতি মাত্রায় জোর দিতে দেখা যায়। এই রকমের একটা উক্তি নিচে দেওয়া হল — এর সঙ্গে একমত হওয়া শক্ত: 'উঠতি দেশগুলিতে আধুনিক অর্থের শ্রেণীগুলি রয়েছে প্রাথমিক, অসংগঠিত অবস্থায়, শ্রেণীগত সংগঠনগুলিও দুর্বল, তাই, বাস্তবে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন সুস্থিত, বিস্তৃত এবং স্বাধীন সংগঠন হিসেবে কাজ চালাতে পারে ফৌজ।'*

ফৌজ আপনাতে আপনি একটা বিশেষ শ্রেণীও নয়, শ্রেণীর ঊর্ধ্বে স্থাপিত কোন শক্তিও নয়: ফৌজ বরং কোন একটা শ্রেণীর হাতিয়ার। লেনিন লিখেছেন, 'প্রত্যেকটি শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে উৎপীড়ক শ্রেণী সবসময়েই সশস্ত্র থাকে।'**

জনগণের রাজনীতিক সংগঠনের যেসব রূপ সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সেই দেশের সামাজিক আর জাতীয় অবস্থার সঙ্গে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলি বের করার জন্যে এশিয়া এবং আফ্রিকার কোন কোন প্রধান দেশে ইদানীং বিস্তর নজর দেওয়া হয়েছে। যেমন, বিভিন্ন গণ-পার্টিকে এমনভাবে পুনঃসংগঠিত করাবার চেষ্টা হচ্ছে যাতে বিপ্লবের প্রতি অনুগত সবচেয়ে প্রগতিশীল শক্তি ঐসব পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এই কাজ এখনও অবধি এগোচ্ছে ধীরেই, তা মানতে হবে, এই প্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টাও হচ্ছে খুবই পরীক্ষামূলকভাবে — বিশেষত সামাজিক-আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সংস্কারের ব্যাপারে। বর্মার বৈপ্লবিক পরিষদের সভাপতি জেনারেল নে উইন বর্মার সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচির পার্টিটিকে মজবুত করে তোলার প্রয়োজন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একবার বলেছিলেন, পার্টির হওয়া চাই জনগণের রাজনীতিক নেতা — কিন্তু, স্থাপিত হবার পরে চার বছর কাটল তবু পার্টি এখনও সেই নেতৃত্ব দিতে অপারগ।

রাজনীতিক গণ-সংগঠনের প্রক্রিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। কোন কোন সদ্য-স্বাধীন দেশে রয়েছে এক-পার্টি শাসনব্যবস্থা, অন্য কোন কোন দেশে বিভিন্ন প্রগতিশীল পার্টির পরিমেলই বেশি পছন্দসই — এইসব পার্টি মিলিত হয় একই জাতীয়-গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে। কোন একটি কিংবা কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতাকে সাধারণ-সংজ্ঞাবদ্ধ করে সেটাকে যান্ত্রিকভাবে অন্যান্য

---

* 'আজকের এশিয়া এবং আফ্রিকা', ৯ নং, মস্কো, ১৯৬৬, পৃঃ ৫ (রুশ সংস্করণ)।

** V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 23, p. 80.

দেশের ক্ষেত্রে খাটানো ভুল। কোন বা অন্য কোন দেশে জনগণের রাজনীতিক সংগঠন যেকোন রূপই ধারণ করুক না কেন, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া নতুন সমাজ গড়া যায় না, এটাই আসল কথা।

মিসর, বর্মা, আলজিরিয়া, সিরিয়া এবং আরও কোন কোন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের একটা সংগ্রামী অঙ্গ হিসেবে ফৌজের গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকাই আছে। তবে, ফৌজ যদি জন-স্বার্থের আনুকূল্য করে, ফৌজ যদি সমাজে নিজের উপযুক্ত স্থানটা বেছে নিতে পারে, এবং সংশ্লিষ্ট সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রের আর্থনীতিক, সামাজিক আর রাজনীতিক উন্নয়নের জটিল প্রক্রিয়াটার পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজ যোগ্যতা-সম্ভাবনা যদি ধীর-স্থিরভাবে নির্ধারণ করতে পারে, একমাত্র তবেই ফৌজ নিজ নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করতে পারে।

৫। সমাজ-জীবনের গণতন্ত্রীকরণ

সমাজ-জীবনের গণতন্ত্রীকরণ তৃতীয় দুনিয়ার সবচেয়ে জরুরী একটা সমস্যা। উঠতি রাষ্ট্রগুলিতেও এবং অন্যত্রও সমস্যাটা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলেছে, কিন্তু, দুঃখের কথা, এর সমাধানটাকে প্রায়ই শাসনে এক-পার্টি কিংবা বহু-পার্টি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা হিসেবে দেখা হয়, — সমস্যাটার সমস্ত দিক বিবেচনা করার ভিত্তিতে এটাকে সমগ্রভাবে দাঁড় করানোর কাজটা এইভাবে ঝাপসা হয়ে যায়।

পশ্চিম-ইউরোপীয় ধারার সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তারা যেসব উন্নয়নশীল দেশে এক-পার্টি শাসনব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে যেসব দেশের নেতাদের সমালোচনা করে বলেন, সেখানে নাকি গণতন্ত্রসম্মত স্বাধীনতাগুলিকে পদদলিত করা হচ্ছে। বর্মায় বহুলাংশে দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক সংগঠন 'ফাশিস্তবিরোধী জন-মুক্তি লীগ' এবং প্রাক্তন শাসক 'ইউনিয়ন পার্টির' প্রতিক্রিয়াশীল অংশ উভয়েই বৈপ্লবিক সরকারের বিরুদ্ধে এই রকমের অভিযোগ তুলেছিল। বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষার জন্যে উদ্‌গ্রীব এই দুটো সংগঠন 'সংসদীয় গণতন্ত্র' পুনঃস্থাপনের জন্যে আহ্বান জানিয়ে বলেছিল, সম্ভবত, 'গণতন্ত্রই কেবল নয়, এক-পার্টি কমিউনিস্ট একনায়কত্বের ব্যবস্থায় ধর্ম আর ন্যায়পরতাও বিলুপ্ত হবে।'*

---

* *The Nation*, Rangoon, Oct. 15, 1963.

বৈপ্লবিক পরিষদের দলিলপত্রে সঠিকভাবেই গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, বর্মার যা অবস্থা তাতে কোন প্রকারে 'সংসদীয় গণতন্ত্রে' ফিরে যাওয়া হলে সেটা হবে পশ্চাদগতি। 'ফাশিস্তবিরোধী লীগ' এবং 'ইউনিয়ন পার্টির' দীর্ঘ শাসনের আমলে অনেকেরই (তাঁদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিষদের কোন কোন নেতা যাঁরাও মনে করেছিলেন 'সংসদীয় গণতন্ত্রের' পর পর বিভিন্ন পর্বের ভিতর দিয়ে ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্রে পেঁছিন যেতে পারে) কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, তথাকথিত 'সংসদীয় গণতন্ত্র' বর্মায় জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থ রক্ষা না করে জাতীয় বুর্জোয়াদের সংকীর্ণ শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষা করেছিল। বৈপ্লবিক পরিষদ মনে করে, গড়ে তুলতে হবে 'কেবল এমন ধরনের গণতন্ত্র যা সমাজতান্ত্রিক বিকাশ অগ্রসর করায় এবং সুরক্ষিত করে'।*

'শ্রেণীহীন' কিংবা 'শ্রেণীর-ঊর্ধ্বে' কোন গণতন্ত্র কখনও হয় নি। গণতন্ত্র বরাবরই কোন না কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থ প্রতিফলিত করে আসছে। কাজেই, এক-পার্টি কিংবা বহু-পার্টি শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা না-করা কোন দেশে গণতান্ত্রিক বিকাশের মাপকাঠি নয়: শাসক পার্টির প্রকৃতি এবং তারা কাদের স্বার্থ প্রতিফলিত করে তাইই মাপকাঠি। সেকু তুরে ঠিকই বলেছিলেন যে, সমগ্রভাবে জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত করার ভিত্তিতে থাকলে একমাত্র তবেই গণতন্ত্র খাঁটি এবং পূর্ণাঙ্গ হয়। তিনি বলেছিলেন, একমাত্র এই রকমের গণতন্ত্র এবং 'গণতন্ত্রের' একমাত্র এই ব্যাখ্যাই গিনী মানে।**

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকার দেশগুলিতে শ্রেণীগত পৃথগ্‌ভবনের ধাঁচটা তত স্পষ্ট নয় — এইসব দেশে সাধারণত গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় রাজনীতিক পার্টি গড়ে ওঠে এবং একই অভিন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং উপনিবেশবাদবিরোধী লক্ষ্য দিয়ে মিলিত হয়, এটা আশা করাই স্বাভাবিক। তাঙ্গানিয়ার রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস নিয়েরেরে এ বিষয়ে লিখেছেন:

'আফ্রিকা মহাদেশে নতুন নতুন রাষ্ট্র দেখা দিচ্ছে তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ফলে। বৈদেশিক আধিপত্য থেকে মুক্তির জন্যে এই সংগ্রাম

---

* *The System of Correlation of Man and His Environment,* The Burma Socialist Programme Party, The Union of Burma, Rangoon, 1963, p. 47.

** *Voice of Africa,* Vol. 2, No. 7, July 1962, p. 21.

দেশপ্রেমিক সংগ্রাম — এতে মতভেদের কোন স্থানই থাকতে পারে না। এতে সম্মিলিত হয় দেশের সমস্ত মানুষ — তাই, আফ্রিকায়ই কেবল নয়, পৃথিবীর যেকোন অংশ অনুরূপ সংগ্রামী কর্তব্যের সম্মুখীন হলে সেখানকার দেশগুলি কোন এক বা একাধিক পার্টির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে পরিচালিত হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দিয়ে। সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং স্বাধীনতায় পরিচালিত করে নতুন রাষ্ট্রের প্রথম সরকার গড়বে, এটা অবশ্যম্ভাবী; কোন ঐক্যবদ্ধ দেশ মাঝ-পথে থেমে স্বাধীনতা আসার মুহূর্তে আমি যাকে বলেছি 'অ্যাংলো-স্যাক্সন্ রূপের গণতন্ত্র' তদনুযায়ী হবার জন্যেই পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন রাজনীতিক গ্রুপে স্বেচ্ছায় বিভক্ত হয়ে পড়বে এমনটা মনে করা শক্ত। বাস্তবিকই তো, তেমনটা হবে কেন? এটা তো নিশ্চিত যে, জনসাধারণ অবাধে কোন সরকার নির্বাচিত করলে, জনসাধারণের শুধু একটা অংশ না হয়ে প্রায় সমগ্র জনসাধারণই ভোট দিয়ে সেই সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে বলেই এতে অগণতান্ত্রিক কিছু থাকতে পারে না।'*

এক-পার্টি ব্যবস্থার সমালোচনার একটা সামাজিক পটভূমি আছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপর নির্ভরশীলতার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক প্রগতির পথ ধরার জন্যে কোন নতুন জাতীয় রাষ্ট্র দৃঢ়সংকল্প হলে সেটা দেখে বুর্জোয়া জীবনযাত্রাপ্রণালীর সমর্থকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এই কারণেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রবক্তারা প্রগতিপন্থী উন্নয়নশীল দেশগুলির বিরুদ্ধে সমালোচনা-আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করে — যদিও, স্মরণ থাকতে পারে, পশ্চিমী ঝোঁকের কোন কোন উন্নয়নশীল দেশেও এক-পার্টি শাসন রয়েছে ।

নিপীড়িত জাতিগুলির ঐক্য রোধ করার উদগ্র চেষ্টায় উপনিবেশবাদীরা হরেক রকমের উপায় ধরে — তার মধ্যে আছে বহু রাজনীতিক পার্টি সৃষ্টি করা এবং সেগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া। যেমন, কঙ্গোয় (কিন্‌শাসা) তারা যেকোন জাতীয় রাজনীতিক সংগঠন স্থাপন করা নিষিদ্ধ ক'রে কেবল বিভিন্ন উপজাতীয় সমিতি স্থাপন করেছিল। এই কর্মনীতির দরুন দেখা দিয়েছিল বহুতর ছোট ছোট পার্টি — কেননা, এই দেশটিতে মূর্ত-নির্দিষ্ট জাতিগত গ্রুপ ছিল প্রায় ৭০টা। ১৯৫৯—১৯৬০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল ১০০টার বেশি রাজনীতিক পার্টি। আর

---

* *Africa Speaks*, New Jork, 1961, p. 33.

কিন্‌শাসায় ১৯৬৫ সালে মার্চ মাসের নির্বাচনে ৭টা আসনের জন্যে ৬৫টা পার্টি প্রার্থী মনোনীত করেছিল ৩০৫ জন।*

নাইজিরিয়ায় এবং আরও কোন কোন দেশেও মোটামুটি একই রকমের পরিস্থিতি ছিল। *The African Communist* পত্রিকা ঠিকই বলেছিল, সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের প্রভুত্বের অধীন উত্তর নাইজিরিয়ায় বহু-পার্টি ব্যবস্থা আছে বলে সেটা যে সমাজতান্ত্রিক ঝোঁকের এক-পার্টি ব্যবস্থার গিনীর চেয়ে বেশি 'গণতান্ত্রিক', এটা ঘোর সংশয়ের কথা।**

নির্বিচারে পশ্চিম-ইউরোপীয় আর উত্তর-আমেরিকান বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নমুনা এনে দেশের মাটিতে পুঁতে দেওয়ায় এশিয়া আর আফ্রিকার জাতিগুলি আপত্তি করে। সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শওয়ালারা মুক্ত জাতিগুলির গায়ে জীবনযাত্রা আর চিন্তার বিজাতীয় ধারা জুড়ে দিতে না পেরে প্রমাণ করার চেষ্টা করে আলোচ্য দেশগুলিতে গণতন্ত্র কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করবে না। এই রকমের একজন লিখেছেন: 'এ কথাও ভোলা চলে না যে, গণতন্ত্র প্রাচুর্য থেকে উপজাত, — যেসব সমাজ সমৃদ্ধিশালী এবং সমসত্ত সেখানেই গণতন্ত্রের স্ফুরণ ঘটে সবচেয়ে ভালভাবে। স্বাধীনতার শত্রু হল অস্থিত অবস্থা, সাম্প্রদায়িকতা, দারিদ্র্য, জাতীয় ঐক্য আর শৃঙ্খলার অভাব — যদিও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এইসব অবস্থাই পেয়েছে। আফ্রিকায় অনেকেই স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও ঐসব অবস্থার দরুন নিজেদের মূলনীতির প্রতি অনুগত থাকা তাদের পক্ষে কঠিন হয়, এতে তেমন আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'*** বৃটেনের ফেনার ব্রক্‌ওয়ে নামে লেবর-পার্টিপন্থী অনেকটা একই মত অবলম্বন করে বলেন, আফ্রিকায় অবস্থা উদারনীতিক সমাজ স্থাপনের অনুকূল নয় — আর, ব্যক্তির বিভিন্ন অধিকার এবং আর্থনীতিক যৌথকরণ নীতির প্রতি সমানই আগ্রহশীল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র নাকি ঐ কারণে আফ্রিকায় দৃঢ়মূল হবে খুবই সীমাবদ্ধ পরিসরে।**** আলোচ্য দেশগুলিতে কিছুটা গণতন্ত্রের সম্ভাবনা

---

* Dorothy Dodge, *African Politics in Perspective*, Princeton, 1966, pp. 156-157.

** *The African Communist*. No. 19, October-December 1964, pp. 60-61.

*** *African Affairs*, Vol. 63, No. 252, July 1964, p. 196.

**** Fenner Brockway, *African Socialism*, London, 1963, p. 20.

বুর্জোয়া লেখকেরা কখনও কখনও বিবেচনায় ধরেন বটে, কিন্তু তাতে শর্ত আছে: 'যে-সমাজ প্রকৃতিগতভাবেই সেদিকে (গণতন্ত্রের দিকে -- অনুবাদক) ঝোঁকে না সেখানে যদি সেরা অংশ গণতন্ত্রের গুরু এবং জনক হতে ইচ্ছুক হয়, একমাত্র তবেই, আর তার উপর যদি তারা বাইরে থেকে সঠিক ধরনের সহায়তা পায়।'*

বিভিন্ন বাস্তব উপাদানের প্রভাবে এবং জাতীয় আর গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুসারে কোন কোন দেশে বিভিন্ন রাজনীতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কোন কোন জিনিস কোন কোন দেশের পক্ষে প্রগতিশীল এবং তাদের বাস্তব পরিস্থিতির অনুযায়ী হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য দেশের পক্ষে সেগুলির কোন দাম নেই এমন হতে পারে। বিভিন্ন নির্দিষ্ট পটভূমিতে একই ব্যাপারের বিভিন্ন পরিণতি ঘটতে পারে জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে। যেমন, এক-পার্টি ব্যবস্থার ভিত্তি যখন একই অভিন্ন জাতীয় আন্দোলন, যাতে সম্মিলিত হয় সংশ্লিষ্ট সমস্ত বৈপ্লবিক এবং গণতান্ত্রিক শক্তি, সে এক জিনিস; কিন্তু সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং বৈপ্লবিক শক্তিগুলির রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার জন্যে ব্যবহৃত হলে ঐ একই ব্যবস্থা একেবারে অন্য জিনিস হয়ে দাঁড়ায়।

দুঃখের কথা, কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে এই সমস্যাটাকে কিছুটা অতি-সরল করে দেখার ঝোঁক আছে — তাতে মনে করা হয়, এক-পার্টি ব্যবস্থাটা যেন সর্বব্যাধিহর। প্রগতিশীল শক্তিগুলির জাতীয় ফ্রণ্টে ভাঙন ধরাবার জন্যে দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াপন্থীদের যে অপচেষ্টা সেটাকে একই অভিন্ন কার্যকর রাজনীতিক শাসনযন্ত্র দিয়ে বিরোধিতা করার জন্যে বিভিন্ন জাতীয় নেতাদের আগ্রহ হবার একটা যুক্তি আছে বটে। অধিকন্তু, কোন উঠতি দেশে ঘটমান বিভিন্ন সামাজিক আর শ্রেণীগত পরিবর্তন বিশেষভাবে মূলগত হলে এবং তার ফলে বিশেষসুবিধাভোগী শ্রেণী আর গ্রুপগুলির প্রতিরোধ বিশেষভাবে প্রবল আর হিংস্র হলে একই অভিন্ন রাজনীতিক পার্টির সৃষ্টি ত্বরান্বিত করার চেষ্টা চালানো হয় আরও বেশি প্রবলভাবে।

তবে, যুক্তভাবে রচিত একই অভিন্ন প্রগতিশীল মতাদর্শগত কর্মপন্থার বুনিয়াদে বিদ্যমান প্রগতিশীল পার্টিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপার হিসেবে

---

* *Development and Society*, ed. by David E. Novack and Robert Lekachman, New York, 1964, p. 404.

না দেখে কেউ কেউ এক-পার্টি সরকার স্থাপনের সমস্যাটাকে দেখে অন্য দৃষ্টিতে: অন্যান্য বৈপ্লবিক পার্টি এবং সংগঠনগুলিকে ভেঙে দিয়ে তারা এক-পার্টির একচেটিয়া ক্ষমতা কায়েম করতে চায় — কেননা, এমন ক্ষেত্রে যে পার্টি তাতে উদ্যোগী হয় সেই পার্টি তখন ক্ষমতাসীন। সমস্যাটাকে এভাবে দেখলে সেটা সংশ্লিষ্ট সমস্ত দেশপ্রেমিক, বৈপ্লবিক এবং গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে মহা হানিকর হতে পারে এবং দেশের রাজনীতিক জীবনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে জনগণকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। অথচ, কর্মনীতি নির্ধারণে জনগণের মতামতের স্থান না থাকলে কর্মনীতি রূপায়ণের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ থাকে না, এটা তো সবারই জানা কথা। সাম্রাজ্যবাদের চাপের মুখে কোট বজায় রেখে জাতীয় এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটাতে হলে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির জনগণকেই প্রধান অবলম্বন করা চাই এবং কমিউনিস্টদের সমেত সমস্ত জাতীয়-গণতান্ত্রিক শক্তির শক্তিশালী পরিমেল গড়ে তোলা চাই।

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের চলতি পর্বে বিভিন্ন আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের তীব্র প্রকোপন এড়িয়ে চলতে হলে, এবং সাম্রাজ্যবাদী আর দেশীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মোকাবিলা করার জন্যে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গড়তে হলে, বিভিন্ন শ্রেণীগত, পার্টিগত কিংবা রাজনীতিক ধারার প্রতি আনুগত্য নির্বিশেষে সমস্ত দেশপ্রেমিক, বৈপ্লবিক এবং প্রগতিশীল শক্তির বাস্তব অবদানের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হওয়া অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

গণতন্ত্র সম্প্রসারিত এবং আরও মজবুত করার জন্যে কয়েকটি নতুন জাতীয় রাষ্ট্রে বিভিন্ন গুরুত্বসম্পন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন, আলজিরিয়ায় স্থাপিত হয়েছে শ্রমিক আর কৃষকদের বিভিন্ন স্বশাসন কমিটি; মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে 'জন-শক্তিগুলির জাতীয় কংগ্রেস' 'আরব সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন' সংগঠন স্থাপিত হবার ঘোষণা করেছে এবং ভবিষ্যতে পার্লামেণ্ট সমেত সমস্ত রাজনীতিক সংস্থায় সমস্ত আসনের ৫০ শতাংশ শ্রমিক এবং ফেল্লাদের জন্যে সংরক্ষিত থাকবে বলে নিয়ম বেঁধে দিয়েছে; বর্মায় বিভিন্ন কল-কারখানায় শ্রমিক পরিষদ স্থাপন করা হচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রে কার্যকর অগ্রগতির জন্যে মেহনতী শ্রেণীগুলির উপর নির্ভর করা এবং নতুন জীবন গড়ার কাজে তাদের অংশগ্রহণ অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলেই স্বীকৃত — কোন কোন জাতীয়-গণতান্ত্রিক পার্টির কর্মসূচিতে সেটা দেখা যায়।

তবে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গণতন্ত্রীকরণ প্রধানত অর্থনীতিক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, এ কথাও জোর দিয়ে বলা দরকার। জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের চলতি পর্বে প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির আর্থনীতিক স্বাধীনতার বিষয়টা চূড়ান্ত জরুরী এবং অতীব গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে নিশ্চয়ই। কাজেই আর্থনীতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম এবং রাজনীতিক সংগ্রামের মধ্যে কোন কৃত্রিম সীমারেখা টানা ভুল। তবু সমাজ-জীবনের গণতন্ত্রীকরণ-প্রক্রিয়াটা যতই জটিল হোক না কেন, সেটাকে কৃত্রিমভাবে গণ্ডিবদ্ধ করা হলে জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের সাধারণ গণতান্ত্রিক লক্ষ্যগুলি সাধনের ক্ষেত্রে সেটা বাধা সৃষ্টি করতে পারে। জনগণ যখন সামাজিক আর রাজনীতিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে না তখন চক্রান্ত আর সামরিক চোটে বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজের সঙ্গে মোকাবিলা করা প্রতিক্রিয়াপন্থীদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। বাস্তবিকই, জনগণ কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা যে এখানে-ওখানে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত অপেক্ষাকৃত সহজে চালাতে সফল হয় তার কারণ সামাজিক গণতন্ত্রীকরণের অপ্রতুলতা ছাড়া আর কী! সমাজের বৈপ্লবিক পুনঃসংগঠনের কাজে জনসাধারণকে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হলে, জনসাধারণ যদি স্বগৃহে নিজেদের মালিক হিসেবে বোধ করে, তাহলে দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াপন্থীদের অবিরাম চক্রান্ত আর ফন্দি-ফিকিরের মুখে উঠতি দেশগুলির কোট বজায় রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। শুধু তাই নয়: মেহনতী জনগণ বিপ্লবের সক্রিয় অংশগ্রহণ না করলে এবং বলিষ্ঠ উদ্যোগ না দেখালে, এশিয়া আর আফ্রিকার কোন কোন অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশে যেসব প্রগতিশীল সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কার হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলিকে শেষ অবধি নিয়ে যাওয়া এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করা অসম্ভবই হবে।

আলোচ্য দেশগুলিতে সামাজিক উন্নয়ন এগোবার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র সম্প্রসারিত এবং আরও মজবুত করার এইসব সমস্যার আপেক্ষিক গুরুত্ব ক্রমাগত বেড়েই চলবে — কেননা, সমগ্র জনগণের ব্যাপক, সক্রিয় এবং সচেতন অংশগ্রহণ ছাড়া নতুন সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যের অনুযায়ী কোন জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবে রূপায়িত করা যায় না। লেনিন লিখেছেন, '**ব্যাঙ্কগুলো হাতে না নিয়ে,** উৎপাদনের উপকরণে **ব্যক্তিগত মালিকানা** বাতিল না করে পুঁজিতন্ত্রকে পরাস্ত করা যায় না। তবে, বুর্জোয়াদের কাছ থেকে অধিকার করে নেওয়া উৎপাদনের উপকরণগুলোর গণতান্ত্রিক

পরিচালনার জন্যে সমগ্র জনগণকে সংগঠিত না করে, মেহনতী জনগণ, প্রলেতারিয়ান, আধা-প্রলেতারিয়ান আর ছোট কৃষকদের মধ্যে তাদের শক্তিগুলির গণতান্ত্রিক সংগঠনের জন্যে, রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলিতে তাদের অংশগ্রহণের জন্যে তাদের সমগ্র অধিকাংশকে সমবেত না করে এইসব বৈপ্লবিক ব্যবস্থা রূপায়িত করা যায় না।'*

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 23, p. 25.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন মতাদর্শগত সমস্যা

এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশে দেশে মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছে অনন্যসাধারণ এবং কঠিন অবস্থার মধ্যে। এই দুই বিশাল মহাদেশে ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে সবেমাত্র মুক্তি পাওয়া জাতিগুলি বিভিন্ন মতাদর্শগত ধারার উৎপত্তিতেই আনুকূল্য করছে — এই প্রক্রিয়া শেষ হতে ঢের বাকি আছে। বিভিন্ন প্রগতিশীল তত্ত্বের প্রভাবে এখানে যে বিশ্ববীক্ষা গড়ে উঠছে তার উপর অন্যান্য ভাব-ধারণার প্রভাবও অনুভূত হচ্ছে। কেউ কেউ বুঝাতে চান যে, অন্যত্র রচিত বিভিন্ন তত্ত্ব এবং ভাব-ধারণা এশিয়া এবং আফ্রিকার পক্ষে উপযোগী নয় — এশিয়া আর আফ্রিকার জন্যে চাই নাকি 'বিশুদ্ধ এশীয়' কিংবা 'বিশুদ্ধ আফ্রিকান' তত্ত্ব, সেটা হবে অন্যান্য সমস্ত তত্ত্ব থেকে পৃথক। বহু জাতীয়তাবাদী জোর দিয়ে উন্নয়নের কোন বিশেষ, পৃথক পন্থা আবিষ্কার করার প্রয়োজনের কথা বলেন, আর সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে ঐ মতটাকে প্রবলভাবে সমর্থন করা হয়। নয়া-উপনিবেশবাদের মতাদর্শওয়ালারা নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে 'তৃতীয় পন্থার' মতাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করছে — যাতে এই 'তৃতীয় পন্থার' আড়ালে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত এবং আরও মজবুত হতে পারে।

একদিকে গণ-নিরক্ষরতা, দুর্বল সংগঠন এবং প্রায়ই প্রলেতারিয়েতের মধ্যে অপ্রতুল রাজনীতিক শিক্ষা, আর অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের প্রবল প্রভাব — এই জটিল পটভূমির দরুন প্রগতিশীল বৈপ্লবিক তত্ত্বের প্রসার

ব্যাহত হয় এবং তৃতীয় দ্বনিয়ার দেশগ্বলিতে মতাদর্শগত অবস্থা জটিল হয়ে ওঠে। তারই সঙ্গে সঙ্গে, এখনও পরিবর্তনশীল এই আবহাওয়ায় রয়েছে ঘৃণ্য ঔপনিবেশিক অতীত বর্জনের প্রচণ্ড মনোভাব, চলেছে নতুন নতুন ভাব-ধারণার জন্যে সন্ধান — তাতে আসে প্রগতিশীল বৈপ্লবিক বিশ্ববীক্ষার প্রতিষ্ঠার বড় বড় সম্ভাবনা।

১। উন্নয়নশীল দেশগ্বলিতে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ধারা

এশিয়া আর আফ্রিকার যেসব দেশ ঔপনিবেশিক জোয়াল ছ্বড়ে ফেলে দিয়েছে সেইসব দেশের মান্বষ এখন সমাজতন্ত্রের বিপ্বল আকর্ষণশক্তি অন্বভব করছে। বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্বের ব্যাপক প্রসার, এর কোন কোন দেশে বিভিন্ন প্রকৃত সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কার এবং বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ধারার উদ্ভবের মধ্যে সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশগ্বলিতে এইসব সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক র্পে আর মর্মবস্তু দ্বই দিক থেকেই খ্বই বিভিন্ন। এইসব দেশে সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারণার প্রতি তিন রকমের মনোভাব এখন বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে — অবশ্য অন্যান্য ধরনের মনোভাব থাকলেও সেগ্বলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা কঠিন।

গোড়ায়ই বলা যেতে পারে, বিভিন্ন বিস্তৃত সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কারের সাহায্যে সমাজের বৈপ্লবিক প্বনঃসংগঠনের জন্যে বদ্ধপরিকর জাতীয়-গণতান্ত্রিক শক্তিগ্বলির ধ্যান-ধারণা রয়েছে; সমাজতন্ত্রের দিকে বিকাশের বনিয়াদ স্থাপিত হবে ঐসব সংস্কারের ফলে। মিসর, বর্মা, আলজিরিয়া, মালি, গিনী, কঙ্গো (ব্রাজাভিল), সিরিয়া এবং তাঞ্জানিয়ার মতো দেশগ্বলিতে শাসক রাজনীতিক পার্টিগ্বলির বিভিন্ন কংগ্রেসে এবং নেতাদের বিভিন্ন সরকারী উক্তিতে এমনসব বিষয়ে গ্বরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে — যেমন, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের উপায়, সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ম্লনীতির অর্থ, উন্নয়নশীল দেশগ্বলিতে বিদ্যমান বাস্তব সামাজিক এবং জাতীয় অবস্থায় সেইসব ম্লনীতির প্রয়োগ, বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কারের প্রকৃতি, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, কতকগ্বলি দেশে এমনসব ম্লত ব্বর্জোয়া ধ্যান-ধারণা দেখা দিচ্ছে যেগ্বলিতে 'সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের' কথাটা প্রধানত ঘোষণাম্লক ছাড়া

কিছু নয়। এশিয়া এবং আফ্রিকার কয়েকটা রাষ্ট্র চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ স্থাপনের ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু এই লক্ষ্য কিভাবে সাধিত হবে সেটা বুঝিয়ে বলা হয় না। এটা একটা যুগের লক্ষণ: সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক পার্টিগুলি এবং জাতীয় নেতারা এইভাবে সমাজতন্ত্রকে এবং পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের অবস্থার মধ্যে সাধিত বিভিন্ন কম-বেশি গণতান্ত্রিক সামাজিক সংস্কারকে এক করে দেখান। যেমন, ভারতীয় 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র', সেনিগাল আর কেনিয়ার 'আফ্রিকান সমাজতন্ত্র', তিউনিসিয়ার 'দেস্তুর সমাজতন্ত্র', ইত্যাদি সম্বন্ধে ঐ কথা খাটে।

তৃতীয়ত, এশিয়া আর আফ্রিকার কয়েকটি দেশে দেখা দিয়েছে কোন কোন ভুয়া-সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারণা — তাতে প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়াশীল মর্মটাকে গোপন করার জন্যেই 'সমাজতন্ত্র' শব্দটার কুশলী অপব্যবহার করা হয়। এটা হল প্রতিক্রিয়াপন্থীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্যে এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা মনোভাব গোপন কিংবা ন্যায্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তাটাকে কোন কোন রাজনীতিক পার্টি কিংবা গ্রুপের ব্যবহারের ব্যাপার। এর মধ্যে পড়ে 'ইসলামী সমাজতন্ত্রের' প্রচারক বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াপন্থী চক্র, ভারত, ইন্দোনেশিয়া আর বর্মার দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতারা এবং তাদের সমগোত্রীয় অন্যান্যেরা।

এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় এই নতুন এবং জটিল সামাজিক প্রক্রিয়াটাকে ঠিকমতো বুঝতে হলে, ঐসব অসংখ্য এবং অতি বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি আর সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার বাস্তব ব্যবস্থা যা অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলিকে যথোপযুক্ত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ধরে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। কোন ধারার সমাজতন্ত্রের মূল্যায়ন করতে হলে প্রশ্ন তোলা দরকার — ঐ ধারার অনুগামীদের গরজ কোন্ শ্রেণী-স্বার্থ নিয়ে, কি রকমের অবস্থায় তারা সক্রিয় রয়েছে, কোন্ কোন্ সামাজিক-আর্থনীতিক কর্মনীতি তারা তুলে ধরছে, আর কোন্ রকমের রাষ্ট্রক্ষমতা তারা গড়ে তুলছে।

এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে বেশির ভাগ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার মধ্যে একটা অভিন্ন উপাদান হল পুঁজিতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করা — যদিও তার পিছনে সামাজিক এবং শ্রেণীগত প্রেরণা বিভিন্ন। মিসরের জাতীয় সনদটি এই দেশের রাজনীতিক কর্মসূচি, এতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে:

'পুঁজির স্বাধীনতাকে প্রগতির পথ বলে মনে ক'রে যারা সেজন্যে আহ্বান জানায় তারা গুরুতরভাবে ভ্রান্ত। যেসব দেশকে কম-অগ্রসর থাকতে বাধ্য করা হয়েছে সেসব দেশে পুঁজি তার স্বাভাবিক বিকাশ দিয়ে আর্থনীতিক অগ্রগতি ঘটাতে আর সক্ষম নয়।'* বর্মার বৈপ্লবিক পরিষদের বিভিন্ন কর্মসূচি দলিলেও ভিত্তি হল দেশের পক্ষে অগ্রহণীয় ব'লে পুঁজিতান্ত্রিক পন্থা প্রত্যাখ্যান। ঐসব দলিলের একাংশে আছে: 'পুঁজিতন্ত্রের আমলে নিছক বুর্জোয়া আইন-ব্যবস্থার অধিকারবলেই উৎপাদনের উপকরণগুলি পুঁজিপতিদের হাতে, আর যে-শ্রেণীর কোন পুঁজি নেই সেই শ্রেণী, অর্থাৎ, শ্রমিক শ্রেণী শোষিত।' 'যে সামাজিক এবং রাজনীতির ব্যবস্থা আর সমাজের সেবা করতে পারে না এবং মানুষের উপর মানুষের শোষণ চলতে দেয় তার উপরও আমাদের নির্ভর করা উচিত নয়, তেমনি, ঐসব ব্যবস্থাকে যারা রক্ষা করে সেইসব শ্রেণী আর স্তরের উপরও আমাদের নির্ভর করা উচিত নয়।'**

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শহর এবং গ্রামাঞ্চলের জনগণ তাদের সাম্প্রতিক ঔপনিবেশিক অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়েই পুঁজিতন্ত্র সম্বন্ধে রায় দেয়। তাদের পক্ষে ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন এবং পুঁজিতন্ত্র একই, অভিন্ন। উপনিবেশবাদ পাছে আবার ফিরে আসে এই ভয়ে ব্যক্তিগত পুঁজি দিয়ে আর্থনীতিক উন্নয়নে তাদের কোন আস্থা নেই। এর থেকে বোঝা যায় যেসব দেশ পুঁজিতন্ত্রের পথ ধরেছে সেসব দেশেও শাসক পার্টিগুলি কেন পুঁজিতন্ত্রের প্রকাশ্য সমালোচনা করতে এবং জনগণের আস্থা পাবার চেষ্টায় বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক স্লোগান আওড়াতে বাধ্য হয়।

বর্তমানে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পার্টির বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে ভারতীয় একচেটিয়া কারবারগুলোর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা এবং ক্রমবর্ধমান রাজনীতিক প্রভাবের প্রকাশ্য নিন্দার কখনও কোন ঘাটতি দেখা যায় না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটা সভায় প্রয়াত জওহরলাল নেহরু একচেটিয়াগুলোকে সমাজতন্ত্রের শত্রু বলে অভিহিত করে বলেছিলেন, গত কয়েক বছরে একচেটিয়াগুলো যে পরিমাণে বেড়েছে সেই পরিমাণেই

---

* *The Charter*, Cairo, 1962, p. 50.

** *The System of Correlation of Man and His Environment*, pp. 20, 12.

দেশ সমাজতন্ত্র থেকে বিচ্যুত হয়েছে।* তবে, এই রকমের সমালোচনার ফল হিসেবে দেশটির পুঁজিতান্ত্রিক ধারায় বিকাশ রোধ করার কোন কার্যকর ব্যবস্থা সাধারণভাবে নেওয়া হয় নি। অভিজ্ঞতায় বরং দেখা যায় উল্টোটা: ভারতে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক দ্রুত স্থাপিত এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং একদল ছোট কিন্তু পরাক্রমশালী একচেটিয়া গোষ্ঠীর হাতে পুঁজি পুঞ্জীভূত হচ্ছে।

ভারতীয় 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' মতাদর্শবাদীরা পুঁজিতন্ত্রের সমালোচনা ক'রে ব্যক্তিগত পুঁজির কারবারগুলি কিছুটা সীমাবদ্ধ করার কথাই শুধু বলেন। ঔপনিবেশিক শাসনের জেরের দরুন পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের সামাজিক-আর্থনীতিক দ্বন্দ্বগুলো প্রকোপিত হয়ে উঠেছে, সেগুলোর তীব্রতা কোনক্রমে একটু কমাতে চেয়ে তাঁরা চেষ্টা করছেন যাতে বৃহৎ শিল্প ক্ষুদ্র শিল্পকে একেবারে গলা টিপে না মারে; ক্ষুদ্র শিল্পগুলোতে এখন নিযুক্ত লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটি, আর বৃহৎ শিল্পে ৪০ লক্ষ। আজকের ভারতে জনসংখ্যার চাপ রয়েছে প্রচন্ড, ক্ষুদ্র শিল্প ধ্বংস হলে তার ফলে হয়ত বিপুলসংখ্যক শ্রমিক নিঃস্ব হয়ে যাবে, হয়ত ঘটবে সামাজিক বিস্ফোরণ — এসব ভালভাবেই বুঝে ঐসব মতাদর্শবাদীরা হস্তশিল্পসমেত ছোটখাটো বহু কারবার গড়ে ওঠার ভিতর দিয়ে উৎপাদনের উপকরণগুলোর কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে আহ্বান জানান। মূলত পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশটাকে ঢাকবার জন্যে তাঁরা বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক স্লোগান ব্যবহার করতে চান; ভারতের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং জাতীয় উপাদানগুলির সঙ্গে মানিয়ে-বনিয়ে নিয়ে তাঁরা বিদ্যমান বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্ক বজায় রাখতে চান।

যেসব দেশে রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জিত হবার পরে ক্ষমতাসীন হয়েছে বুর্জোয়া-জমিদার জোট সেসব দেশে প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক স্থায়ী করে তোলার ইচ্ছাটাই পুঁজিতন্ত্রের সমালোচনা করার উদ্দেশ্য। এইসব দেশের জাতীয় বুর্জোয়ারা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ভাঙনে আগ্রহশীল হতে পারে, কিন্তু জমিদারী সম্পত্তির অধিকার কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ করতে তারা দ্বিধা করে। সাধারণভাবে, বড় বড় জমিদারিকে জমিদারদের হাতে ছেড়ে রেখেই তারা সেগুলোকে যথাসম্ভব পুঁজিতান্ত্রিক

---

* 'প্রাভদা', ২০শে জুন, ১৯৬৪।

ধরনের আর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য অনুসারে চলে। ওদিকে, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারেরা বোঝে পুঁজিতন্ত্র সেখানেও কম-বেশি পরিমাণে দাঁড়িয়ে গেছে, 'বিশুদ্ধ' রূপের সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব, কাজেই, জাতীয় অর্থনীতিতেই শুধু নয়, রাজনীতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন আর মতাদর্শক্ষেত্রেও তারা আগামী দীর্ঘকাল যাবত আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়ক রূপের বিকাশের পক্ষপাতী হয়।

পুঁজিতন্ত্র আয়ু ফুরিয়েও টিকে আছে, সারা পৃথিবীতে বিরাট পরিসরে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ চলেছে — এমনই যুগে উঠতি দেশগুলি ধরছে স্বাধীন উন্নয়নের পথ। জীবনযাত্রার মৌলিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং দ্রুত আর্থনীতিক আর সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র সমাজতন্ত্রই — এই প্রত্যয়ের প্রসার ঘটছে, এই প্রত্যয় আজকাল আরও দৃঢ় হয়ে উঠছে, তার কারণ হল সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সাফল্যগুলিই শুধু নয়, তার আরও কারণ হল জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের বিস্তৃত গণতান্ত্রিক কর্মসূচি রূপায়িত করবার মধ্যে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির নিজেদেরই অভিজ্ঞতা।

যারা পুঁজিতন্ত্রের ওকালতি করে তারাও বাধ্য হয়ে স্বীকার করে, পুঁজিতন্ত্রের প্রতি তৃতীয় দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলির বিশেষ আকর্ষণ নেই। একজন মার্কিন অধ্যাপক হ্যান্স মর্গেন্‌থো লিখেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাইই সাধন করেছে যা 'চায় অপেক্ষাকৃত আলোকপ্রাপ্ত কম-অগ্রসর দেশগুলি: দ্রুত শিল্পযোজনার ভিতর দিয়ে জাতীয় উৎপাদনের প্রচণ্ড বৃদ্ধি... ঐ একই ফল পেতে চেয়ে কম-অগ্রসর দেশগুলি সেইসব পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না যা অন্যত্র এই ফল ফলিয়েছে। তার সঙ্গে তুলনায় বিসদৃশ হল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিস্তৃত মন্থর প্রক্রিয়া, যার ভিতর দিয়ে শিল্পযোজনা মারফত পশ্চিমের দেশগুলি জীবনযাত্রার উঁচু মান পেয়েছে, সেটা তাদের মনে ঢের কম সাড়া জাগাবে।'*

সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে বাস্তব এবং কল্পিত বিভিন্ন অসুবিধা দেখিয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ আর রাজনীতিকেরা সেগুলি ব্যবহার করবার চেষ্টায়

---

* Hans Morgenthau, "A Political Theory of Foreign Aid", *The American Political Science Review,* Vol. LVI, No. 2, June 1962, p. 307.

উঠতি দেশগুলিকে পরামর্শ দেয় যে, ব্যক্তিগত কারবার গণ্ডিবদ্ধ কিংবা বিলুপ্ত করার যেকোন ব্যবস্থা করা থেকে তারা যেন পুরোপুরিই বিরত থাকে।* এই প্রসঙ্গে তারা পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কথা বলে। কিন্তু আমরা তো জানি, উৎপাদন-শক্তিগুলিকে বিকশিত করে এখনকার মাত্রায় তুলতে পশ্চিম ইউরোপের লেগেছিল কয়েক শতাব্দী। পশ্চিমের পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উন্নয়ন ঘটাতে তাদের বিভিন্ন উপনিবেশে লুটতরাজের ভূমিকা বড়-কম ছিল না, একথাটাও মনে রাখতে হবে। লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, পুঁজিতান্ত্রিক পথে চললে প্রাক্তন উপনিবেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপর আর্থনীতিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উঠতি দেশগুলিতে প্রগতিশীলেরা বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করছেন, — এক-পুরুষের জীবৎকালেই এই রাষ্ট্রগুলি উৎপাদন-শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েছে। ইতিহাসের শিক্ষা মনে রেখে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের অনেক নেতাই দেখতে আরম্ভ করেছেন যে, ব্যক্তিগত কারবার অর্থনীতিগতভাবে অনুপযোগী, আর অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই দ্রুত আর্থনীতিক উন্নয়নের বাস্তব এবং কার্যত একমাত্র আশা।

বিকাশের পুঁজিতান্ত্রিক পন্থা এইভাবে প্রত্যাখ্যান করাটা আপনাতেই প্রগতিশীল — কেননা, এটা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের প্রসারের এবং দেশীয় আর বৈদেশিক পুঁজির রাজনীতিক অবস্থানগুলিকে দুর্বল করে ফেলার সহায়ক।

মেহনতী জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা, শোষণের অবসান

---

* 'আর্থনীতিক বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্ব' সংক্রান্ত ব্যাপকভাবে প্রশংসিত তত্ত্বের রচয়িতা ওয়াল্ট্ রস্তভ দৃঢ়োক্তি করেছেন, 'উন্নয়নশীল সমাজগুলির অবশ্যম্ভাবী না হলেও স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে প্রক্রিয়াটার বৃহৎ অংশকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিগত সংস্থানের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে দিতে হয়... আমাদের নিজেদের এবং অন্যান্যের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নিশ্চিত যে, মোটারকমের ব্যক্তিগত কারবারের ক্ষেত্রের অস্তিত্ব জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির বড় বড় লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বহু পরিমাণে সেগুলির শক্তি বাড়াতে পারে।' Walt Rostow, "Economic Development. Lessons of a Common Experience", *Vital Speeches of the Day*, New York, Vol. XXIX, No. 23, Sept. 15, 1963, p. 714.

ঘটানো এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার আন্তরিক কামনাই এশিয়া আর আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রগুলিতে বহু সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার একটা অভিন্ন উপাদান। তবে, সংখ্যাল্প এবং অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী, রাজনীতিক সংগ্রামের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা, না-ওয়াকিবহাল জনগণ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি না-থাকা, ঔপনিবেশিকতার জেরের অন্যান্য দিক — এইসব বিদ্যমান সামাজিক এবং আর্থনীতিক অবস্থার দরুন এখনও অবধি কোন পূর্ণাঙ্গ এবং যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ববীক্ষা গড়ে ওঠে নি।

যেসব দেশে শ্রেণীগত পৃথগ্‌ভবন যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি সেইসব দেশে জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের একটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই সব বিপ্লবের নেতৃত্বে প্রায়ই এমনসব ব্যক্তি থাকেন যাঁদের মার্কসবাদের সঙ্গে তেমন কোন পরিচয় নেই, কাজেই, তাঁদের মতাদর্শগত পুঁটলিটা নানা অসমসত্ত এবং পরস্পরবিরোধী ধর্মীয় আকাশকুসুম, সংস্কারবাদী, ইত্যাদি মতামতের একটা তালগোলপাকানো ব্যাপার হবার সম্ভাবনাই বেশি। এরই সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয় বিপ্লবের বিভিন্ন জরুরী প্রয়োজনের ফলে তাঁরা বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন উপস্থাপনাও ব্যবহার করতে বাধ্য হন, — বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র তো আজকাল তত্ত্ব মাত্র নয়, এটা একটা চলিতকর্মও বটে, তার উদাহরণ-ব্যাখ্যা হল সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা।

লেনিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন জীবনযাত্রার পরিবর্তনশীল অবস্থা, শিল্পযোজনা, শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবৃদ্ধি আর সংহতি এবং জনগণের বিস্তৃত অংশের ক্রমবর্ধমান রাজনীতিক চেতনার মতো ঘটনাবলির ফলে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার এমনসব প্রবক্তা দেখা দিতে পারেন, যাঁরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না করেও বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র গ্রহণ করতে পারেন। লেনিন লিখেছেন, 'বৃহদায়তন শিল্প যেখানে সবচেয়ে বেশি বিকশিত সেখানে শ্রমিক শ্রেণী আর তার মতাদর্শবাদীরা সবচেয়ে সহজে, দ্রুত, পূর্ণাঙ্গ রূপে এবং স্থায়িভাবে মার্কসবাদ আত্তীকৃত করে। যেসব আর্থনীতিক সম্পর্ক অনগ্রসর কিংবা যথেষ্ট বিকশিত নয় সেগুলির দরুন নিরন্তর শ্রমিক আন্দোলনের এমনসব সমর্থক দেখা দেয় যারা সাধারণভাবে বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষার এবং বিশেষভাবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষার যাবতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে ভেঙে ফেলতে অপারগ হয়ে আত্তীকৃত করে কেবল মার্কসবাদের কোন কোন দিক, এই নতুন বিশ্ববীক্ষার

কেবল কোন কোন অংশ কিংবা পৃথক পৃথক স্লোগান আর দাবি।'* কাজেই, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি নিজেদের বিশ্ববীক্ষা মূলত বজায় রেখে, তারই সঙ্গে সঙ্গে, যেসব ধারা আর গ্রুপ বিভিন্ন প্রগতিশীল সংস্কার সাধন করছে তাদের সঙ্গে মৈত্রী মজবুত করে তুলবে এটা খুবই স্বাভাবিক।

কতকগুলি উন্নয়নশীল দেশে জাতীয়-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার মধ্যে নির্ধারিত নিজ নিজ মতামত এবং ধারণা ছাড়াও পথপ্রদর্শক হিসেবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অভিজ্ঞতা অনুসারে বাস্তবায়িত করছে বিভিন্ন বিস্তৃত গণতান্ত্রিক, পুঁজিতন্ত্রবিরোধী সংস্কার — যেমন, বিভিন্ন বৈদেশিক পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তির জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার, পরিকল্পনা, দেশীয় পুঁজির উপর বাধানিষেধ এবং তার আংশিক জাতীয়করণ, ইত্যাদি। এইরকমের অনেক মূর্ত-নির্দিষ্ট ব্যবস্থার প্রকৃতি প্রগতিশীল, এগুলি দিয়ে পরে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের বৈষয়িক আর সামাজিক বনিয়াদ কায়েম হয় — যদিও, সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দেশে কতকগুলি গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে তত্ত্বগত চিন্তাধারা হয়ত এখনও বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র মেনে নেবার থেকে বহু দূরবর্তী, কখনও কখনও কমিউনিজম-বিরোধী বদ্ধধারণাও থাকতে পারে।

মিসরী আরব প্রজাতন্ত্রে ব্যাঙ্ক, বিমা কোম্পানি এবং বিভিন্ন বড় আর মাঝারি শিল্পায়তনের জাতীয়করণ এবং হালকা আর ভারি শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলি, পরিবহন, বৈদেশিক আর দেশীয় পাইকারী বাণিজ্য নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শক্তিবৃদ্ধির ফলে বড় এবং কিছু পরিমাণে মাঝারি মিসরী বুর্জোয়াদের প্রভাব নষ্ট হয়েছে।

বর্মায়, 'সমাজতন্ত্রের বর্মী পন্থায়' মোটামুটি উপস্থাপিত বিভিন্ন সামাজিক এবং আর্থনীতিক সংস্কারের বিস্তৃত কর্মসূচি বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে, — রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটিকে সম্প্রসারিত এবং মজবুত করাই তার মূল লক্ষ্য, এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র হবে স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির বনিয়াদ। এই ঘোষণায় আছে: 'বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্যে উৎপাদনের বিভিন্ন চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন উপকরণ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে — যেমন, কৃষি উৎপাদন আর শিল্পোৎপাদন, বণ্টন, পরিবহন, যোগাযোগ, বহির্বাণিজ্য, ইত্যাদি। উৎপাদনের এই সমস্ত জাতীয় উপকরণের

---

* V. I. Lenin. *Collected Works*. Vol. 16, p. 348

মালিক হওয়া চাই রাষ্ট্র, কিংবা বিভিন্ন সমবায় সমিতি কিংবা বিভিন্ন যৌথ ইউনিয়ন। এই রকমের বিভিন্ন মালিকানার মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রধান বনিয়াদ।'*

বর্তমানে, এদেশে সক্রিয় চব্বিশটা বৈদেশিক এবং দেশীয় ব্যক্তিগত-মালিকানাধীন ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হয়েছে, তেমনি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে একটি মিশ্র বর্মী-বৃটিশ কারবার 'বর্মা অয়েল কোম্পানি' এবং অন্যান্য সমস্ত বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান। বহির্বাণিজ্য এবং চাল কেনা আর বণ্টন করা এখন পুরোপুরিই রাষ্ট্রের হাতে।

আলজিরিয়ায় ১৯৬৩ সালে মার্চ মাসে বৈদেশিক আর দেশীয় পুঁজি জাতীয়করণ সংক্রান্ত ডিক্রি দিয়ে এবং আরও বিশেষত মেহনতী জনগণের উদ্যোগে স্থাপিত স্বয়ংপ্রশাসিত ক্ষেত্র দিয়ে ক্রমে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে যাবার একটা বনিয়াদ তৈরি হয়েছে।

মিসর, বর্মা, আলজিরিয়া, মালি, গিনী, সিরিয়া এবং অন্যান্য দেশে প্রবর্তিত বিভিন্ন সামাজিক এবং আর্থনীতিক সংস্কার সোজাসুজিই পরিচালিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে তার প্রধান অবলম্বন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, তেমনি পরিবর্তন আর চরিত্রের দিক দিয়ে পুঁজিতন্ত্রেরও বিরুদ্ধে। এইসব দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রূপের মালিকানার অস্তিত্বটাকে সেখানকার বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অনুগামীরা যে বরদাস্ত করেন তার ফলে ঐ অবস্থাটা নাকচ হয়ে যায় না, বরং সেটা থেকে দেখা যায় জাতীয় দেশপ্রেমিক শক্তিগুলি পরিস্থিতির বাস্তবতাটাকে বিবেচনায় ধরেন। এইসব দেশে একাধিক রকমের অর্থনীতিতে উত্তরণকালের একটা বাস্তব বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হচ্ছে, তার কোন কোন অপরিহার্য পর্ব ডিঙিয়ে যেতে গেলে সেটা অনেক সামাজিক স্তরকে বিপ্লব থেকে শুধু সরিয়ে দেবারই কাজ করতে পারে, ঐসব স্তর ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার প্রতি অল্প-বিস্তর অনুরাগী, — সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির জমিন তৈরি করছে যেসব বিস্তৃত সামাজিক আর আর্থনীতিক সংস্কার সেগুলির বিরুদ্ধে তাদের ঠেলে দেওয়া হতে পারে তার ফলে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা এবং চলতি

---

* *The Burmese Way to Socialism.* The Policy Declaration of the Revolutionary Council, April 30, 1962, p. 3.

সামাজিক আর আর্থনীতিক সংস্কারগুলির প্রকৃতি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে হলে বোঝা দরকার ঐসব দেশে জাতীয়-গণতান্ত্রিক নেতাদের মতামত নিশ্চল নয়: ক্রমঅভিব্যক্তির নিরবচ্ছিন্ন এবং দ্রুত প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই চলেছে এইসব মতামত, তার ঝোঁকটা বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রেরই দিকে। যেমন, রাষ্ট্রপতি নাসের 'বিপ্লবের দর্শন' নামে পুস্তিকায় লিখেছিলেন: 'আমরা যা চাই সেখানে পৌঁছবার পথ কি — এই দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর প্রসঙ্গে আমি স্বীকার করছি, আমার মনে সেটা যত বার বদলেছে তত আর কোন বিষয়ে নয়।'*

১৯৬২ সালে গৃহীত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের যে 'জাতীয় সনদে' দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন একটা বিশেষ পর্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার একাংশে আছে: 'বৈপ্লবিক পন্থায় প্রগতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে মিসরে আর্থনীতিক আর সামাজিক কম-অগ্রসরতার সমস্যার সমাজতান্ত্রিক সমাধানটা কখনও ইচ্ছামতো বেছে নেওয়া না-নেওয়ার বিষয় ছিল না। সমাজতান্ত্রিক সমাধানটা ছিল একটা ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতা — সেটাকে চাপিয়ে দিয়েছিল বাস্তবতা, জনগণের সুস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ শতকের দ্বিতীয়াংশে পৃথিবীর পরিবর্তনশীল প্রকৃতি।'**

ঐ 'সনদে' সমাজতন্ত্রের এই সংজ্ঞা আছে:

'সমাজতন্ত্র হল সামাজিক মুক্তির পথ। জাতীয় সম্পদের ন্যায্য অংশ পাবার জন্যে প্রত্যেকটি নাগরিকের সমান সুযোগের ভিতর দিয়ে ছাড়া সামাজিক মুক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় সম্পদের নিছক পুনর্বণ্টনেই এটা সীমাবদ্ধ নয় — এতে সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি এই জাতীয় সম্পদের বনিয়াদ সম্প্রসারিত করানো চাই, যাতে শ্রমজীবী জনগণের আইনসম্মত অধিকার মিটতে পারে। অর্থাৎ কিনা, পর্যাপ্ততা আর ন্যায়পরতা এই দুই অবলম্বন নিয়ে সমাজতন্ত্র হল সামাজিক মুক্তির পথ।'***

'বর্মী সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচির পার্টির তত্ত্ববিদ্যার' রচয়িতারা নিজেরাই

---

* Gamal Abdel Nasser, *The Philosophy of Revolution*, Cairo, 1952, Book I, p. 31.

** The Charter, p. 49.

*** ঐ।

বলেছেন নিজেদের মতাদর্শটিকে তাঁরা 'পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত' বলে মনে করেন না, তাঁরা বলেছেন, 'আমাদের মতাদর্শটিকে ক্রমেই আরও বেশি সামগ্রিক করে তুলবার জন্যে আমাদের পার্টি চেষ্টা করে চলবে।'*

সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার বিভিন্ন জাতীয়-গণতান্ত্রিক পার্টির কর্মসূচিগত দলিলে কিছুটা অসামঞ্জস্য, এমনকি পল্লবগ্রাহিতা থাকার কারণ হল শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্য স্তরগুলির স্বার্থ আর মতামতের স্ববিরোধী এবং অস্থিত প্রকৃতি — সেগুলি এইসব দলিলে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে, সেগুলির তাৎপর্য হল এই যে, সেগুলি জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের তীব্রতাবৃদ্ধিরই প্রমাণ — এই বিপ্লব ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় হয়ে উঠছে সামাজিক, অর্থাৎ কিনা, পুঁজিতন্ত্রবিরোধী।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অপ্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রের যেসব ধারণা দেখা দেয় সেগুলির মধ্যে বেশকিছু উপস্থাপনা থাকে যেগুলি বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না, সেগুলিতে অন্যান্য জাতির অভিজ্ঞতা বিবেচনায় ধরা হয় না, সেগুলির দরুন সামাজিক মুক্তির অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যেতেও পারে।

সাধারণভাবে জনগণের স্বার্থ প্রতিফলিত করেন মার্কসবাদীরা; এশিয়া আর আফ্রিকার দেশে দেশে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারণা এবং স্লোগান তুলে ধরেন কেবল এই মার্কসবাদীরাই নন: এ কাজে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন কৃষক, কারিকর এবং বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী নেতারা। কোন কোন 'অনন্যসাধারণ' ধরনের সমাজতন্ত্র দাঁড় করাবারও বিভিন্ন চেষ্টা হয়েছে — তার ফলে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক স্লোগানে অনেক সময়ে পেটিবুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী ছোপ দেখা যায়। এইভাবেই এসেছে 'আফ্রিকান সমাজতন্ত্র', 'আরব সমাজতন্ত্র', ইত্যাদি ধারণা।

উঠতি দেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্র বিকাশের অপেক্ষাকৃত নিচু পর্বে থাকার দরুন ঐসব দেশে ক্ষুদ্রায়তনের পণ্য উৎপাদনের গুরুত্ব রয়েই গেছে। প্রকৃতপক্ষে, সেটাকে তাদের অর্থনীতিক্ষেত্রে বুনিয়াদিই বলা চলে। শহরের মধ্য স্তরগুলির অবস্থা অতি অনিশ্চিত, তাদের পক্ষে নিঃস্বতার বিপদ সদা-বর্তমান। একদিকে পরিস্থিতির প্রভাবে তারা একটা বৈপ্লবিক শক্তি, অন্যদিকে হরেক রকমের বদ্ধধারণা রয়েছে তাদের মনে। তাদের অনেকেরই

---

* *The System of Correlation of Man and His Environment*, p. 36.

স্ববিরোধী এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবার ঝোঁক আছে — যদিও ক্রমেই বেশি পরিমাণেই তারা প্রলেতারীয় চিন্তাধারার কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। নতুন রাষ্ট্রগুলির ঔপনিবেশিক অনগ্রসরতা থেকে আধুনিক সমাজে উত্তরণকালে সক্রিয় প্রক্রিয়াগুলির জটিলতা এর ফলে বেড়ে যায়।

এই রকমের প্রক্রিয়াগুলিকে সরলীকরণের চেষ্টা করা হলে, অবাস্তব কোন ছকের সঙ্গে সেগুলিকে মেলাবার চেষ্টা হলে রাজনীতিক মূল্যায়ন শুধু আরও কঠিন হয়েই ওঠে। এই রকমের অগঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির একটা দৃষ্টান্ত হল এই দৃঢ়োক্তি যে, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনের আর্থনীতিক বনিয়াদ হিসেবে জাতীয়করণে যেন কোন অবস্থায়ই খেসারত দেওয়া চলতে পারে না।

মার্কস এবং লেনিন কিন্তু এমন সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন যে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্যায়ে, কোন কোন অবস্থায়, যেসব বুর্জোয়া নতুন সরকারের প্রতি অনুগত থাকে তাদের পয়সা দিয়ে রেহাই পাওয়াই সমাজের পক্ষে সুবিধাজনক হতে পারে। বহু উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক এবং দেশীয় পুঁজির মালিকানাধীন সম্পত্তি খেসারত দিয়ে হস্তগত করেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়া হয়। বর্মায় 'বর্মা অয়েল কোম্পানির' শেয়ারগুলো কিনে নিয়ে তৈল শিল্পের জাতীয়করণ হল। সিরিয়ায় ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে ১১৪টা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জাতীয়করণের ডিক্রি জারি করা হয় — তাতে মালিকদের খেসারত দেবার ব্যবস্থা ছিল। মূলত পুঁজিতন্ত্রবিরোধী এইসব ব্যবস্থা পরে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির একটা ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে, কাজেই, এগুলিকে প্রগতিশীল মনে করা যেতে পারে।

এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক যে, অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসংখ্যা কৃষকপ্রধান ব'লে অপ্রলেতারীয়, নারোদনিক*-কৃষক কিংবা পেটি

---

* নারোদনিক্ — রাশিয়ায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে নারোদ্‌বাদ নামে পেটি বুর্জোয়া ভাবধারার অনুগামী; উনিশ শতকের ষষ্ঠ এবং সপ্তম দশকে এই ভাবধারা দেখা দিয়েছিল। স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং জমিদারিগুলোকে কৃষকদের মধ্যে বিলি করার পক্ষে ছিল নারোদ্‌নিক্‌রা। তারা মনে করত রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্র ছিল একটা সাময়িক ব্যাপার, তার বিকাশের কোন সম্ভাবনা ছিল না — কাজেই, প্রলেতারিয়েতকে নয়, কৃষককেই তারা রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রধান শক্তি বলে মনে করত।

বুর্জোয়া প্রকৃতির বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা এবং ধারণার উদ্ভব হয় এবং সেগুলির ব্যাপক প্রসার ঘটে। তবে, এর সবগুলিকেই 'পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র' বলে দেওয়া ঠিক নয় — কেননা, বিভিন্ন নির্দিষ্ট বিষয়ে এবং অনেক সময়ে বিভিন্ন মূলগত উপাদানের দিক দিয়েও সেগুলির মধ্যে বিভিন্ন গুরুতর পার্থক্য থাকে। এইসব দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এটা বিভিন্ন পেটি বুর্জোয়া আন্দোলনের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের মিলনের ব্যাপার নয় -- এটা হল জাতীয়-দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির ক্রমে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র গ্রহণ করার সম্ভাব্যতার ব্যাপার।

বিভিন্ন স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অনুসারেই বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের উপস্থাপনাগুলিকে ব্যবহার করতে হয়, এতে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে, বিভিন্ন জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কারণ দেখিয়ে বিজ্ঞান-সম্মত সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণত প্রত্যাখ্যান করাটাও আজগবি ব্যাপার। যেমন, সেনিগালে একটা 'মধ্য পন্থার' কথা খুবই বলা হয় — তাতে নাকি 'আফ্রিকান ব্যক্তিত্ব' রূপায়িত হবে। ভারতে অনেক সময়ে 'ভারতীয় সমাজতন্ত্রের' বিশেষক উপাদানগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় — তাতে পশ্চিমী অর্থনীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসীয় রাজনীতিক অর্থশাস্ত্রও প্রত্যাখ্যান করা হয়। 'ভারতীয় সমাজতন্ত্রের' অন্যতম মতাদর্শ-বিৎ ডঃ সম্পূর্ণানন্দ একটা আবেগমুখর চিত্রে দেখিয়েছেন, শ্রেণী-যুদ্ধের প্রকোপন ছাড়াই শাসকমহল স্বেচ্ছায় তাদের ধন-সম্পদ আর বিশেষ অধিকারগুলো ছেড়ে দেবে আর তখন পুঁজিতন্ত্র শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে মিলে-মিশে যাবে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'পুঁজিতন্ত্র থেকে পুঁজিপতিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব কি? আমার মনে হয় সেটা সম্ভব। কোন ব্যক্তির পক্ষে পুঁজি বিনিয়োগ করা এবং অপরাপরকে শোষণ না করেই বিভিন্ন শিল্পায়তন আর ব্যবসাকারবার চালানো সম্ভব...

'বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক ঊর্ধ্বাধঃ না হয়ে সমতল হতে পারে: মনিব আর কর্মচারীর সম্পর্ক নয়, হবে একই কারবারে সহকর্মী আর অংশীদারের সম্পর্ক। শ্রেণী-সংঘাতের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।'*

---

* Sampurnanand, *Indian Socialism*, Bombay, 1961, pp. 27, 65.

আফ্রিকার দেশগর্লির পক্ষে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের 'অনর্পযোগিতার' কথা বলেন কোন কোন লেখক; আফ্রিকায় কমিউন ধরনের গ্রামের অস্তিত্ব দেখিয়ে তাঁরা নিজেদের বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চান। মার্কসবাদে তো দীর্ঘকাল যাবত স্বীকৃত রয়েছে যে, চিরাচরিত আফ্রিকান ধরনের কমিউন কোন কোন অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে অগ্রসর হবার সূচনা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তেমনি, এটাও স্পষ্ট যে, পণ্য-অর্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক কমিউন ভেঙে যায়। কাজেই, কেবল গ্রাম কমিউন থেকেই আফ্রিকার দেশগর্লির সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের উদ্ভব কল্পনা করেন যেসব লেখক তাঁরা স্পষ্টতই আকাশকুসর্ম দেখছেন। আফ্রিকা মহাদেশে অর্থনীতিগতভাবে সবচেয়ে অনগ্রসর যেসব অঞ্চলে আধা-জীবনধারণের উপযোগী খামারের কাজই এখনও অবাধ নিয়ম হয়ে রয়েছে সেইসব অঞ্চলেও সম্পত্তি আর সামাজিক অবস্থান এই দর্ই দিক থেকেই কৃষকদের মধ্যে স্তর-ভেদ ক্রমেই বেশি মাত্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দেশীয় বাজার এবং বিশেষত রপ্তানির জন্যে বাজারী খামারের কাজ গড়ে ওঠার ফলে কমিউনঘটিত সম্পর্ক ক্ষর্ণ্ণ এবং বিনষ্ট হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন চিরাচরিত রূপ-রীতি যতদূর সম্ভব ব্যবহার করবার স্বাভাবিক কামনার দর্ন কোন কোন লেখক যাকে বলা হয় এক রকমের 'ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র' তার পাল্টা দাঁড় করান আফ্রিকার 'গোষ্ঠীগত সমাজতন্ত্র', যাতে শ্রেণী-সংঘাত একটা বিজাতীয় ব্যাপার।*

আফ্রিকার দেশগর্লিতে অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রাক্‌পর্ঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন

---

* যেমন, টম্ ম্বোয়া মনে করতেন, 'ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র থেকে আফ্রিকার সমাজতন্ত্রের একটা সম্পূর্ণ পৃথক ইতিহাস রয়েছে। ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের উদ্ভব কৃষি বিপ্লব আর শিল্প বিপ্লব থেকে — সেই বিপ্লবের ফলে সমাজ একদিকে ভূস্বামী আর পর্ঁজিপতি এবং অন্যদিকে ভূমিহীন আর শিল্পে নিযুক্ত প্রলেতারিয়েতে বিভক্ত হয়ে যায়। আফ্রিকায় এই রকমের বিভিন্ন শ্রেণীগত বিভাগ নেই — এখানে বিভিন্ন রাষ্ট্র জাতিসত্তা লাভ করেছে গণ-আন্দোলনের চাপে; ইউরোপে শাসন চালিয়েছে অভিজাত সম্প্রদায়, কিন্তু এখানে তা না হয়ে সরকার গঠিত হয় শ্রমিক আর কৃষকদের নেতাদের নিয়েই।' (Tom Mboya, *Freedom and After*, London, 1963, p. 167).

সম্পর্কের প্রাধান্য দেখিয়ে কখনও কখনও একটা বিশেষ ধরনের, বলা যেতে পারে 'সরলীকৃত' সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়ে থাকে, — এই সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটবে পুঁজিতন্ত্র থেকে না হয়ে বিভিন্ন প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক কাঠাম থেকে। এশিয়ার কোন কোন দেশে — যেমন, ভারতে — এখনও ব্যাপক ক্ষেত্রে এই মত পোষণ করা হয় যে, যন্ত্রসজ্জিত উৎপাদনের ভিত্তিতে না হয়ে অগ্রসর কারিগরী শিল্পের ভিত্তিতেই সমাজতন্ত্র গড়া হবে। এইভাবে দেখার কোন হেতু নেই — কেননা, এর থেকে আসে সমাজতন্ত্রের অতি-সরল ব্যাখ্যা, তাতে সমাজতন্ত্র যেন মালিকানার সামাজিকীকরণের চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু, মালিকানার সামাজিকীকরণ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলেও, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক মূলনীতিও কম গুরুত্বসম্পন্ন নয় — যেমন, উৎপাদনশক্তিগুলির উঁচু মাত্রায় বিকাশ, সমগ্র জনগণের উচ্চতর বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক মান, অধিকতর গণতন্ত্র, ইত্যাদি। লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, 'উৎপাদনশক্তিগুলির বিকাশ ঘটানোর কাজে বিপুল অগ্রপদক্ষেপ হতেই হবে'* — কেননা, শুধু শোষক শ্রেণীগুলোকে উচ্ছেদ করলে, তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলে এবং উৎপাদনের মূল উপকরণগুলির সামাজিকীকরণ হলেই তা যথেষ্ট নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের যেসব অঞ্চল অতীতে বিশেষ অনগ্রসর ছিল সেগুলি সমেত সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ধ-শতকের অভিজ্ঞতায় লেনিনের কথাটা পুরোপুরি প্রতিপন্ন হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক গড়ার কাজের প্রক্রিয়ার মধ্যে সমাজতন্ত্রের মূল বিশেষক উপাদানগুলি আসে ধাপে ধাপে। এশিয়ার যেসব দেশে এবং আরও বেশি পরিমাণে আফ্রিকার যেসব দেশে শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যায় ক্ষীণ এবং শিল্পে নিযুক্ত প্রলেতারিয়েত প্রায় নেই বললেই হয়, সেইসব দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াটাকে পরিচালিত করার সমস্যাটা বোঝা এর ফলে অপেক্ষাকৃত সহজ হবার কথা। অবশ্য, শ্রেণী-সচেতন প্রলেতারিয়েত না থাকলেও কোন কোন দেশের পক্ষে শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার পথ ধরাও সম্ভব। দেশ আর্থনীতিক আর সামাজিক প্রগতির পথে এগিয়ে চলতে থাকলে এবং নিজস্ব শিল্প গড়ে তুলতে থাকলে আধুনিক প্রলেতারিয়েত রূপধারণ করবে এবং শাসক জাতীয়-গণতান্ত্রিক পার্টির

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 29, p. 421.

ক্রিয়াকলাপ আর সাধারণভাবে দেশের জীবন এই দুই ক্ষেত্রেই তারা ক্রমেই আরও বেশি প্রবল রাজনীতিক ভূমিকায় আসবে। যে পরিমাণ শিল্পোন্নয়ন হলে অগ্রসর সমাজতন্ত্র গড়ার দরজা খুলে যায় সেই মাত্রায় দেশ যতদিনে পৌঁছবে ততদিনে দেশের প্রলেতারিয়েত একটা গুরুত্বসম্পন্ন রাজনীতিক শক্তি হয়ে গড়ে উঠবে।

আমরা দেখেছি, যেসব দেশে এখনও প্রলেতারিয়েতও নেই, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিও নেই এমনসব দেশ সমেত যেকোন দেশই সমাজতন্ত্রের পথ ধরতে পারে; কিন্তু, আধুনিক শিল্প ছাড়া সমাজতন্ত্রের চিত্র কল্পনা করা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনই শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালনা ছাড়া এবং বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়া প্রগতিশীল পার্টি ছাড়া সমাজতন্ত্র গড়া অসম্ভব। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির ক্ষেত্রে বিকাশের দ্বন্দ্বাত্মক প্রকৃতির অর্থ এটাই।

এর কোন কোন দেশে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় পেটি বুর্জোয়াদের ছাড়া অন্যান্য স্বার্থও প্রতিফলিত হতে পারে। রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের চলতি পর্বে মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সাধারণত জাতীয় বুর্জোয়ারাই পেটি বুর্জোয়া জনগণের উপর কর্তৃত্ব চালায়। বহু দেশে প্রাধান্যশীল শ্রেণী হিসেবে, সামাজিক প্রগতির কতকগুলি বিষয়ে শহর এবং গ্রামাঞ্চলের পেটি বুর্জোয়া স্তরগুলির সঙ্গে তারা কিছু পরিমাণে সমস্বার্থ। যেমন, ভারতে এই পরিস্থিতিটা এমন পরিসরে দেখা দিয়েছে যাতে একটা 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' রীতিমতো দাঁড় করানো হয়েছে এবং সেটা হয়ে উঠেছে জাতীয় বুর্জোয়াদের ঘোষিত মতাদর্শগত ধারণার কেন্দ্রী বস্তু। এরই সঙ্গে সঙ্গে, জনগণের উপর নিজেদের প্রভাব বজায় রাখবার গরজে জাতীয় বুর্জোয়ারা বাধ্য হয়ে নিজেদের কর্মসূচিতে পেটি বুর্জোয়াদের এবং যাকে বলা হয় মধ্যবর্তী স্তরগুলি তাদের কোন কোন দাবিদাওয়া অন্তর্ভুক্ত করে — যেমন, ভূমি সংস্কারের দাবি, কারিগরী শিল্পে সমর্থন, সমবায়, বড় শিল্প আর ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ। এইসব সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবিকেই অনেক সময়ে সমাজতান্ত্রিক বলে চালানো হয়।

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে নেতারা প্রায়ই 'উন্নয়ন' আর 'সমাজতন্ত্রকে' একই জিনিস বলে ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু, বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা (যেমন, জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়া) খুবই

প্রগতিশীল এবং প্রবল হতে পারে — তবু, এগুলি বাস্তবে রূপায়িত হলে তার ফলেই সমাজতন্ত্র আসবেই, বাস্তবিক এমন তো নয়। রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকৃতি, উৎপাদনশক্তিগুলির বিকাশের মাত্রা, বিভিন্ন শ্রেণীগত এবং রাজনীতিক শক্তির মধ্যে সম্পর্ক, জনগণের সক্রিয়তা এবং অন্যান্য আভ্যন্তরিক উপাদানের পটভূমিতে ঐ রকমের বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করে দেখা অত্যাবশ্যক। কোন কোন প্রগতিশীল ব্যবস্থা পরবর্তী সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জমিন তৈরি করতে পারে, কিন্তু সেগুলি নিয়েই সমাজতন্ত্র নয়। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান পরাক্রম এবং আজকের বৈপ্লবিক শক্তিগুলির বিভিন্ন সাফল্যের ফলে সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির পক্ষে বিকাশের সমাজতান্ত্রিক পথে চলা সম্ভব হয়ে উঠেছে। কিন্তু এইসব দেশকে এই সম্ভাবনার সুযোগ নিতে হলে তাদের জনগণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার জন্যে আহ্বান জানানো চাই, তাদের যাবতীয় আভ্যন্তরিক সংস্থান-সম্বলের সমাবেশ এবং ব্যবহার হওয়া চাই। এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলির অনুকূলে বিভিন্ন বহিঃস্থ উপাদানের বিকাশের মূল্য যত বড়ই হোক না কেন, সেগুলি সাফল্য নিশ্চিত করার জন্যে যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন আভ্যন্তরিক উপাদানই নিষ্পত্তিমূলক — কেননা, তা না হলে বহিঃস্থ অবস্থা অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও, কোন কোন সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রে সামাজিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি ঘটাল, অথচ অন্যান্য দেশ অনেক পিছিয়ে পড়েই রইল কেন, এর ব্যাখ্যা দেওয়া শক্ত হত।

নবীন রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রাধান্য মেনে নেওয়াই বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার একটা সম্ভাব্য ঝোঁক। জাতীয় বুর্জোয়ারা কোন না কোন পর্বে যেকোন রকমের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সোজা প্রত্যাখ্যান ক'রে (প্রতিক্রিয়াপন্থীরা তাই করাবার জন্যেই চেষ্টা করছে) প্রকাশ্যেই বিকাশের পুঁজিতান্ত্রিক পন্থার পক্ষে দাঁড়াতে পারে। অন্যদিকে, জাতীয় বুর্জোয়ারা নিজেরাই যে সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে তারা অক্ষম, এই উপলব্ধি অপ্রলেতারীয় জনগণের (কৃষক, কারিকর ইত্যাদি) মধ্যে দেখা দিতে আরম্ভ হলে এই অপ্রলেতারীয় জনগণ সমাজতন্ত্রের আরও কাছাকাছি এসে পড়ে এবং তাদের বিভিন্ন দেশের সামনে সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্যাগুলোর প্রতি শ্রেণীগত মনোভাবের প্রয়োজন বুঝতে পারে।

বিভিন্ন প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে ঢালাওভাবে প্রত্যাখ্যান করতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা চান না। তাঁরা বরং ঐসব ভাবধারাকে সযত্নে বিবেচনা করে দেখেন এবং জাতীয়-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির তুলে ধরা মতবাদে যাকিছু মূল্যবান এবং ইতিবাচক থাকে তা এবং, সর্বোপরি, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী আর পুঁজিতন্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থাবলি বাস্তবে রূপায়িত করবার অভিন্ন সংগ্রামে যাকিছু সহায়ক তা তাঁরা গ্রহণ করেন এবং সমর্থন করেন। তার আরও কারণ হল এই যে, সমাজতন্ত্র গড়ার ঘোষণা সংবলিত বিভিন্ন কর্মসূচির অনেকগুলিই রচিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদের আর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সাধনগুলির প্রভাবে।

বহু আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ধারণার উদ্ভব হয়েছিল অনেক সময়ে দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক মতাদর্শের প্রভাবে — যেমন, বৃটিশ লেবর আন্দোলনের প্রভাবে; ঐসব ধারণায় বিভিন্ন অসামঞ্জস্য, স্ববিরোধিতা এবং পল্লবগ্রাহিতা রয়েছে বলে নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিতে ঐসব ধারণার প্রতি যাঁদের আনুগত্য রয়েছে তাঁদের সমাজতন্ত্র থেকে ‘বহিষ্কৃত করার’ কোন কারণ নেই। কোন জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের কোন নেতা যখনই নিজ দেশকে বিকাশের সমাজতান্ত্রিক পথে চালিত করার জন্যে আন্তরিক চেষ্টা করবেন তিনি যাবতীয় যথার্থ গণতান্ত্রিক এবং বৈপ্লবিক শক্তির পূর্ণ সমর্থন পাবেন বলে নির্ভর করতে পারেন। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মত এই যে, এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে এখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা আর ধারণা এবং প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রের মাঝখানে কোন অনতিক্রমনীয় প্রাচীর নেই — ঠিক যেমন জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাঝখানেও তেমন কোন প্রাচীর নেই, যদিও এই দুইয়ের মধ্যে অবশ্য একটা মৌলিক গুণগত পার্থক্য আছে। যারা বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রকে এর ঠিক বিপরীত বলে দেখাতে চায় এবং বলতে চায় যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা যেন দেশপ্রেমিক জাতীয় শক্তিগুলির সমাজতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঢালাওভাবে নাকচ করে দেন, তাদের অপচেষ্টা নিতান্তই স্থূল। যেমন, ফেনার ব্রক্‌ওয়ে লিখেছেন, ‘মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা আফ্রিকায় সাধারণ সমাজতান্ত্রিক ধারার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয় — তার কারণ তারা দৃঢ়োক্তি করে যে, তাদের ‘বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র’

সমস্ত অবস্থায়ই প্রামাণিক, তার তত্ত্ব এবং পদ্ধতি ব্যতিক্রমহীনভাবে গৃহীত হওয়া চাই।'*

অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিক, জাতীয়, সামাজিক এবং আর্থনীতিক পটভূমি রয়েছে বলে উন্নয়নশীল দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক মূলনীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার বিভিন্ন পন্থা, রূপ এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে যথার্থ মৌলিক অবদান রাখতে পারে। সেটাকে অবশ্য এমন অর্থে ধরা যায় না যে, কোন সামাজিক ভাবধারা নিজে সমাজতান্ত্রিক নামধারণ করলেই শুধু তারই ফলে সেটা প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক হয়ে যাবে। অভিপ্রায় আর ঘটনের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। যেকোন শক্তি তার পুঁজিতান্ত্রিক মর্মটাকে গোপন করার জন্যে কোন সমাজতান্ত্রিক স্লোগান ব্যবহার করলে, সামাজিক আর জাতীয় মুক্তি এবং সমাজতন্ত্রের স্বার্থেই মতাদর্শগত ক্ষেত্রে ঐ শক্তির বিরুদ্ধে আপসহীন কঠোর সংগ্রাম চালাতে হবে। তেমনি, যেসব ভ্রান্ত তত্ত্বগত উপস্থাপনার দরুন সমাজতন্ত্রের বিজয়ের দিকে দেশে দেশে জনগণের অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটতে পারে, বিভিন্ন বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে কিংবা দেশে দেশে জনগণের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং দুর্দশা ঘটতে পারে সেইসব ভ্রান্ত তত্ত্বগত উপস্থাপনার গঠনমূলক সমালোচনাও করা দরকার ঐ একই স্বার্থ অনুসারে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের দৃষ্টিতে তাঁদের কর্তব্য হল: জনগণের কাছে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের সাধারণ প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া এবং বিভিন্ন জাতীয়-গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতার উপায় বের করা, সমস্ত প্রগতিশীল ধারাকে সমর্থন করা, যাঁরা কোন না কোন কারণে তত্ত্বক্ষেত্রে ভুল করেও বাস্তবে এগোচ্ছেন সমাজতন্ত্রেরই দিকে তাঁদের সবাইকে সমর্থন করা এবং যাঁরা আন্তরিকভাবে সমাজতন্ত্র কামনা করেও কোন না কোন কারণে এখনও বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র পুরোপুরি গ্রহণ করে উঠতে পারেন নি তাঁদের সমর্থন করা।

এটা আশা করা যেতে পারে যে, বিকাশের বাস্তব অবস্থা এবং পৃথিবীজোড়া পুঁজিতন্ত্রবিরোধী আর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ফলে সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে বহু অপ্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক ধারা বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের দিকে এগোবে — কেননা, আমাদের একালে সামাজিক প্রগতির পথ এবং বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের পথ এক হয়ে মিলে গেছে।

---

* Fenner Brockway, *Op. cit.*, p. 20.

২। জাতীয়তাবাদের দুটি ধারা

এশিয়া এবং আফ্রিকার অনেক দেশে মুক্তির জন্যে সংগ্রামের প্রেরণা আসে জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে। যেসব দেশ বিজাতীয় ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়ালে থেকেছে সেসব দেশে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব এবং বৃদ্ধি খুবেই যুক্তিসম্মত ঘটনা। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আর ঔপনিবেশিকতাবিরোধী মনোভাব থেকে উদ্ভূত এবং পদানত জাতির কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে গড়ে-বেড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ হল বিজাতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ, মুক্তির জন্যে এবং জাতীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্যে আগ্রহ। কাজেই, আগে যেসব দেশ ছিল সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক পশ্চাৎপ্রদেশ সেসব দেশে বিশেষত রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্যে লড়াইয়ের সময়ে জাতীয়তাবাদে একটা প্রগতিশীল মতাদর্শের বিভিন্ন প্রলক্ষণ থাকে, সেটা শ্রেণীগত এবং রাজনীতিক আনুগত্য নির্বিশেষে সমস্ত সামাজিক স্তরকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমবেত করে।

কোন কোন পশ্চিমী বুর্জোয়া লেখক জাতীয়তাবাদকে এক রকমের 'শিশু রোগ' বলে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেন — এই 'শিশু রোগ' যেন অনগ্রসর জাতিগুলিকে কাটিয়ে উঠতে হয়। নিজেদের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি এশিয়া আর আফ্রিকার উঠতি দেশগুলির অনুরাগটাকে বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশেরা মার্জনা করতে প্রস্তুত যদি তারা সাম্রাজাবাদবিরোধিতা ছেড়ে নয়া-উপনিবেশবাদ মেনে নেয়; তাদের বিশ্ব পুঁজিতন্ত্রের আওতার মধ্যে ধরে রাখার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে এই নয়া-উপনিবেশবাদী কর্মনীতি ।

কোন কোন লেখকের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ তৃতীয় দুনিয়ার অঞ্চলেই সীমিত, আবার আরও কেউ কেউ এটাকে দেখতে চান বিশ্বজনীন ব্যাপার হিসেবে — এমনকি আজকের সমাজের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবেই প্রায়। ফরাসী সমাজতত্ত্ববিৎ রাইমন আরোঁ ইউরোপে বিভিন্ন পুরন রূপের জাতীয়তাবাদের পুনরুদ্ভবের কথা এবং পৃথিবীর অন্যত্র নতুন নতুন রূপের জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের কথা লিখেছেন। বিশিষ্ট বৃটিশ ইতিহাসবেত্তা আর্নল্ড জে. টয়েনবীর মতে সভ্যতার সমগ্র ইতিহাসে জাতীয়তাবাদই হয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন প্রেরণাদায়ক উপাদান। তিনি মনে করেন, জাতীয়তাবাদ অন্য যেকোন 'বাদের' চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী: 'এইভাবে,

যেমন ব্যক্তিতাবাদীরা (পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধিরা) তেমনি কমিউনিস্টরা সর্বাগ্রে জাতীয়তাবাদী। তারা ব্যক্তিতাবাদী এবং কমিউনিস্ট কেবল দ্বিতীয় পর্যায়ে — অর্থাৎ কিনা, যতক্ষণ অবধি এইসব মতাদর্শ জাতীয়তাবাদের বাধ্য না হয়।'* জাতীয়তাবাদকে আমাদের একালের একটা প্রবলভাবে কার্যকর শক্তি বলে অভিহিত করে টয়েনবী কিন্তু সত্যিই মনে করেন এটা মানবজাতির সবচেয়ে হানিকর একটা অভ্যাস, যার উৎপত্তি হল গোষ্ঠীতন্ত্রে এবং নিজ সমাজের প্রতি মানুষের টানের মধ্যে। তিনি মনে করেন, একটা বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই জাতীয়তাবাদের অবসান ঘটাবার একমাত্র পথ।**

জাতীয়তাবাদ একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার — এটা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণও করা চাই বিভিন্ন মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সূত্রে। সমস্যাটার বিমূর্ত সূত্রবদ্ধ করা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে গ্রহণযোগ্য নয়। যে জাতি অন্য জাতির উপর উৎপীড়ন চালায় কিংবা আগে চালিয়েছে তার জাতীয়তাবাদ এবং উৎপীড়িত কিংবা আগে উৎপীড়িত জাতির জাতীয়তাবাদের মধ্যে, তেমনি, বৃহৎ জাতি আর ক্ষুদ্র জাতির জাতীয়তাবাদের মধ্যে যথাতথ পার্থক্য টানবার উপর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিশেষ জোর দেয়।

পুঁজিতন্ত্র যখন গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে সেই সময়ে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। ইউরোপে যখন সামন্ততন্ত্রের জায়গায় আসছিল তার চেয়ে অগ্রসর সমাজ-ব্যবস্থা পুঁজিতন্ত্র তখন জাতীয়তাবাদ ছিল প্রগতিশীল — কেননা, তখন সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্য আর সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধতার বিরুদ্ধে এবং জাতিগুলির ঐক্যসাধন আর বিভিন্ন কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্যে সংগ্রামে জাতীয়তাবাদ উঠতি বুর্জোয়াদের সহায়ক হয়েছিল।

কিন্তু পরে পুঁজিতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের পর্বে এলে একচেটিয়া বুর্জোয়ারা সম্প্রসারণের কাজে জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করল, এক জাতির উপর অন্য জাতির প্রভুত্ব স্থাপন করল। জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল দিক দেখা দিতে থাকল — জাতীয়তাবাদ পরিণত হল জাতিদম্ভে, জাতিবিদ্বেষে আর ফাশিবাদে।

---

* Arnold J. Toynbee, *Change and Habit. The Challenge of Our Time*, London, 1966, p. 175.

** ঐ।

নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয়তাবাদ খুবই পৃথক ব্যাপার। বেশির ভাগ উপনিবেশে আর আধা-উপনিবেশে গড়ে উঠল বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলন এবং বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপিত হল অপেক্ষাকৃত কম-অগ্রসর পুঁজিতন্ত্রের অবস্থায়, সেটা মোটেই পশ্চিম ইউরোপের কিংবা উত্তর আমেরিকার মতো নয়, এই দুই জায়গায় বেশ অগ্রসর বুর্জোয়াদের সঙ্গেই ঐসব প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট ছিল। উপনিবেশ এবং অধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ পশ্চিম ইউরোপ কিংবা উত্তর আমেরিকার মতো অনিবার্যভাবেই মূলত বুর্জোয়া নয়। উপনিবেশ এবং অধীন দেশগুলিতে সম্প্রসারমান জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন জাতীয়তাবাদের বিস্তৃত এবং গভীর মতাদর্শগত আন্দোলনে পরিণত হতে সহায়ক হয়েছিল; এই মতাদর্শগত আন্দোলনের মূল ছিল পেটি বুর্জোয়া প্রধান কাঠামের মধ্যে। যেমন, মনে করা যেতে পারে, ভারতে (প্রকৃতপক্ষে, এশিয়ার আরও অনেক দেশেও) রাজনীতিক স্বাধীনতা আনল যে মুক্তি-সংগ্রাম সেই সংগ্রামের সময়ে জাতীয়তাবাদের মূলনীতিগুলিতে জনগণের সমর্থন ছিল—কেননা, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিল। আরব দেশগুলিতে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে প্রধান হয়ে উঠেছিল আরব জাতীয়তাবাদ এবং আরব ঐক্যের ভাব-ধারণা। আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের একটা গুরুত্বসম্পন্ন চালিকাশক্তি হল নিখিল-আফ্রিকাবাদ, — আফ্রিকার জাতিগুলিকে ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করাই এই মতাদর্শের উদ্দেশ্য।

পুঁজিতন্ত্র থেকে তার উচ্চতর সাম্রাজ্যবাদী পর্বে ক্রমবিকাশের কালপর্যায়েই ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয় আন্দোলনের একটা নতুন জোয়ার এসেছিল। পুঁজি রপ্তানি সম্প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং এই দেশগুলি ক্রমেই বেশি বেশি করে বিশ্ব বাজারের মধ্যে গিয়ে পড়তে থাকলে এই দেশগুলিতে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকল, তার ফলে আবার জাতীয় চেতনা এবং জাতীয়তাবাদী মতাদর্শসম্পন্ন বৈপ্লবিক-মুক্তি আন্দোলনের প্রসার প্রবলভাবে ত্বরান্বিত হল।

নিপীড়িত এবং অধীন জাতিগুলির গোড়ার দিককার বৈপ্লবিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা ছিল জাতীয়তাবাদ, — সর্বত্র মেহনতী জনগণের মনে তার একটা গভীর ছাপ না পড়ে পারে নি, এই কারণেই

তখন থেকে বরাবর সামাজিক-রাজনীতিক সংগ্রামের প্রসার আর তীব্রতাবৃদ্ধিতে জাতীয়তাবাদ একটা গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকায় থেকেছে। লেনিন লিখেছেন, 'যেকোন নিপীড়িত জাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদে থেকে একটা সাধারণ গণতান্ত্রিক মর্মবস্তু, সেটা পরিচালিত হয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে, আর আমরা বিনাশর্তে সমর্থন করি এই মর্মবস্তুটাকেই।'*

জাতি যেখানে এখনও সবে রূপধারণ করছে এমন অবস্থায় বহু উন্নয়নশীল দেশে ঐ প্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করার জন্যে অনেকটা অনুঘটকের কাজ করে জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের ভাব-ধারণাগুলি সমষ্টিগত মনোভাব জোরদার করে, ঐতিহাসিক অতীতের প্রতি আগ্রহ বাড়ায়, জাতীয় গর্ববোধ জাগায়, জাতীয় সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের বিকাশে প্রেরণা যোগায়, জাতীয় ভাষাগুলির বিকাশে সহায়ক হয়। শুধু তাই নয়: আরও বেশি জাতীয় চেতনার অর্থ হল আরও বেশি শ্রেণী-চেতনা; জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে প্রলেতারিয়েত এবং তার মিত্রদের অংশগ্রহণের ফলে তারা পরবর্তী কালের শ্রেণীগত লড়াইয়ের জন্যে চমৎকার শিক্ষা পায়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং গোষ্ঠীগত আর সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে গড়ে ওঠে বিভিন্ন জাতি, স্থাপিত হয় বিভিন্ন স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হলে কেবল সেটাই জাতীয় সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান নয়। সংখ্যালঘু জাতি, জাতীয়-গোষ্ঠীগত অনৈক্য, একই অভিন্ন জাতীয় ভাষা, ইত্যাদি সমস্যা অত্যন্ত জটিল, এগুলির সমাধানের জন্যে হয়ত দীর্ঘকাল লাগবে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামের ভিতর জাতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এযাবত ব্যর্থ হয়েছে। ভারতে বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক রাজ্য গড়ার প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা রয়েছে; জাতিগত পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন গুরুতর সংঘাত এবং সীমান্ত সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা রয়েছে — এইসব থেকে অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, যা সমগ্রভাবে জনগণের স্বার্থের অনুযায়ী হবে জাতীয়-ঔপনিবেশিক সমস্যার এমন পূর্ণাঙ্গ সমাধানে পৌঁছবার কোন সম্ভাবনা পুঁজিতন্ত্র দিতে পারে না। তবে, একটা জিনিস অনস্বীকার্য: জাতীয় সমস্যার সমাধান করতে হলে সর্বোপরি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়া অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কাজেই, ঔপনিবেশিক

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 20, p. 412.

জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং পৃথক হয়ে যাবার অধিকারের দাবি বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অনুযায়ী সেটা প্রগতিশীল বলেই গণ্য।

এখনকার দিনে এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ বলতে স্পষ্ট বুঝতে হবে ঔপনিবেশিক জাতিগুলির স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়ার অধিকার. - জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির একটা মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করে সর্বপ্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়নই এই উপলব্ধি এনে দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে, বহুজাতিক রাষ্ট্রের বুর্জোয়া নীতিটাকে রাশিয়া মানত — তাতে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কিংবা পৃথক হয়ে যাবার অধিকার স্বীকৃত নয়। তার উপর, ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন দেশগুলির ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োজ্য ছিল না -- যদিও, জাতীয় সমস্যায় অনেক আগেই বিভিন্ন বিস্তৃততর দিক দেখা দিয়েছিল, উপনিবেশসংক্রান্ত সাধারণ সমস্যার সঙ্গে সেটা মিলেমিশে গিয়েছিল, সেটা তখন আর আভ্যন্তরিক বিষয় না হয়ে আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিভিন্ন জাতীয়-মুক্তি বিপ্লব প্রবলতর হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে (তখন সামাজিক কাঠাম বদলানো একটা সর্বাগ্রগণ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়) জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে দুটো ধারা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তখন প্রগতিশীল জাতীয়-গণতান্ত্রিক মহলগুলিই কেবল নয়, স্থানীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীরাও জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করতে থাকে। এটা সম্ভব -- তার কারণ, জাতীয়তাবাদ সহজাতভাবেই দ্বন্দ্বমূলকভাবে স্ববিরোধী, তাতে গতিশীল আর প্রগতিশীল এবং বিভিন্ন রক্ষণপন্থী আর অবাঞ্ছিত উপাদান থাকে একত্রে।

জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারা হল জাতীয়-গণতান্ত্রিক মহলগুলি: তারা মনে করে, জাতীয় রাষ্ট্রসত্তার প্রতিষ্ঠা হল কোন জাতির সামাজিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির একটা আবশ্যিক পূর্বশর্ত। প্রকৃত জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্যে সংগ্রামের প্রক্রিয়ায়, দেশে এবং বিদেশে সমস্ত বৈপ্লবিক এবং প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগে বিভিন্ন মূলগত সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনটাকে এই ধারার অনুগামীরা স্পষ্ট দেখতে পায়। ঔপনিবেশিক সম্পর্কগুলি ভেঙে যেতে থাকে, মুক্ত দেশগুলি সামাজিক প্রগতির পথে উঠে দাঁড়াতে থাকে, বিভিন্ন মূলগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে সামাজিক-আর্থনীতিক ধরনধারনে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে

জাতীয়তাবাদের বাস্তব ভিত্তির বিলুপ্তি ঘটতে থাকে ধাপে ধাপে। বিভিন্ন জাতীয় দাবিদাওয়ার ভিতরে জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের সামাজিক এবং শ্রেণীগত লক্ষ্যগুলি দৃষ্টিগোচর না হতে পারে, তথাকথিত বিভিন্ন 'জাতীয় সমাজতন্ত্রের' নামে পথ বেছে নেবার সংগ্রাম পরিচালিত হতে পারে — এই সবকিছু সত্ত্বেও, নিপীড়িত জাতির জাতীয়তাবাদের মধ্যে নিহিত সাধারণ গণতান্ত্রিক ধারাগুলি বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের অনুকূলে জাতীয়-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির গতিটাকে ব্যাহত করে না, কোন কোন অবস্থায় সেদিকে এগোবার একটা অন্তর্বর্তী ধাপ হিসেবেও কাজ করতে পারে।

বিষয়টা হল এই যে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য এবং দেশীয় বুর্জোয়াদের ক্ষীণতার অবস্থায় কোন মুক্ত কিংবা উঠতি দেশে নিপীড়িত, দৈন্যদশাগ্রস্ত এবং নিরক্ষর জনসমষ্টির **জাতীয়** চেতনা হল **শ্রেণীগত** চেতনার প্রাথমিক স্বতঃস্ফূর্ত রূপ, ঐ জাতীয় চেতনা প্রবলতর হয়ে ঐ শ্রেণীগত চেতনাকে উন্নততর করে তোলে অনগ্রসর দেশগুলিতে, যেখানে জাতীয় বুর্জোয়াদের অবস্থান এবং রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের উপর তাদের প্রভাব ক্ষীণ — যেমন, গ্রীষ্মমন্ডলীয় আফ্রিকার কোন কোন দেশে জাতীয়তাবাদ বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক, বুর্জোয়া নয় -- জনগণের জন্যে জাতীয় আর সামাজিক মুক্তি দুইই অর্জন করা তার লক্ষ্য।

তবে, যা আগেই বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক ছাড়াও একটা প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রবণতাও থাকে জাতীয়তাবাদের মধ্যে। প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রবণতার প্রতিনিধিরা জাতীয়তাবাদ থেকে সাধারণ গণতান্ত্রিক মর্মবস্তুটাকে বের করে দিতে চায় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামে যেকোন মূলগত পরিবর্তনের বিরুদ্ধাচারী বিভিন্ন শ্রেণী এবং রাজনীতিক জোটের স্বার্থে সেটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা অর্জন করাটাকেই এইসব শক্তি চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বলে মনে করে। বিভিন্ন স্বরাষ্ট্রীয় সমস্যা থেকে জনসাধারণের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্যে তারা জাতীয়তাবাদের প্রচার চালায়, বিভিন্ন জাতি আর জাতিসত্তার মধ্যে ভেদাবিভেদের বীজ বোনে, বিচ্ছিন্নতাবাদের হিড়িক তোলে। জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের আর কোন বিকাশ রোধ করার চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদীরা এই শক্তিগুলিরই উপর নির্ভর করে।

নতুন সমাজ গড়ার সঙ্গে অপরিহার্যভাবেই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা আর মুশকিল এড়াবার চেষ্টা এবং বিভিন্ন জরুরী সামাজিক-আর্থনীতিক

লক্ষ্য থেকে জনগণকে দূরে সরিয়ে নেবার চেষ্টার মধ্যে জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি ঘটে।

বিভিন্ন বিষয়গত অবস্থা, সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের মাত্রা এবং বুর্জোয়া আর শ্রমিক শ্রেণী গড়ে ওঠার ধারা-ধরনের দিক থেকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পার্থক্য থাকে — তাই, বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তিও হয় পৃথক পৃথক। যেমন, ইন্দোনেশিয়ায় গত কয়েক বছরে 'ধনী দেশগুলির কর্তৃত্বের' বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ হিসেবে জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির অঙ্গ করা হয়েছিল। বিষয়গতভাবে এটা ছিল দেশটিকে আমলাতান্ত্রিক পুঁজির খাস তালুকে পরিণত করার ইচ্ছারই প্রতিফলন (ঐ পুঁজি এখন মজবুত হয়ে গদীয়ান হয়েছে), — ঐ 'খাস তালুকে' ইন্দোনেশিয়ার 'নিজস্ব' পুঁজিপতিরাই তার 'নিজস্ব' জনগণকে শোষণ করবে। তবে, আমলাতান্ত্রিক পুঁজির ক্ষমতা সংহত হবার অর্থ হল জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের গতি শ্লথ হয়ে যাওয়া এবং দেশটির আর্থনীতিক দুর্বলতাবৃদ্ধি আর বৈদেশিক একচেটিয়া পুঁজির উপর দেশটির নির্ভরশীলতাবৃদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে, ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মর্মবস্তুটা ক্রমাগত বেশি বেশি পরিমাণে বেরিয়ে গিয়েছিল, আর তার জায়গায় আনা হয়েছিল বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুলি, এবং দেশটির নেতারা আশা করেছিলেন, তাই দিয়ে ইন্দোনেশিয়ার ১০ কোটি মানুষের মনোযোগ দেশীয় দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে নেওয়া যাবে। মালয়েশিয়ার সঙ্গে মহা ক্ষয়ক্ষতিকর মোকাবিলা, জাতিসংঘ থেকে ইন্দোনেশিয়ার অপসরণ, ইত্যাদির প্রধান কারণ ছিল ওটাই, — ঐসবকিছু আরও প্রবল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থানের শুধু মরীচিকাই সৃষ্টি করেছিল।

দুঃখের কথা, বৈপ্লবিক এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিও অনেক সময়ে ঐ কর্মনীতির ফাঁদে পড়েছিল — তার ফলে, বাস্তবে, জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবের বিকাশ বিলম্বিত হল, আর মতাদর্শগত ক্ষেত্রে পেটি বুর্জোয়া 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের মধ্যে মিশে গেল মার্কসবাদ।

অনেক মুক্ত দেশের পররাষ্ট্রনীতির উপর ইদানীং ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রবল প্রভাব পড়েছে, -- এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঐসব দেশের অধিকতর স্বাধীনতা এবং পশ্চিমী শক্তিগুলির উপর অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরশীলতা দেখা যাচ্ছে, সর্বতোভাবে পশ্চিমী ধরনধারনে চলার পথ তারা প্রত্যাখ্যান করছে, তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে

বিস্তৃততর যোগাযোগ চাইছে। এদিক দিয়ে জাতীয়তাবাদের ক্রমবৃদ্ধি ইতিবাচক উপাদানই হয়েছে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে, কয়েকটি দেশের শাসক মহল ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদকে সাফল্যসহকারেই ব্যবহার করছে মেহনতী জনগণের মধ্যে শ্রেণীচেতনা ভোঁতা করে দেবার জন্যে — যাতে জাতীয়তাবাদী ঐকতানের মধ্যে কোন বেসুর বেজে না ওঠে। শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-বিরোধ ঢাকা দেবার জন্যে এবং তা নজরের বাইরে ঠেলে দেবার জন্যে শাসক মহলগুলি কখনও কখনও জাতীয় ঐক্যের ধারণাটাকে ব্যবহার করছে।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা এবং তার চলতি ধারাগুলির মূল্যায়নে দুটি জিনিস বিবেচনায় রাখা দরকার। প্রথমত, একটা সামাজিক বনিয়াদ হিসেবে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারেরা এবং প্রকাশ্যে সহযোগী ক্ষুদ্রাংশ বুর্জোয়ারা যথেষ্ট নয়, এটা সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছে, কাজেই, এখন তারা মিত্র খুঁজছে প্রধানত দক্ষিণপন্থী জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে, তাদের সাহায্যে জাতীয়তাবাদকে প্রগতিশীল মর্মবস্তু-বিবর্জিত করার জন্যে এবং তার ভিতরকার প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানগুলোকে বিকশিত করাবার জন্যে তারা চেষ্টা করছে। দ্বিতীয়ত, এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলির বুর্জোয়ারা সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মৈত্রীবদ্ধ। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের ক্রমবৃদ্ধি সাধারণত হাতধরাধরি করে চলে ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে, — বিচ্ছিন্নতাপন্থী, জাতিদাম্ভিক, এমনকি জাতিবৈর মনোভাব চাঙ্গা করে তুলবার জন্যেও ঐ আবেগ অনেক সময়ে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ঔপনিবেশিকতাবিরোধী শক্তি বিভক্ত করে ফেলার জন্যে এবং উঠতি দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট দুর্বল করবার জন্যে জাতীয়তাবাদের এইসব উপাদানে সহায়-সমর্থন দিতে সাম্রাজ্যবাদীরা যে যা সম্ভব সবই করে সেটা দেখা গেছে কঙ্গোয়, ইন্দোনেশিয়ায়, নাইজিরিয়ায় এবং অন্যত্র।

অনেক নতুন রাষ্ট্রে চলতি রাজনীতিক পরিস্থিতি যা তাতে জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে বিশেষ নমনীয় এবং কুশলী আচরণ দরকার; আগেই অর্জিত জাতীয় স্বাধীনতা আরও মজবুত করার কিংবা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয় রাষ্ট্রসত্তা প্রতিষ্ঠা এবং বিকশিত করার প্রশ্নে জাতীয়তাবাদের এখনও 'ঐতিহাসিক যুক্তিযুক্ততা' রয়েছে। জাতীয় বুর্জোয়াদের মতাদর্শগত প্রচার দিয়েই কেবল নয়, — জনগণের মধ্যে প্রবল জাতীয়তাবাদী মনোভাব

সৃষ্টি হয় ঐসব বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থারই ফলে। তবে, জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে নমনীয় এবং কুশলী আচরণ কিছু সহজ কাজ নয়, আর এখন স্বাধীনতা অর্জিত হবার পরে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বগতি রয়েছে, তেমনি ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারাও শ্রেণী হিসেবে নিজেদের কর্তৃত্ব মজবুত করার জন্যে তাদের সুযোগ নিতে বদ্ধপরিকর -- এ অবস্থায় ঐ কাজটা আরও কঠিন হয়ে ওঠে।

জাতীয়তাবাদের ধারা দুটোর মধ্যে শক্তিপরীক্ষায় বিকাশের পথ বেছে নেবার ব্যাপারে বিভিন্ন শক্তির সমবর্তন প্রতিফলিত হয়; এই পথ বেছে নেবার ব্যাপারটাই নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। জাতীয়তাবাদ সর্বোপরি সামাজিক বিষয় -- কাজেই, বিভিন্ন শ্রেণীগত এবং রাজনীতিক শক্তির মধ্যে যথার্থ পারস্পরিক সম্পর্ক, শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা এবং বিকাশের নির্বাচিত পন্থার উপরই ঐ শক্তিপরীক্ষায় জয়-পরাজয় নির্ভর করে। জাতীয় সার্বভৌমত্ব অর্জিত হবার পরে আলোচ্য দেশগুলিতে পরিস্থিতি এতখানি বদলায় নি যাতে কোটি কোটি অপ্রলেতারীয় মানুষের মতাদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদ দ্রুত এবং সম্পূর্ণত উবে যেতে পারে। জাতীয়তাবাদের বিষয়গত বনিয়াদ সাম্রাজ্যবাদ বজায় থাকে এবং নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে নিজ প্রভাবের বশীভূত হতে বাধ্য করাবার কর্মনীতি চালিয়েই যায়।

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের দ্বন্দ্বমূলক প্রকৃতি এমনই যে, কোন জাতি রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের সময়ে যা প্রবল ঐক্যসাধক শক্তি সেই নিপীড়িত জাতির জাতীয়তাবাদ কোন কোন অবস্থায় ঐ জাতির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্য দুর্বল করে ফেলতে পারে। নিপীড়িত জাতির জাতীয়তাবাদকে বিপ্লবী শক্তিগুলি তাদের উদ্দেশ্যে কাজে লাগায় — সেটা ঐতিহাসিক বিচারে যুক্তিযুক্ত হলেও তার পরিণতি তাদের উপর প্রভাব বিস্তার না-করে পারে না।

ইতিহাসে দেখা যায়, বৈপ্লবিক আন্দোলনের কার্যত সমস্ত শক্তিরই কিছু না কিছু পরিমাণে 'জাতীয়তাবাদী আবেগের' অভিজ্ঞতা আছে। যুদ্ধোত্তর কালে এই 'জাতীয়তাবাদী আবেগ' বিশেষভাবে সব সময়েই দেখা গেছে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে — এইসব দেশে বিশেষ ক্ষমতাশালী পেটি বুর্জোয়ারা এবং সংখ্যায় কম, রাজনীতিগতভাবে দুর্বল আর অসংগঠিত প্রলেতারিয়েত বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী বদ্ধধারণা বজায় রাখতে সহায়ক হয়েছে। তবে, অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায়

যে, 'জাতীয়তাবাদী আবেগ' রাষ্ট্রীয় কিংবা ভৌগোলিক কোন বাধা মানে না; যেকোন বৈপ্লবিক শক্তির মধ্যে — আর্থনীতিক আর সামাজিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর দেশগুলিতেও — এই রকমের 'আবেগ' দেখা দেয়। যে 'জাতীয়তাবাদী আবেগ' বুর্জোয়া কিংবা পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মানিয়ে-বনিয়ে চলে কিংবা বুর্জোয়া আইনানুগতাকে একটা বাতিক করে তোলে কিংবা জনগণকে দূরে সরিয়ে দেবার ভয়ে শ্রেণী-সংগ্রাম প্রত্যাখ্যান করে, ইত্যাদি, সেটা শেষপর্যন্ত প্রবলতর জাতীয়তাবাদ উদ্ভূত হতে সাহায্য করে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতাবাদী লক্ষ্যগুলি ভুলে যায় এবং জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে বুর্জোয়া আর পেটি বুর্জোয়া প্রভাব জোরদার করে তোলে, স্থান-কালভেদে তাতে কোন পার্থক্য ঘটে না।

ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে দেখলে, জাতীয়তাবাদ একটা অস্থায়ী ব্যাপার। কিন্তু আমাদের এই আজকের দুনিয়ায় প্রকৃতপক্ষে মুক্তি আন্দোলনের মধ্যেও এমন অনেক শক্তি, জন-স্তর এবং রাজনীতিক রয়েছে যারা বুর্জোয়া এবং পেটি বুর্জোয়াদের, এমনকি কখনও কখনও শ্রমিক শ্রেণীরও কাউকে কাউকে প্রলুব্ধ করার জন্যে জাতীয়তাবাদ জাহির ক'রে এই আন্দোলনের অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটাতে কিংবা আন্দোলনকে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়। নিজস্ব কারণ অনুসারে তারা জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগবিহীন করে ফেলতে এবং জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনকে তার সামাজিক-শ্রেণীগত মর্মবস্তুবিবর্জিত করতে আগ্রহশীল; নিপীড়িত জাতিগুলি মুক্তি অর্জন করার জন্যে যে সংগ্রাম চালাচ্ছে সেটাকে জাতীয়তাবাদের খাতে চালিয়ে দিতে এবং সংগ্রামটা হল ধনী দেশগুলির বিরুদ্ধে দরিদ্র জাতিগুলির সংগ্রাম এই প্রত্যয় জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্যে তারা চেষ্টা করছে।

আমাদের এই আজকের পৃথিবী যে একেবারে বিপরীত বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় বিভক্ত, এই বিভাগের ভিত্তিটা যেন উন্নয়নের বিভিন্ন মাত্রা, জাতি-বর্ণ কিংবা অন্য কিছু, কিন্তু শ্রেণীগত নিরিখ নয়, এমনটা প্রমাণ করার জন্যে উদ্ভাবিত নানা ধারণার মূলে রয়েছে জাতীয়তাবাদই। পল ই. সিগমুণ্ড নামে একজন মার্কিন প্রফেসর লিখেছেন: 'তাদের দিক থেকে পৃথিবীতে মৌলিক বিভাগটা কমিউনিজম আর উদারনীতিক গণতন্ত্র এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিক মত-বিশ্বাসের মধ্যে নয়, বিভাগটা হল পৃথিবীতে ধনী আর

দরিদ্র, অর্থনীতিগতভাবে অগ্রসর আর কম-অগ্রসর এবং টেকনিকে সুযোগ্য আর প্রযুক্তিগত বিচারে 'অনগ্রসর' এলাকাগুলির মধ্যে।'* আর ফ্রিৎস শাত্তেন সবাইকে বিশ্বাস করাতে চান যে, 'আফ্রিকার মানুষের মনে, পৃথিবীটা যে বিভক্ত সেটা 'পুঁজিপতি' আর 'প্রলেতারিয়ান'দের মধ্যে তত নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি 'ধনী শ্বেতাঙ্গ' আর 'দরিদ্র অশ্বেতাঙ্গদের' মধ্যেই, আর তাদের অনেকেরই স্বপ্ন 'শ্রমিক আন্তর্জাতিকের' দিকে নয়, সেটা 'অশ্বেতাঙ্গদের আন্তর্জাতিকে'র দিকে।'**

এই সব এবং এই রকমের অন্যান্য মত নিয়ে যে মতাদর্শগত 'নীতি' তাতে 'বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী', 'শ্রেণী-সংগ্রাম' এবং 'শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-বিরোধের' মতো ধারণাগুলিকে অতীতের জিনিস বলে দেওয়া হয় — কেননা, তাতে বলতে চাওয়া হয় যে, আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ যেন এমন একটা অগ্রসর শিল্পোন্নত সমাজে পরিণত হচ্ছে যা সমস্ত সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ থেকে মুক্ত, আর সেখানে মেহনতী জনগণ যেন অন্যান্য সামাজিক গ্রুপের সমান অংশীদারে পরিণত হচ্ছে, বাড়বাড়ন্ত 'জনগণের পুঁজিতন্ত্রের' সমৃদ্ধিতে তারা সমানই আগ্রহশীল। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি সম্বন্ধে এই তত্ত্বে বলা হয়, ঐসব দেশে শ্রেণীগত সম্পর্ক এমন পরিণত অবস্থায় পেঁছয় নি যাতে এগুলিকে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ বলে গণ্য করা যেতে পারে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়, আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন শ্রেণী এবং শ্রেণী-যুদ্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হলে সেটাকে জাতীয় পরিসরে না দেখে দেখতে হবে আন্তর্জাতিক পরিসরে। এইভাবে দেখা দিয়েছে 'বুর্জোয়া জাতিগুলি' সংক্রান্ত ধারণা — তার অর্থ হল অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, আর 'প্রলেতারিয়ান জাতিগুলি' সংক্রান্ত ধারণা — অর্থাৎ কিনা, এশিয়া আর আফ্রিকার আর্থনীতিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে অনগ্রসর দেশগুলি। 'প্রলেতারিয়ান জাতি' এই কথাটাকে অনেক বুর্জোয়া লেখকই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকেন***, — তাঁরা দেখাতে

---

* *The Ideologies of the Developing Nations*, New York, 1963, p. 11 দ্রষ্টব্য।

** *Polycentrism. The New Factor in International Communism*, ed. by Walter Laqueur and Leopold Labedz, New York, 1962, p. 240 দ্রষ্টব্য।

*** এইভাবে ফরাসী পণ্ডিত-ব্যক্তি পিয়ের মুসা নিজের লেখা বইয়ের নাম দিয়েছেন *Les Etats-Unis et les nations prolétaires* ('মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রলেতারিয়ান জাতিগুলি')। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'আজকের জাতিগুলির মধ্যে সম্পর্ক এক-শ'

চান যে, অনগ্রসর দেশগুলির মেহনতী জনগণের চেয়ে নিজেদের দেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গেই অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শ্রমিক শ্রেণীর মিল বেশি, — ঐসব মেহনতির চোখে ঐ শ্রমিক শ্রেণীও একটা শোষক স্তর।

অনগ্রসর দেশগুলির জনসাধারণের সঙ্গে তুলনায় অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শ্রমিক শ্রেণী এবং ব্যাপক মেহনতী জনগণ শাসক শ্রেণীগুলির চেয়ে কম বুর্জোয়া নয়, এই প্রত্যয় ঐ শ্রমিক শ্রেণী আর মেহনতী জনগণের মনে সৃষ্টি করাই ঐ ধারণার সামাজিক উদ্দেশ্য। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের মতাদর্শওয়ালারা তাদের নিজেদের দেশগুলির জনসমষ্টিকে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার চেষ্টায় এই ধারণাটাকে ব্যবহার করে, ··· তারা দেখাবার চেষ্টা করে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন যেন পরিচালিত নয় একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে, সেটা যেন পরিচালিত হচ্ছে সাধারণভাবে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কিনা, 'বুর্জোয়া জাতি'গুলির বিরুদ্ধে। এই রকমের একজন লেখক লিখেছেন, 'যেহেতু মার্কসের ভাষায় পুঁজিতন্ত্রের কবর-খননকারী হিসেবে যে-প্রলেতারিয়েত তার ভূমিকাটা নিজেদের হাতে নিয়েছে 'প্রলেতারিয়ান জাতিগুলি', কাজেই, অগ্রসর দেশগুলির প্রলেতারিয়েতের আর তেমন ঐতিহাসিক ভূমিকা অবশিষ্ট নেই। নতুন তাত্ত্বিক ছকে তারা সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ক্রিয় কিংবা সক্রিয় সাকরেদ — তারা এত দীর্ঘকাল যাবত দুর্নীতিগ্রস্ত যে, বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে তারা ইতিহাসের নিরিখে অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছে।'*

বছর আগেকার সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের ধাঁচ-ধরনের পুনরাবৃত্তি।' (Pierre Moussa, *Les nations prolétaires*, Paris, 1959, p. 182). সুইডেনের অর্থনীতিবিদ গুনার মুর্দাল লিখেছেন, 'মৌলিক স্তরে দেখলে, আমাদের আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রগুলিতে জাতিগত সংহতির দরুন দ্রুত মিলেমিশে যেতে আরম্ভ করার আগে জাতিগত সমষ্টিতে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে যেসব পার্থক্য ছিল সেগুলির সঙ্গে জাতিতে-জাতিতে পার্থক্যের বিভিন্ন মিল আছে। এই অর্থে, বাদবাকি মানবজাতির বৃহত্তর অংশ নিয়ে হয়েছে নিম্নতর শ্রেণীর জাতিগুলি — আর মাঝামাঝি মধ্য শ্রেণীর অবস্থায় রয়েছে কতকগুলি জাতি। প্রকৃতপক্ষে, এবং তাদের জীবনযাত্রার যথার্থ মাত্রা বিবেচনায় রাখলে, অগ্রসর জাতিগুলির যেকোনটিতে আগে কখনও যা ছিল কিংবা, যা-ই হোক, এখন যা আছে তার চেয়ে বেশি উপযোগী হবে 'প্রলেতারিয়েত' এই কথাটা — এই রকমের আন্তর্জাতিক তুলনার বেলায়।' (Gunnar Myrdal, *An International Economy. Problems and Prospects*, New York, 1956, p. 318 দ্রষ্টব্য)।

* Peter Worsley, *The Third World*. London, 1964, p. 243.

'বুর্জোয়া জাতি' আর 'প্রলেতারিয়ান জাতি' সংক্রান্ত ধারণাটাকে লুফে নিয়েছে সংস্কারবাদীরা, সমস্ত ছোপের সুবিধাবাদীরা — তারা এতে পেয়েছে প্রলেতারীয় বিপ্লবের একটা প্রতিষেধক; এটাকে আরও লুফে নিয়েছে পেটি বুর্জোয়া চরমপন্থীরা — তারা যে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে 'হতাশ' হয়েছে তারই একটা যুক্তি হিসেবে তারা এটাকে ধরেছে। তবে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও কোন কোন মহল এই তত্ত্বটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে — এখানেই রয়েছে প্রধান বিপদটা। জাতীয় বুর্জোয়ারা এবং বিশেষত তাদের দক্ষিণপন্থী অংশ এতে কেন আগ্রহশীল সেটা বোঝা যায় সহজেই: জনগণের উপর মতাদর্শগত প্রভাব বাড়াতে, সমাজে নিজেদের বিশেষসুবিধাভোগী অবস্থা গোপন করতে এবং সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে শ্রেণী-সংগ্রামের বিকাশ নিবারণ করতে তারা চেষ্টা করছে। শ্রমিক শ্রেণীর বেশ একটা অংশ সমেত নিপীড়িত জাতিগুলির জনগণের মধ্যে নিপীড়ক দেশগুলির জনগণ সম্বন্ধে কিছু পরিমাণ অবিশ্বাস যে এখনও রয়ে গেছে, এটাকে ঐ বুর্জোয়ারা চটপট নিজেদের সুবিধার জন্যে ব্যবহার করেছে। এই প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছেন, 'ঔপনিবেশিক এবং দুর্বল জাতিগুলির উপর বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুগ-যুগের নিপীড়ন নিপীড়িত দেশগুলির মেহনতী জনগণকে নিপীড়ক জাতিগুলির প্রতি বিদ্বেষে ভরিয়ে তুলেছে শুধু তাই নয় — সাধারণভাবে এই জাতিগুলির, এমনকি তাদের প্রলেতারিয়েতের মধ্যেও অবিশ্বাসও জাগিয়ে তুলেছে।'*

জাতীয় মর্যাদা এবং জাতীয় গর্ববোধের উপর বেশি জোর দেওয়া হলে সেটা কখনও কখনও জাতীয় বিশেষত্ব, এমনকি জাতীয় স্বয়ংসর্বস্বতার প্রচারে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় শক্তিগুলিকে সমবেত করার সময়ে জাতীয়তাবাদের মতাদর্শবিদেরা বিভিন্ন শ্রেণীগত পার্থক্য, শ্রেণী-স্বার্থ এবং শ্রেণী-সংগ্রামের ভাব-ধারণাটার অস্তিত্বই সাধারণত ঢালাওভাবে অস্বীকার করেন। যে মতাদর্শে জাতীয় ঐক্যের উপর জোর দেওয়া হয় গোষ্ঠীগত অনৈক্য অতিক্রম করতে সেটা এইসব ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির জাতীয় সংহতিসাধনের সহায়ক হয় — কাজেই, সেটা প্রগতিশীল বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু জাতীয় স্বয়ংসর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তি চূড়ান্ত সংগ্রাম না চালালে সমগ্রভাবে

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 31, p. 150.

জাতীয়তাবাদের দরুন বিশ্ব মুক্তি সংগ্রামে ভেদ-বিভেদ ঘটতে পারে এবং সেটা একটা প্রতিক্রিয়াপন্থী আন্দোলন হয়ে উঠতে পারে। যখন প্রমাণ করার চেষ্টা হয় যে, বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে বিরাট পার্থক্যের দরুন আন্তর্জাতিক পরিসরে মেহনতী জনগণের কোন ঐক্যের প্রশ্নই ওঠে না, যখন প্রমাণ করার চেষ্টা হয় যে, উন্নয়নশীল দেশ-গোষ্ঠীর ভিতরকার বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-বিরোধ যতই তীব্র হোক না কেন, তবু সেটা 'আভ্যন্তরিক সমস্যা', কিন্তু সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি এবং অগ্রসর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ নিরসনের অসাধ্য -- সেটা বিশেষভাবে বিপজ্জনক। এই তত্ত্বের উপরই দাঁড় করানো হয়েছে বিভিন্ন বক্তব্য, যাতে বলা হয় ধনী উত্তরের কথা — যে-ধনী উত্তরের অর্থ হল যাবতীয় শিল্পে-অগ্রসর দেশ, যারা দারিদ্র্যক্লিষ্ট দক্ষিণের প্রয়োজনের কথা বুঝবে না কখনও -- এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট দক্ষিণ বলতে বুঝানো হয় তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে। অর্থাৎ কিনা, আমাদের একালের যা প্রধান মর্মবস্তু সেই দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যেকার বৈসাদৃশ্য আর সংঘাত বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় তুলে ধরা হয় কোন কোন নিছক জাতীয় ধারণা, এমনকি কখনও কখনও জাতি-বৈরিতার ধারণাও — এইসব ধারণায় মেহনতী জনগণের আন্তর্জাতিকতার পাল্টা দাঁড় করানো হয় বুর্জোয়া আর পেটি বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদ।

নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয়তাবাদের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধারাকে মার্কসবাদীরা সমর্থন করেন — যদিও, এরই সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা কিংবা আপত্তিকর উপাদানগুলিকে সমালোচনা করতে এবং আন্তর্জাতিকতার মূলনীতিগুলিকে এগিয়ে নিয়ে চলতে তাঁরা কখনও ভোলেন না। মার্কসবাদ এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোন আপস নেই। একটা মার্কসীয় মূলনীতি হল: জাতিসংক্রান্ত প্রশ্নে সামঞ্জস্যপূর্ণ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে দৃঢ়সংকল্প লড়াই চালানো, আর, তারই সঙ্গে সঙ্গে, সামন্ততান্ত্রিক ঝিম-ধরা অবস্থা ঝেড়ে ফেলে দিতে জনগণকে সাহায্য করা, তেমনি, জাতীয় সার্বভৌমত্বের জন্যে এবং যেকোন আর যাবতীয় জাতীয় উৎপীড়নের অবসান ঘটাবার জন্যে সংগ্রামে তাদের সহায়তা দেওয়া। লেনিন লিখেছেন, 'কিন্তু, জাতীয়তাবাদের সমর্থনে প্রলেতারিয়েত যতদূর যেতে পারে এই হল তার সীমা।' কেননা, জাতীয়তাবাদকে সুরক্ষিত করতে সচেষ্ট বুর্জোয়াদের 'ইতিবাচক' ক্রিয়াকলাপের আরম্ভ তার ওধারে... 'তবে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের

সাহায্যে এইসব কঠোরভাবে গন্ডিবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সীমা পার হবার অর্থ হল প্রলেতারিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বুর্জোয়াদের পক্ষে যোগ দেওয়া।'*

৩। কমিউনিজমবিরোধিতা — সামাজিক প্রগতির একটা শত্রু

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির বিকাশটাকে তার স্বাভাবিক ধারায় চলতে দেওয়া হলে ঐ অঞ্চল থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রভাব দৃষ্টিগোচর ভবিষ্যতেই একেবারে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এ সম্বন্ধে বুর্জোয়া মতাদর্শবিদ এবং রাজনীতিকেরা সম্যক অবহিত আছে। নিছক সামরিক কিংবা আর্থনীতিক প্রণালী সম্বন্ধে নয়া-উপনিবেশবাদের তত্ত্ববাগীশেরা নিশ্চিত নয় — তাই, সদ্য-সাধীন দেশে দেশে জাতিগুলির উপর মতাদর্শগত চাপ দেবার জন্যে তারা বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে জোর তাগিদ দিচ্ছে। তাদের চোখে এই অঞ্চলে মতাদর্শগত অনুপ্রবেশের পথে প্রধান বাধা খাড়া করে কমিউনিস্টরা, — জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলির জয়যুক্ত পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্যে সবচেয়ে একনিষ্ঠ সংগ্রাম চালাচ্ছে তারাই। কমিউনিজমকে অপদস্থ করার জন্যে এবং তৃতীয় দুনিয়ার অনন্যসাধারণ অবস্থায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল উপস্থাপনাগুলিকে অনুপযুক্ত প্রমাণ করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে যথা-শক্তি করা হয়; জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয়, বর্ণগত এবং অন্যান্য বদ্ধ-ধারণার অবশেষ, আর, তেমনি, যেসব দেশ স্বাধীন বিকাশের পথ ধরেছে তাদের বিভিন্ন মুশকিল, প্রধানত আর্থনীতিক মুশকিল থেকে তারা ঐ অপচেষ্টায় সহায়-সমর্থন সংগ্রহ করে।

এশিয়া আর আফ্রিকার প্রধান প্রধান দেশে কমিউনিস্ট এবং শাসক জাতীয়-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে বিশেষ বিস্তৃত জল্পনাকল্পনা চলে। সাম্রাজ্যবাদীরা জাতীয়তাবাদীদের মনে এই প্রত্যয় আনতে চায় যে, তাদের সঙ্গে কোন আন্তরিক সহযোগিতা করতে কমিউনিস্টরা অপারগ, আর বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাবার জন্যেই কমিউনিস্টরা কাজ চালাচ্ছে। মতাদর্শগত ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ আর কমিউনিজমের পরস্পর-

---

* V. I. Lenin. *Collected Works.* Vol. 20, pp. 34-35.

বিরুদ্ধবাদিতা দেখাবার চেয়ে ঐ কর্মকৌশলটা কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর হতে পারে — কেননা, আলোচ্য দেশগুলির নেতারা মার্কসবাদবিরোধী নন, সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা দেখে ভড়কে যাবার প্রবণতা তাঁদের নেই। জাতীয়-গণতান্ত্রিক সরকারগুলির জায়গায় বিশুদ্ধ কমিউনিস্ট সরকার আনতেই কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বদ্ধপরিকর, এই প্রত্যয় ঐ নেতাদের মনে সৃষ্টি করে তাঁদের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোটাই অপেক্ষাকৃত সহজ। কমিউনিস্টদের 'নাশকতামূলক উপাদান' হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী অনুচরেরা চেষ্টা করছে ঐ কারণেই। কমিউনিস্টবিরোধীরা তাদের প্রচার অভিযানে ঐ কর্মধারাই নেয়।

এরই সঙ্গে সঙ্গে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারণাগুলির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শওয়ালারা 'জাতীয়' সমাজতন্ত্রের এমন সব ভাষ্য ছড়াবার চেষ্টায় আছে যাতে পুঁজিতান্ত্রিক পন্থাটাকে শুধু প্রচ্ছন্ন রাখার জন্যে কিংবা সেটার যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করার জন্যে সমাজতান্ত্রিক বুলি ব্যবহার করা হয়। ঐসব ভাষ্যের প্রচার ছাড়াও, সাম্রাজ্যবাদী দালালেরা বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বকে বিকৃত করার চেষ্টা করে — তারা এই তত্ত্বকে 'ইউরোপীয় ছক' নাম দিয়ে বলে, এশিয়া আর আফ্রিকার জাতিগুলির বিভিন্ন স্থানীয় অবস্থা কিংবা বিকাশের বিশেষ বিশেষ উপাদানগুলি নির্বিশেষে সেটাকে কমিউনিস্টরা নাকি তাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। আলোচ্য দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের চেয়ে জাতীয়তাবাদই প্রধান হয়ে উঠবে, এতে বুর্জোয়া তত্ত্ববিদেরা যেন নিশ্চিতই।

দুঃখের কথা, এইসব নতুন রাষ্ট্রে এমনসব লোকও রয়েছে যারা বুর্জোয়া প্রচারে বিপথচালিত হয়, কমিউনিস্টবিরোধী বদ্ধধারণার শিকার হয় এবং, ফলে, কমিউনিস্টদের উপেক্ষা করার এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে — তার দরুন, বাস্তবে, বৈদেশিক এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সম্মিলিত ফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তিগুলির অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৩তম কংগ্রেসে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছিল, 'যেখানে সমস্ত দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য অধিকতর সেখানে সামাজিক প্রগতি এবং জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হয়। কমিউনিস্টরা হলেন জন-স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থ যোদ্ধা -- তাঁরা এই সংগ্রামে সক্রিয়। একথা যেখানে ভুলে যাওয়া

হয় এবং কমিউনিস্টরা যেখানে এমনকি নির্যাতিতও হন সেখানে জাতীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তি জোরদার করার লক্ষ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা প্রশ্নাতীত।'*

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে একচেটিয়া বুর্জোয়াদের মতাদর্শওয়ালারা আর কমিউনিজমবিরোধিতার ওকালতিকরনেওয়ালারা কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করার কর্মনীতির তত্ত্বগত যৌক্তিকতা দেখাবার জন্যে 'যুক্তি'-মালা নির্ধারণ করার কাজে লেগেছে। ঐসব 'যুক্তির' কোন-কোনটা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

প্রথম 'যুক্তি'। বলা হয়, অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলিতে অবস্থা কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন অস্তিত্বের অনুকূল নয়। এই তত্ত্বের সমর্থনে সাধারণত বলা হয়, এইসব দেশে প্রলেতারিয়েত সংখ্যায় ক্ষীণ। যেখানে জনসংখ্যার একটা প্রধান অংশ হল কৃষক সেখানে, কমিউনিস্টবিরোধীদের মতে, কমিউনিস্ট পার্টি দেখা দেওয়াটা অযৌক্তিক --- সেটা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শক্তিগুলির হস্তক্ষেপেরই প্রমাণ।

এ কথা সত্যি এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া যথেষ্ট দ্রুত এগোচ্ছে না এবং তার পরিণতি হিসেবে এইসব দেশের প্রলেতারিয়েত কোন কোন দিক দিয়ে অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির প্রলেতারিয়েত থেকে পৃথক। এই প্রলেতারিয়েত সংখ্যাল্প, এর শিল্পে-নিযুক্ত অংশ আপেক্ষিক বিচারে গুরুত্বহীন। এই প্রলেতারিয়েত ঘনিষ্ঠভাবে খামারের সঙ্গে বাঁধা, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, তাদের সংগঠন দুর্বল, ইত্যাদি। এইসব এবং তার সঙ্গে গণ-পরিসরে নিরক্ষরতা এবং প্রবল গোষ্ঠীগত, জাতি-বর্ণগত আর ধর্মীয় বদ্ধধারণাগুলো মিলে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণী-চেতনার বৃদ্ধি এবং তাদের মধ্যে ঐক্য মজবুত করার প্রক্রিয়াটাকে ব্যাহত করে।

অন্যদিকে, শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাগত বৃদ্ধি এগিয়ে চলেছে সমানে, সংগঠন উন্নততর হচ্ছে, নতুন নতুন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি দেখা দিচ্ছে, শ্রমিক আন্দোলন সম্প্রসারিত হচ্ছে — এইসবের সূচক তথ্যগুলিকে উপেক্ষা করাও ভুল। শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থানগুলো প্রতি বছরই ক্রমাগত আরও

---

* 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৩তম কংগ্রেস', কার্যবিবরণী, ১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৬, পৃঃ ৩৫-৩৬।

বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে: এই হল জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের চলতি পর্বের একটা বিশেষত্ব। কিন্তু বুর্জোয়া মতাদর্শওয়ালারা দেখাবার চেষ্টা করে, শ্রমিক শ্রেণী আর তার পার্টি যেন জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে স্বাধীন এবং সক্রিয় ভূমিকায় আসতে অপারগ, আর এই যুক্তি দাঁড় করাবার জন্যে তারা শ্রমিক শ্রেণীর অপরিণত অবস্থা এবং অভিজ্ঞতার অভাবের কথা উল্লেখ করে।

দ্বিতীয় 'যুক্তি'। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে, স্বরাষ্ট্রীয় অবস্থা খারাপের দিকে গেলে, তার কারণ যা-ই হোক না কেন, তার দোষটা কমিউনিস্টদের ঘাড়ে চাপাবার জন্যে শাসক মহলগুলি সদা-প্রস্তুত — তারা বলে, কমিউনিস্টরা নিছক দর্শক, তারা সব সময়ে সমালোচক কিন্তু কখনও কোন গঠনমূলক বক্তব্য হাজির করে না।

প্রকৃতপক্ষে, কমিউনিস্টদের যদি কোন 'অপরাধ' থেকে থাকে সেটা হল এই যে, জাতির সামাজিক প্রগতির জন্যে সবচেয়ে অটল যোদ্ধা তারাই। সামাজিক প্রগতির প্রধান লক্ষ্যটাকে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের উপরে স্থান দিয়ে কমিউনিস্টরা যেকোন এবং যাবতীয় জাতীয় দেশপ্রেমিক শক্তির বিস্তৃত মৈত্রীতে স্বাগত জানায়, সামাজিক প্রগতির জন্যে লড়াইয়ের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, নয়া-উপনিবেশবাদবিরোধী যুক্ত ফ্রণ্টে নিজেদের নেতৃত্বের জন্যে জিদ না ধরেই তারা এটা করে।

যেকোন প্রগতিশীল ব্যবস্থা, সেটা যে-ই তুলুক না কেন, তার উদ্দেশ্য যদি হয় জাতীয় স্বাধীনতা মজবুত করা এবং মেহনতী জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা, সেটাকে সমর্থন করতে কমিউনিস্টরা প্রস্তুত। কোন কোন সদ্য-স্বাধীন দেশে জাতীয়-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এখন যেসব সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কার চালু করছে সেগুলি সম্বন্ধে কমিউনিস্টরা উচ্চ ধারণা পোষণ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিদ্যমান বিশেষ বিশেষ অবস্থার যথোপযুক্ত বিচার-বিবেচনা না করে কোন সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কার হুড়মুড়িয়ে চালু করা উচিত নয়, এ বিষয়ে কমিউনিস্টরা প্রখরভাবে অবহিত; কিন্তু, মেহনতী জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে রচিত বিভিন্ন প্রগতিশীল সংস্কার যারা ইচ্ছা করেই আটকে রাখে, কোন দিকে না যাওয়াই যারা বেশি পছন্দ করে, সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈপ্লবিক শক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করতে যারা অস্বীকার করে এবং যেকোন বাজে অজুহাত লুফে ধরে ঐ বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে নতুন জীবন গড়ার কাজে সক্রিয়

অংশগ্রহণ করতে দেয় না, তাদের সমালোচনা করতে নিজেরা বাধ্য বলেই কমিউনিস্টরা মনে করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের জন্যে ছকের বনিয়াদে যেসব সংস্কার এখন চালু করা হচ্ছে সেগুলি অর্থনীতিক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, — রাষ্ট্রীয় এবং রাজনীতিক সংগঠনের ক্ষেত্রের সঙ্গে সেগুলি আদৌ সংশ্লিষ্ট নয় বললেই হয়। এটা খুবই যুক্তিসম্মত — কেননা, জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলির বর্তমান পর্বে অর্থনীতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থনীতিক স্বাধীনতা ছাড়া কোন রাজনীতিক স্বাধীনতা এবং কোন আভ্যন্তরিক রাজনীতিক সুস্থিতি হতে পারে না। এরই সঙ্গে সঙ্গে, সংশ্লিষ্ট সংস্কারগুলির রাজনীতিক দিকটাকে খাটো করে দেখায় বিপদ আছে। গণতন্ত্র সম্প্রসারিত এবং জোরদার হওয়া চাই — এটা সর্বোপরি গুরুত্বসম্পন্ন।

তৃতীয় দুনিয়ার অনেক জাতীয়-গণতান্ত্রিক শক্তি নতুন সমাজ গড়ার যে কাজে আত্মনিয়োগ করেছে বলে ঘোষণা করে সেটা একটামাত্র সীমিত ক্রিয়াকরণের ব্যাপার নয় -- সেটা একটা দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া, জনগণকে যত বেশি সক্রিয় অংশগ্রহণে টেনে আনা হয়, সেটা ততই বেশি সাফল্যমণ্ডিত হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার কাজে নিযুত নিযুত মানুষের সচেতন সৃজনশীল প্রচেষ্টা দরকার, আর এই নিযুত নিযুত মানুষ এমনভাবে সংগঠিত হওয়া চাই যাতে দেশের সামাজিক, আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক জীবন পরিচালনায় তাদের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। লেনিন লিখেছেন, 'যাতে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র চলিতকর্ম নয় এমন কোন জয়যুক্ত সমাজতন্ত্র হতে পারে না।'* গণতন্ত্রের জন্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামকে কমিউনিস্টরা সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের একটা গুরুত্বসম্পন্ন অঙ্গ-উপাদান হিসেবে দেখে; গণতন্ত্র খর্ব করার এবং মেহনতী জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার যেকোন চেষ্টা হলে কমিউনিস্টরা অমনি চটপট সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই রকমের সমালোচনায় নেতিবাচক কিছুই নেই - - এমন সমালোচনা বরং খুবই গঠনমূলক; কমিউনিস্টরা সমেত সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি যাতে দেশের সমৃদ্ধি এবং সামাজিক প্রগতির কাজে নিজেদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আর প্রচেষ্টা নিয়োগ করার সুযোগ পায় এমন অবস্থা সংশ্লিষ্ট সদ্য-স্বাধীন দেশের মধ্যে সৃষ্টি করাই ঐ সমালোচনার লক্ষ্য।

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 22, p. 144.

কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এবং পেটি বুর্জোয়া পার্টিগুলির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে, কমিউনিস্টরা মূর্ত-নির্দিষ্ট ক্রিয়াকরণের বিভিন্ন সুষ্ঠু কর্মসূচি তুলে ধরে শুধু তাই নয়, সরকারের মধ্যে থাকলে সেখান থেকে এবং অন্যান্য উপায়েও ঐসব কর্মসূচি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে তারা উদ্যমসহকারে লড়াই চালায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ লিখেছেন, 'সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তি যার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এমন একটা কর্মসূচি আমাদের পার্টি তুলে ধরেছে, শুধু তাই নয়, -- বিভিন্ন বিধানসভার ভিতরেও এবং বাইরেও জনগণের আদর্শ নির্ভীকভাবে তুলেও ধরেছে আমাদের পার্টি। ন্যায্য দাবিদাওয়ার জন্যে জনগণের প্রত্যেকটি সংগ্রামে আমাদের পার্টি সব সময়েই থেকেছে পুরোভাগে।'*

তৃতীয় 'যুক্তি'। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কমিউনিস্টবিরোধীরা বলে, তারা কমিউনিজমেরই বিরোধী এমন নয়। তারা বলে, প্রকৃতপক্ষে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি তাদের মনোভাব অনুকূল -- তার উঁচু তাত্ত্বিক মান এবং আমাদের একালের জরুরী বিষয়গুলি সম্বন্ধে তার গভীর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ তাদের মনে ছাপ ফেলে। তারা যে 'জাতীয়' কিংবা 'স্থানীয়' কমিউনিজমের বিরোধিতা করতে বাধ্য হয় তার কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিদ্যমান অবস্থায় বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাব-ধারণা আর মূলনীতির প্রয়োগের ব্যাপারে ঐ 'জাতীয়' বা 'স্থানীয়' কমিউনিজম নাকি ঐসব ভাব-ধারণা আর মূলনীতির বিকৃত চিত্র তুলে ধরে। এটা অনস্বীকার্য যে, আজও এমনসব লোক রয়েছে যারা এখনও কমিউনিজম নিশ্চিহ্ন করার স্বপ্ন দেখে — যেমন, ইন্দোনেশিয়ায় তাদের মতে, কমিউনিস্ট পার্টি বিনষ্ট করতে হবে ইন্দোনেশিয়ার মাটিতেই শুধু নয়, সম্ভব হলে সারা পৃথিবীতেও।

তবে, আরও বেশি ঘন ঘন বলা হয়, দেশের মধ্যে 'স্থানীয়' কমিউনিস্টদের সংগঠনের কোন মান-মর্যাদা নেই, তেমনি, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতামতের প্রবক্তাও তারা নয়। যেমন, ওরা কেউ কেউ বলে, কমিউনিস্ট দুনিয়া, আর মুক্তি এবং বিকাশের পথে যাত্রা করেছে যেসব দেশ, এই

---

* Ajoy Ghosh, "Some Features of the Indian Situation", *World Marxist Review*, Vol. 5, No. 2, February 1962, p. 13.

দুইয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে ধরার চেয়ে নিকৃষ্ট বাছন আর হতে পারে না। এই রকমের লেখকেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলি এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী যখন বন্ধুত্বের সম্পর্কে আসতে আরম্ভ করছিল তখনও ঐসব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ছিল সংশয় আর অনাস্থার উৎস।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে যাদের কোন ধারণা থাকলেও সেটা অতি সামান্য মাত্র তাদেরই উদ্দেশে বলা হয় ঐসব এবং ঐরকমের অন্যান্য যুক্তি। যেসব বিভিন্ন অংশ নিয়ে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন তাদের মধ্যে ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি করার মতলবেই সেটা করা হয়।

কিন্তু তাদের ব্যর্থতা অবধারিত -- কেননা, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, তার বনিয়াদ হল একই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কর্মপন্থা, একই রাজনীতিক আর সাংগঠনিক নীতি, তারা চলে একই চূড়ান্ত লক্ষ্য অনুসারে।

কমিউনিজমবিরোধিতার মতাদর্শওয়ালারা এই রকমের সব 'যুক্তিই' হাজির করে। হরেক রকমের পাপের দায় চাপানো হয় কমিউনিস্টদের উপর। পেটি বুর্জোয়াদের সমর্থন পেয়ে এবং জনগণের মধ্যে বিদ্যমান জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয় এবং অন্যান্য বদ্ধধারণা কাজে লাগিয়ে তারা এখনও জনসাধারণের বিভিন্ন অতি অজ্ঞ অংশের মাথা ঘুলিয়ে দিতে পারে। তবে, ক্রমেই আরও বেশি বেশি লোকে বুঝতে আরম্ভ করছে যে, এখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তিগুলির অতিরিক্ত সক্রিয়তার দরুন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির ঐক্য আরও শক্তিশালী করে তোলার আরও জরুরী প্রয়োজন রয়েছে, এ অবস্থায় কমিউনিজমবিরোধিতার কর্মনীতির ফলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট দুর্বল এবং বিভক্ত হয়ে পড়ার বিপদ রয়েছে।

কমিউনিস্টরা বরাবরই জাতীয় এবং সামাজিক মুক্তির সংগ্রামের পুরোভাগে। এশিয়ায় এবং আফ্রিকার দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি দেখা দিয়েছে: জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলিকে সক্রিয় করতে এবং জনগণের মধ্যে রাজনীতিক চেতনার বৃদ্ধি ঘটাতে সেটা খুবই সহায়ক হয়েছে। ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে কমিউনিস্টরা সরল বিশ্বাসে সহযোগিতা করেছে। তাদের পক্ষে এটা সাময়িক কৌশলের চাতুরি নয়। যেকোন রকমের উৎপীড়নের অটল বিরোধী

কমিউনিস্টরা সব সময়ে সর্বত্র উৎপীড়নকারী জাতির বিরুদ্ধে উৎপীড়িত জাতিকে সমর্থন করেছে। তার অন্যথা হতে পারে না — কেননা, যেকোন রকমের এবং যেকোন রূপের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটানো তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। জনগণের গুরুত্বসম্পন্ন স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে কমিউনিস্টরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করে — প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নয়।

তারা বিভিন্ন প্রগতিশীল ভাব-ধারণার প্রবক্তা এবং প্রচারক; বিভিন্ন প্রগতিশীল জাতীয়-গণতান্ত্রিক শক্তি এখন সেইসব ভাব-ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করছে। জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সময়ে যেসব নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয় সেগুলির মীমাংসার উপায় বের করার জন্যে কমিউনিস্টদের ভরসাস্থল রয়েছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা।

এশিয়া এবং আফ্রিকায় কমিউনিস্টদের সামনে রয়েছে কঠিন কঠিন কাজ। ইউরোপের দেশগুলিতে যার সম্মুখীন হতে হয় নি এমন সব কঠোর এবং অসাধারণ অবস্থায় তাদের প্রয়োগ করতে হয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব এবং কর্মধারা। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক পার্টিগুলির বিশেষ গরজের বিষয় হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে এবং তার যেকোন বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই চালানো, তেমনি, সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো (প্রলেতারীয় মতবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে তার সংগ্রামী বৈপ্লবিক মর্মবস্তুটাকে বহিষ্কৃত করে সংশোধনবাদ একে বুর্জোয়া মতাদর্শের কর্মধারা মেনে চলাতে চায়), আর লড়াই চালানো মতান্ধতার বিরুদ্ধে (মার্কসবাদী চিন্তাধারাটিকে অনেক আগেই বাতিল বিভিন্ন ছকে মেলাতে চায় মতান্ধতা — এর থেকে উদ্ভূত হয় সংকীর্ণতাবাদ এবং 'বামপন্থী' হঠকারিতা)।

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গুরুত্ব খাটো করে দেখা চলে না — তবু, এশিয়া এবং আফ্রিকার অবস্থায় মতান্ধতার বিপদটার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এখানে পরিস্থিতি অত্যন্ত অস্থিত, এখনও বিভিন্ন শ্রেণী-শক্তির সুস্পষ্ট সমবর্তন ঘটে নি; বহু গ্রুপ এবং ব্যক্তি নিজেদের বিশিষ্ট মত-বিশ্বাস এখনও বেছে নেয় নি, তাদের উপর এখনও পথপ্রদর্শক প্রভাব পড়তে পারে, — এইসবের ফলে এখানে কর্মকৌশল আর কর্মনীতি নির্ধারণের ব্যাপারেও, তেমনি মৈত্রীসংক্রান্ত সমস্যার বেলায়ও বিশেষ নমনীয় এবং গঠনমূলক প্রণালীতে এগোন দরকার। তার উপর, এইসব দেশে সুপরিণত, সুশিক্ষিত মার্কসবাদী কর্মীর গুরুতর অভাব আছে;

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, ঔপনিবেশিকতাবিরোধী প্রতিবাদের সঞ্চিত শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠন উদ্দীপ্ত করায় এবং বৈপ্লবিক অধৈর্য-অস্থিরতা জাগিয়ে তোলে — তাই, এখানে মতান্ধতা বৈপ্লবিক আন্দোলনের মহা ক্ষতি করতে পারে, তার দরুন আসে বিভিন্ন ঝুটা-র‍্যাডিক্যাল কর্মকৌশল, ভুয়ো-বিপ্লবীপনা আর 'বামপন্থী' হঠকারিতা। লেনিন বলেছেন, 'মার্কসবাদীদের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে, **বাস্তবতার** যথার্থ তথ্যগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া চাই, গতদিনের কোন তত্ত্ব আঁকড়ে থাকা নয়, অন্যান্য তত্ত্বের মতো ঐ তত্ত্ব বড়জোর যা প্রধান আর সাধারণ তার মোটামুটি নকশা দেয় — যাবতীয় জটিলতা সমেত জীবনকে ঘিরে নেবার **কাছাকাছি আসে** মাত্র।'*

মতাদর্শগত ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ক্রিয়াকলাপ বাড়ানো যে অত্যাবশ্যক, তার আরও একটা কারণ আছে। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এবং অন্যত্র বিভিন্ন জাতীয় নেতা এবং শাসক পার্টি সামাজিক এবং আর্থনীতিক ক্ষেত্রে যেসব প্রগতিশীল ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করছেন সেগুলিকে গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে ঐসব নেতা এবং শাসক পার্টির সঙ্গে মতাদর্শগত সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা থেকে এঁরা বিরত থাকেন -- তার কারণ অবশ্য বোঝা যায়। এমন মনোভাবের দরুন সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে জনগণের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, এইসব গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তি বুঝি ঐসব জাতীয় নেতার মতাদর্শগত ধারণাগুলিও পুরোপুরি মানেন। জনগণ অনেক সময়ে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র এবং মার্কসীয় মতাদর্শকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী নেতার মতামতের সঙ্গে এক করে দেখে -- যদিও ঐসব নেতা মার্কসীয় তত্ত্বগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল নন। এর অর্থ এই নয় যে, প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে জাতীয়-গণতান্ত্রিক নেতাদের সঙ্গে প্রচন্ড তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে হবে, — ঐসব নেতা দেশের সমাজতান্ত্রিক পন্থায় বিকাশের জন্যে আন্তরিকভাবেই কাজ করছেন। কথাটা হল এই যে, সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শওয়ালারা যারা সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যাকার সাজার চেষ্টা করে তারাই হবে সমালোচনার উপযুক্ত পাত্র। কথাটা হল এই যে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের মতাদর্শগত সমস্যাবলি নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিচার-বিবেচনা করার দরকার আছে। জনগণের মধ্যে

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 24, p. 45.

এবং জাতীয়-গণতান্ত্রিক নেতাদের মধ্যেও প্রগতিশীল বিশ্ববীক্ষা গড়ে ওঠার জন্যে বৈপ্লবিক শক্তিগুলি যত বেশি সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করবে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষায় উত্তরণও ততই বেশি সাফল্যমণ্ডিত হবে।

এই প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বসম্পন্ন একটা কথা হল এই যে, মতাদর্শগত ক্ষেত্রে আপসহীন এবং নীতিনিষ্ঠ মনোভাবটাকে, যারা অন্যভাবে চিন্তা করে তাদের এবং সমস্ত অকমিউনিস্ট আর অমার্কসবাদীদের প্রতি মতাদর্শগত অসহিষ্ণুতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলে না। মতাদর্শগত সংঘাতে, বিশেষত ঝানু কমিউনিস্টবিরোধীদের সঙ্গে এই সংঘাতে -- সমগ্রভাবে এবং পৃথক পৃথক প্রশ্নেও -- বহু স্বাভাবিক মিত্রের সহায়তা জোটানোর সামর্থ্যের উপর এই সংগ্রামে সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে; এইসব মিত্র পাওয়া যেতে পারে এইসব মহলে: মাঝারি বুর্জোয়ারা, শহরের বিভিন্ন মধ্যবর্তী স্তর, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবাপন্ন জাতীয় বুর্জোয়া এবং বুদ্ধিজীবীরা যারা এখনও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ আর কমিউনিজমবিরোধিতার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল ভাব-ধারণার প্রভাবে আছে এবং আমাদের একালের বিভিন্ন বিষয়ে যাদের ভুল ধারণা আছে। তাদের সহানুভূতি এবং সমর্থন ছাড়া এই মতাদর্শগত যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। যারা গণতন্ত্রের শক্তিগুলির সঙ্গে মৈত্রীকামী এবং যতই ধীরে হোক আর অনেক সময়ে হাতড়ে হাতড়ে হলেও এগোচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের দিকে তাদের সঙ্গে বৈপ্লবিক শক্তিগুলির পথের মাঝামাঝি কোথাও মিলিত হতে শিখতে হবে — যদিও অবশ্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোন মূলনীতি ছেড়ে দেওয়া চলবে না। একদিকে, এখনও যারা বিভিন্ন বুর্জোয়া বদ্ধধারণার, এমনকি সামন্ততান্ত্রিক বদ্ধধারণার শিকার হয়ে রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সুবিবেচনাপূর্ণ আচরণ, আর অন্যদিকে কমিউনিজমবিরোধিতার মতাদর্শ ওয়ালাদের আপসহীনভাবে স্বরূপ উদঘাটন -- এই হল বনিয়াদী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মনোভাব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়-মুক্তি সংগ্রাম

আমাদের পুরুষের জীবৎকালে নিপীড়িত জাতিগুলির জীবনে এবং ভাগ্যক্ষেত্রে যেসব ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটছে সেগুলি সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে এবং সারা পৃথিবীতে মানবসমাজ বিকাশের সমস্ত দিকের উপর তার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম এবং জাতিগুলির সমানতার জন্যে আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়ে মার্কস সেই ১৮৪৭ সালে লিখেছিলেন, 'বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের বিজয়ের অর্থ হল, তারই সঙ্গে সঙ্গে, এখন যেসব জাতীয় আর শিল্পগত সংঘাত জাতিতে-জাতিতে শত্রুতা ঘটায় সেগুলিরও অবসান। এই কারণেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় বিজয় একই সঙ্গে সমস্ত নিপীড়িত জাতির মুক্তির জন্যে আহবান ধ্বনিত করে।'*

বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতাদের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হল এই: এক জাতির উপর অপর জাতির সামাজিক নিপীড়ন এবং শোষণের বনিয়াদ হল ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থা; উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে শ্রমিক শ্রেণীই অন্য সবার চেয়ে আগ্রহশীল — কাজেই, যেসব জাতি সামাজিক এবং জাতীয় উভয় ক্ষেত্রেই অধিকারবিহীন তাদের স্বাভাবিক মিত্র হল শ্রমিক শ্রেণী।

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সামাজিক এবং জাতিগত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রবল প্রেরণা যোগাল।

---

* মার্কস এবং এঙ্গেল্‌স, রচনাবলি, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭১ (রুশ সংস্করণ)।

ইতিহাসে এই প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের এক নতুন যুগের সূচনা করল। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে বলা হয়েছে: 'বেশির ভাগ জাতির জাতীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তি দমন ক'রে সাম্রাজ্যবাদ তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে পাশব ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খল, কিন্তু **সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় হল নিপীড়িত মানুষের মুক্তির যুগের আবির্ভাব**।'*

পুঁজিপতি আর জমিদারদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত এবং কৃষকের বিজয় ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলি সমেত সর্বত্র বৈপ্লবিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ পৌঁছে যাবার সহায়ক হল। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে প্রগতিশীল নেতাদের মধ্যে মার্কসবাদ সম্বন্ধে প্রগাঢ় আগ্রহ জাগল, — সামাজিক আর জাতীয় সমস্যাবলির জবাব তাঁরা দেখতে পেলেন মার্কসবাদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মার্কসবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন তাঁরাও জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে এর কোন কোন উপাদান ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখতে পেলেন।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লি তা-চাও লিখেছিলেন, 'এই রুশ বিপ্লব ইতিহাসে মোড় ঘুরবার সবচেয়ে তাৎপর্যসম্পন্ন একটা সন্ধিক্ষণ। আগামী কয়েক শতাব্দী যাবত এটা সভ্যতার গতি নির্ধারণ করবে।'** লি তা-চাও মনে করতেন, সোভিয়েত রাষ্ট্র হল 'পৃথিবীর শ্রমিক আর কৃষকদের অগ্রগামী বাহিনী এবং বিরাট দৃঢ় দুর্গ।'***

ভিয়েৎনামের শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সভাপতি হো চি মিন বলেছিলেন, '...ঔপনিবেশিক মুক্তির প্রশ্নে মার্কসীয়-লেনিনীয় মূলনীতিগুলি জয়যুক্ত হয়ে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। অক্টোবর বিপ্লব এই সংগ্রামে (প্রাচ্যের জাতিগুলির সংগ্রামে) প্রবল প্রেরণা যোগাল; আর সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব হল একটা গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক উপাদান, যা ঐ সংগ্রামের দ্রুত বিকাশের সহায়ক হল।'****

---

* *Programme of the Communist Party of the Soviet Union*, Moscow, 1961, p. 35.

** লি তা-চাও, 'বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার সংকলন', মস্কো, ১৯৬৫, পৃঃ ৬১ (রুশ সংস্করণ)।

*** ঐ।

**** Ho Chi Minh, *Selected Works*, Vol. IV, Hanoi, 1962, p. 273.

জওহরলাল নেহর এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'মার্কস এবং লেনিনের রচনার অধ্যয়ন আমার মনে একটা প্রবল ক্রিয়া ঘটাল এবং ইতিহাস আর চলতি বিষয়াবলি নতুন আলোকে দেখতে আমার সহায়ক হল। ইতিহাসের এবং সামাজিক বিকাশের দীর্ঘ ধারাটার কিছু অর্থ, কিছু পরম্পরা আছে বলে মনে হল, আর ভবিষ্যতের কিছু কিছু অস্পষ্টতা কেটে গেল... সোভিয়েত বিপ্লব মানবসমাজকে এগিয়ে দিল বহু দূর, আর জ্বালিয়ে দিল উজ্জ্বল শিখা যাকে নেবানো যায় না, তেমনি, পৃথিবী এগোতে পারে যে-নতুন সভ্যতার দিকে তার বনিয়াদ স্থাপন করল এই সোভিয়েত বিপ্লব।'*

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত হানল: বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা তখন থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আগের মতো একই ভূমিকায় থাকতে কিংবা পৃথিবীর সর্বত্র ঘটনাবলির ধারার উপর আগের মতো বিস্তৃত প্রভাব বিস্তার করতে অপারগ হয়ে পড়ল। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটার ভাঙন দ্রুততর হয়ে উঠল। ইতোমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্র নিপীড়িত জাতিগুলির একটি পরাক্রমশালী রাজনীতিক নির্ভরস্থল হয়ে উঠল। কিন্তু, শুধু তাই নয়: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধের ক্রিয়া থেকে কাটিয়ে ওঠার আগেই এবং আর্থনীতিক বিশৃঙ্খলার কবলে থাকবার অবস্থায়ই সোভিয়েত রাষ্ট্র অবিলম্বেই প্রতিবেশী দেশগুলিতে বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে বৈষয়িক সাহায্য দিয়েছিল।

সোভিয়েতের মতাদর্শগত, রাজনীতিক, আর্থনীতিক এবং সামরিক সাহায্য পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তুরস্ক, চীন, মঙ্গোলিয়া এবং অন্যান্য দেশের মানুষ তাদের জাতীয়-মুক্তি সংগ্রাম প্রবলতর করল এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ের নতুন আশা করতে পারল। চীনের বিপ্লবী-গণতন্ত্রী সুন ইয়াৎ-সেন লিখেছিলেন, 'আমরা রাশিয়ার অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন না করলে কোন বিপ্লবই হতে পারে না... আমরা যদি রাশিয়ার কাছ থেকে শিখতে ইচ্ছুক না হই তাহলে আমাদের পার্টি তার বৈপ্লবিক সংগ্রামে কোন ফল পাবে না।'**

তুরস্কের জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের নেতা কেমাল আতাতুর্ক ১৯২০ সালে সোভিয়েত সরকারের কাছে পাঠানো বাণীর একাংশে

---

* Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India,* London, 1951, p. 14.

** সুন ইয়াৎ-সেন, 'রচনা-সংগ্রহ', মস্কো, ১৯৬৪, পৃঃ ৬০২ (রুশ সংস্করণ)।

বলেছিলেন, 'রাশিয়ার জনগণের প্রতি তুরস্কের জনগণের শ্রদ্ধার বিষয়ে, তারা (রাশিয়ার জনগণ) নিজেদের শিকল ভেঙেই ক্ষান্ত না হয়ে দু'বছরের বেশি হল সারা পৃথিবীর মুক্তির জন্যে সাহসী লড়াই চালিয়ে আসছে, — ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিপীড়ন নিশ্চিহ্ন করার জন্যে সাহসের সঙ্গে অতুলনীয় কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে।'*

যা ছিল মূলত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক এবং অপ্রলেতারীয় এমন জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনকে সোভিয়েত রাষ্ট্র সাধ্যায়ত্ত যাবতীয় সাহায্যই দিয়েছে। এই সাহায্য দেবার ব্যাপারে সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রেরণা এসেছিল এই বিবেচনা থেকে যে, সমাজতন্ত্রের জন্যে প্রলেতারীয় আন্দোলন আর জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন এই দুইয়েরই রয়েছে একটা অভিন্ন লক্ষ্যস্থল — সেটা হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের যুক্তি-সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, মেহনতী জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে জাতীয় মুক্তির জন্যে সংগ্রাম বিকশিত হয়ে চলতে থাকলে শেষপর্যন্ত সেটা সামাজিক মুক্তির জন্যে সংগ্রামে পরিণত হয়। কোন কোন নির্দিষ্ট অবস্থা থাকলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রামের পুঁজিতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হবার যাবতীয় সম্ভাবনাই থাকে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতায় লেনিন বলেছিলেন, 'এটা একেবারেই স্পষ্ট যে, বিশ্ব বিপ্লবে আসন্ন নিষ্পত্তিমূলক লড়াইগুলিতে পৃথিবীর জনসংখ্যার অধিকাংশের আন্দোলন গোড়ায় জাতীয় মুক্তির দিকে পরিচালিত হয়ে পুঁজিতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবে এবং আমরা যা মনে করি তার চেয়ে ঢের বেশি বৈপ্লবিক ভূমিকায়ই হয়ত আসবে।'**

অক্টোবর বিপ্লবের পরের বছরগুলিতে লেনিনের প্রত্যাশা নির্ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। ইউরোপ আর এশিয়ার কতকগুলি দেশে জাতীয় মুক্তির জন্যে জন-সংগ্রাম বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের জন্যে সংগ্রামেই পরিণত হয়েছে, আর সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি যখনই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে এবং সংগ্রামের পুরোভাগে এগিয়ে গেছে তখনই তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে বুর্জোয়ারা তাদের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক

---

* 'সোভিয়েত ইউনিয়ন পররাষ্ট্রনীতি,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭ (রুশ সংস্করণ)।

** V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 32, p. 482.

সংস্কারগুলিকে চূড়ান্তভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে অপারগ: ঐ কাজটা নিষ্পন্ন করতে পারে কেবল শ্রমিক শ্রেণীই।

'রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রত্যক্ষ এবং আশু লক্ষ্যবস্তু ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক,' একথা স্মরণ করিয়ে লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, 'রাশিয়ার জাতিগুলির জন্যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধনগুলিকে সুদৃঢ় করার জন্যে আমরা আরও এগিয়ে যেতে বাধ্য ছিলাম; আরও এগিয়ে আমরা গিয়েছিলামও। চলতে চলতে — আমাদের প্রধান এবং যথার্থ **প্রলেতারীয়**-বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের 'উপজাত পদার্থ' হিসেবে আমরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যাবলির সমাধান করেছিলাম।'*

সমাজতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থের অভিন্নতার আরও প্রমাণ পাওয়া গেল মূলত ফাশিস্তবিরোধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। জার্মান ফাশিবাদ আর জাপানী সমরবাদের যে প্রচণ্ড পরাজয় ঘটল এবং গোটা মানবজাতির শত্রুদের বিরুদ্ধে এই জয়ে যে নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকা পালন করল সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে নিঃসংশয়ে দেখা গেল, যে-শক্তি পৃথিবীর জাতিগুলিকে সামাজিক এবং জাতিগত আধিপত্য থেকে রক্ষা করতে সক্ষম সেটা সমাজতন্ত্রই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফাশিবাদ আর প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিজয় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটার ভাঙন ত্বরান্বিত করল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকতর প্রভাব পড়তে থাকল — সেটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের এলাকা সম্প্রসারিত করতে সহায়ক হল, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে প্রগতিশীল উপাদানগুলির গুরুত্ব স্পষ্ট করে তুলল এবং আন্দোলনে এনে দিল একটা নতুন মর্মবস্তু। সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়-মুক্তি (অর্থাৎ, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক) আন্দোলনের মধ্যে মৈত্রী আরও মজবুত হয়ে উঠল, সেটা অবশ্যম্ভাবীভাবেই ঐ আন্দোলন বিকাশের সহায়ক হল: যুদ্ধোত্তর কালে এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক সাফল্যগুলি হল সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রসার আর শক্তিবৃদ্ধির একটা ফল, তেমনি আবার, নিপীড়িত জাতিগুলির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের পরিসর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সহায়ক হল।

সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন যেন একটা প্রচণ্ড স্রোত, — সামাজিক আর জাতিগত নিপীড়নের পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিটাকে

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 33, pp. 51, 54.

ভেঙে ভাসিয়ে দিচ্ছে এই স্রোত। সাম্রাজ্যবাদের বিনাশে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জাতিগুলিও ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন থেকে মুক্ত কিংবা উঠতি দেশগুলির জাতিগুলিরই মতো আগ্রহশীল। জীবনযাত্রার মান যথাসম্ভব দ্রুত উন্নতর করতে, সাংস্কৃতিক মান উন্নীত করতে এবং সমগ্র সমাজের কল্যাণে জাতীয় সহায়-সম্পদ ব্যবহারের সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত উপায় নিশ্চিত করতে আর উৎপাদনশক্তিগুলির বিকাশের জন্যে এরা সবাই সমানই আগ্রহশীল। এই কারণেই, শান্তি সুরক্ষিত করা এবং হাইড্রোজেনবোমার যুদ্ধ রোধ করার চেষ্টায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং যারা সবে সম্প্রতি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করেছে তার অনেক দেশই একমত।

সদ্য-স্বাধীন জাতিগুলির প্রকৃত বন্ধু এবং নির্ভরযোগ্য মিত্র হল সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলি। সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলি এবং জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যে তাদের পারস্পরিক মঙ্গল হয়। পৃথিবীজোড়া বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার এই দুটো ধারাকে পরস্পরের বিরোধী করবার চেষ্টা, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা, তারা পরস্পরের সঙ্গে বেমানান আর বিরোধী বলে চিত্রিত করার চেষ্টা — এসবের দরুন সাম্রাজ্যবাদী আর প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সুবিধা হয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা আর তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা, এই দুই ধারার মধ্যে কার গুরুত্ব অধিকতর এই মর্মে অযথা তর্ক-বিতর্ক উসকে তুলে জাতীয়তাবাদী প্রবণতার বিভিন্ন নেতা তাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাতে চেষ্টা করছে। অর্থাৎ কিনা, সামাজিক আর জাতীয় প্রগতির জন্যে লড়াইয়ে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির সহযোগিতা আর পারস্পরিক সাহায্যের উপায়-উপকরণ সংক্রান্ত গুরুত্বসম্পন্ন এবং জরুরী সমস্যাটাকে হাতে না নিয়ে, টেবিলের মাথার দিকে কে বসবে তাই নিয়েই তর্কাতর্কি করছেন ঐসব জাতীয়তাবাদী নেতা।

সাম্রাজ্যবাদ আর প্রতিক্রিয়ার শক্ত ঘাঁটিগুলোর উপর প্রগতির শক্তিগুলি যেভাবে প্রচণ্ড আঘাতগুলো করছে সেটা সশস্ত্র শক্তির প্রণালী থেকে পৃথক। বৈপ্লবিক কর্মকৌশল সব সময়ে সামরিক কর্মকৌশলের মতো নয়; সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টে প্রগতিশীল শক্তিগুলির বিন্যাস যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে-চলা ফৌজের বিন্যাস থেকে অনেকটা পৃথক। শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা আর সমাজতন্ত্রের জন্যে লড়াইয়ে একই অভিন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জরুরী কাজে পদ-পদবির

তুলনামূলক গুরুত্ব চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন নয়। মুক্তি, গণতন্ত্র আর সামাজিক প্রগতির পথ ধরে নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির এগিয়ে চলায় সমাজতন্ত্র কোন্ উপায়ে সবচেয়ে ভালভাবে সাহায্য করতে পারে সেটা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করাই ঢের বেশি কাজের।

* * *

জাতীয় আর সামাজিক বিকাশের কোন্ পদ্ধতিটা তাদের পক্ষে সবচেয়ে যুক্তিসম্মত আর কার্যকর হবে সেটা নির্ধারণ করার ব্যাপারে যেসব জাতি এখনও সিদ্ধান্ত নেয় নি, মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্ব আর বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের মূলনীতিগুলি তাদের কী পরিমাণ সাহায্য দিতে পারে সেই বিষয়ে বিচার-বিবেচনা দিয়েই সমস্যাটা নিয়ে বিশ্লেষণ আরম্ভ করা যেতে পারে। আমাদের একালে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বগুলি আর নিছক বিমূর্ত দূরকল্পনার ব্যাপার নেই — সেটা হয়ে উঠেছে একটা জীবন্ত বাস্তবতা; কাল্পনিক, প্রাক্-বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র নিয়ে অধ্যয়নকারীরা যা করতে বাধ্য হত সেইভাবে সিদ্ধান্ত-সূত্র আর ন্যায়ের নীতির ভিত্তিতে সমাজের আদর্শ পুনঃসংগঠনের বিভিন্ন প্রকল্প কিংবা ছক উদ্ভাবনের কোন প্রয়োজন এখন আর নেই।

তাই বলে অবশ্য এমন কথা বলা হচ্ছে না যে, উঠতি দেশগুলিকে এখন শুধু সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের বিদ্যমান তত্ত্ব আর চলিত কর্মগুলির নকল করলেই চলবে, — সবকিছু চালু করে দেবার জন্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দেশে এখন খাটালেই যেন হল। ব্যাপারটা তার উল্টো: যান্ত্রিক নকল আর অনুকরণে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদের মর্ম বিকৃত হয় -- তার দরুন এমন ফল ফলবে যাতে অপ্রতুল তল-কাঠামের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র গড়ার সম্ভাবনা সংক্রান্ত ধারণাটাই অপদস্থ হয়ে যাবে। রাশিয়ার অভিজ্ঞতার অন্ধ অনুকরণ না-করতেই লেনিন ইউরোপ আর এশিয়ার কমিউনিস্টদের বারবার হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজে সঞ্চিত সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার নির্বিচার প্রতিস্থাপনা চলবে না, — সেটার সৃজনশীল আত্তীকরণ চাই, আর সংশ্লিষ্ট সমাজের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আর জাতীয় অবস্থা অনুসারে বাছবিচার করে নিয়ে তার প্রয়োগ করাই দরকার।

সমস্ত জাতিই শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্র গ্রহণ করবে, এটা অবশ্যম্ভাবী —

কিন্তু, তার ফলে এটা বাতিল না হয়ে বরং আগে ভাগেই বোঝা যাচ্ছে যে, সমাজ-জীবনের গণতান্ত্রিক সংগঠন আর আর্থনীতিক পরিচালনব্যবস্থার বহু রূপই আসবে, তেমনি, সামাজিক পুনঃসংগঠনের, কাজেই, আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক বিকাশের হারও হবে বিভিন্ন। লেনিন বলেছেন, 'সংশ্লিষ্ট দেশে প্রাধান্যটা বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের, না, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-সম্পর্কের, তদনুসারে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের রূপ বিভিন্ন হবে বলে ভাবা যেতে পারে।'*

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির সমাজতন্ত্র বেছে নেওয়া বন্ধ করার চেষ্টায় ইদানীং বুর্জোয়া প্রচারে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর আক্রমণ প্রবলতর করা হয়েছে। মার্কসবাদের এই বুর্জোয়া সমালোচনাটা চলে মূল তিনটে ধারায়।

প্রথমত, মার্কস এবং লেনিনের মতামতের মধ্যে, লেনিনের মূল্যায়ন এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশের মধ্যে, আর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন দলিলে এবং সমসাময়িক মার্কসবাদী সাহিত্যে প্রকাশিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আর সূত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ বের করার চেষ্টা হয়। কোন কোন বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশ লোককে বিশ্বাস করাতে চান যে, ঔপনিবেশিক জাতিগুলির অনগ্রসরতাকে মার্কস পুঁজিতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ঔপনিবেশিক কর্মনীতির ফল হিসেবে দেখেন নি, তিনি নাকি উপনিবেশবাদীদের কেবল গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপের উপরই জোর দিয়েছিলেন, যেমন, ভারতে বৃটিশ পুঁজির, অথচ — তারা বলে — মার্কসের বিভিন্ন তত্ত্বের বিপরীতে সমসাময়িক কমিউনিস্ট তত্ত্ববিদেরা বলেন, ঐ অনগ্রসরতার কারণ হল উপনিবেশবাদ।** 'প্রমাণ' হিসেবে এই প্রসঙ্গে দেখাবার চেষ্টা হয়, অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির প্রলেতারিয়েতই মার্কসীয় তত্ত্বের নজরে ছিল বলে, প্রাচ্যের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেগুলি সম্বন্ধে মার্কসীয় তত্ত্ব নাকি সাধারণভাবে অক্ষম ছিল। ঐ মতেরই একজন মার্কিন ইতিহাসবেত্তা চার্লস্ বি. ম্যাক্‌লেন্ বলেন, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে কমিউনিস্ট কর্মনীতির মতাবস্থানের পরিবর্তন

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 32, p. 233.

** অন্যান্যের মধ্যে Kurt E. Müller এবং Henen Ray *Der Kommunismus in Indien*'তে (Hannover, 1966, pp. 14-15.) এই মত তুলে ধরেছেন।

ঘটেছিল কেবল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের পরে, অর্থাৎ কিনা, ১৯২৮ সালের পরে*। কেউ কেউ তো আরও অনেক এগিয়ে বলে, বৈপ্লবিক মার্কসবাদ অনগ্রসর দেশগুলির দিকে নজর দিল কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে — তখন নাকি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, পশ্চিম ইউরোপে মার্কসবাদের কোন আশা-ভরসা নেই।

দ্বিতীয়ত, আজকাল মার্কসবাদের সমালোচকেরা প্রায়ই মেনে নিতে রাজি যে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি এবং মূল লক্ষ্যগুলির মূল্যায়নে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা নির্ভুলই ছিলেন। যেমন, পশ্চিম বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রিচার্ড লিয়েবেনস্থাল মানেন যে, রাশিয়ায় প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার পরে জাতীয়-মুক্তি বিপ্লবগুলি বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লবের সঙ্গে মিলেমিশে যাবে, এটা অবশ্যম্ভাবী, এই মর্মে লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল ছিল, তেমনি — ঐ প্রফেসরই বলেন — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যে ঔপনিবেশিকতা-মুক্তির প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় সেটা অনেক দেশেই বিকশিত হয়ে বৈপ্লবিক আন্দোলনে পরিণত হবে, এটা অবশ্যম্ভাবী, এই মর্মে লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণীও নির্ভুল ছিল। লিয়েবেনস্থাল আরও বলেছেন, লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণীও নির্ভুল ছিল যে, স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের ফলে দেখা দেবে জাতীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বিভিন্ন সমস্যাই কেবল নয়, আরও আসবে আর্থনীতিক বিকাশ আর সামাজিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত সম্পূর্ণ নতুন নতুন সমস্যা, যেগুলির সমাধান বহু ক্ষেত্রেই পশ্চিমী পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের বিভিন্ন রেওয়াজী পদ্ধতিতে সম্ভব হবে না।

এই সবকিছু মেনে নেবার পিছনে কিন্তু একটা মতলব আছে। এইসব স্পষ্ট কথা দিয়ে পাঠকের আস্থা পাবার পরে আসে ঐসব লেখকের আসল চিন্তাধারাটা, সেটা হল এই যে, কোন কোন ঔপনিবেশিক কিংবা আধা-ঔপনিবেশিক দেশ সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের প্রত্যাশা যথার্থ প্রতিপন্ন হলেও সেটা ব্যতিক্রম মাত্র, কেননা — ঐ লেখকের মতে — জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের মূল ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ভুল ছিল। ঐ রকমের যুক্তি-ধারা খুবই স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন টমাস

* Charles B. McLane. *Soviet Strategies in Southeast Asia*. Princeton, 1966, p. 74 *et al.*

পি. থর্নটন নামে মার্কিন প্রফেসর, তিনি লিখেছেন, 'সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের কথা কমিউনিস্টরা অনেক আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কিন্তু সেটা যখন ঘটল তখন পরিবর্তনটার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে তাঁদের দেরি হল। মার্কসীয় তত্ত্বের মধ্যে কিছুই এমন হঠাৎ আর মূলগত রূপান্তরের জন্যে তাদের প্রস্তুত করে নি।'*

তৃতীয়ত, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির কাছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আকর্ষণীয় হতে পারে, এটা স্বীকার ক'রে বুর্জোয়া লেখকেরা বলেন, পশ্চিমের অগ্রসর দেশগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধে এবং স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের সঙ্গে যতখানি সংশ্লিষ্ট কেবল সেই পরিমাণেই সেটা আকর্ষণীয় হতে পারে। তবে, তাদের নিজস্ব স্বরাষ্ট্রীয় সমস্যাবলির সঙ্গে মোকাবিলা করার বেলায় নাকি এইসব দেশ মার্কসবাদের সঙ্গে আর কোন সংস্রব রাখতে চায় না। কমিউনিস্টবিরোধী মনোবৃত্তির জন্যে সুপরিচিত রবার্ট এ. স্ক্যালাপিনো তাতেও থামেন না। তাঁর মতে, এশিয়ার দেশগুলিতে কমিউনিস্টরাও মার্কসবাদ প্রত্যাখ্যান করেন — এই কমিউনিস্টরা নাকি মনে করেন, সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে বিদ্যমান অনন্যসাধারণ অবস্থার সঙ্গে মার্কসবাদ খাপ খায় না। 'সামাজিক আধুনিকীকরণের সন্ধানে,' স্ক্যালাপিনো লিখেছেন, 'কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে এশিয়ার মার্কসবাদী নিজের মত-বিশ্বাসটাকে মার্কসের ধরনে দেখেন নি কিংবা সেই ধরনে তার ব্যাখ্যা দেন নি... এশিয়ায় মার্কসবাদের যেমনটা ঘটেছে এমন বিস্তৃত সংশোধন মানব-ইতিহাসে খুব কম মতবাদের ক্ষেত্রেই ঘটেছে।'**

এইসব মতের মধ্যে এবং এগুলির প্রবক্তা বুর্জোয়া লেখকদের মধ্যে কোন কোন দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলেও, মার্কসবাদকে ভুল প্রতিপন্ন করাই এগুলির একমাত্র সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, এইসব মতে মার্কসবাদকে 'বাতিল' বলে দেখাবার চেষ্টা হয়, এগুলিতে এমন চিত্র তুলে ধরা হয় যে, মার্কসবাদ যেন সাবেকী, তা যেন উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ঘিরে-ধরা নানা নতুন সমস্যার বিশ্লেষণ করতে অপারগ।

---

* *Communism and Revolution. The Strategic Uses of Political Violence*, ed. by Cyril E. Black and Thomas P. Thornton, Princeton, New Jersey, 1964, p. 245.

** *The Communist Revolution in Asia. Tactics, Goals and Achievements*, ed. by Robert A. Scalapino, Englewood Cliffs, New Jersey, 1965, p. 2.

জাতি সমস্যা আর ঔপনিবেশিক সমস্যার বিষয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মতাবস্থান আর ক্রিয়াকলাপকে অপদস্থ করার জন্যে এবং জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্য খাটো করে দেখাবার জন্যে পশ্চিমী 'তত্ত্ববিদেরা' কঠোর পরিশ্রম করছেন।

বলা বাহুল্য, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের একেবারে সমস্ত মূল্যায়ন আর সিদ্ধান্তই কার্যক্ষেত্রে ষোল-আনা নির্ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে তা নয়। জাতি সমস্যা আর ঔপনিবেশিক সমস্যা সম্বন্ধে তার কোন কোন উপস্থাপনা এবং সূত্রাদিতে সংকীর্ণতাবাদের ছোপ ছিল। কিন্তু, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তুলে ধরা বহু মার্কসীয় ধারণা ফলপ্রসূই হয়েছিল, সেগুলি সেই প্রথমে যেমন ছিল এখনও তেমনিই অর্থপূর্ণ রয়েছে, এটা অগ্রাহ্য করা ভুল।

বাস্তবতা সম্বন্ধে অগঠনমূলক মনোভাব থেকে উদ্ভূত ভ্রান্ত উপস্থাপনাগুলোকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা প্রত্যাখ্যান করেন। অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রতিপন্ন করা কোন কোন তত্ত্বগত সিদ্ধান্তকে জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের দেশগুলিতে এইসব দেশের জাতীয় আর সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির যথোপযুক্ত বিবেচনা ছাড়াই নির্বিচার প্রয়োগকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা প্রত্যাখ্যান করেন। মার্কসীয় চিন্তাধারার শক্তি এখানেই — এটাকেই তার দুর্বলতা বলে চালাতে চায় বুর্জোয়া মতাদর্শওয়ালারা। জীবন্ত বাস্তবতাকে জোর করে ধরা-বাঁধা ছকে ফেলার চিন্তাটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে অচল — এই কারণেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এমন ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে, পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনীতিক তত্ত্ব হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় দুনিয়ার জটিল জটিল প্রক্রিয়া আর ব্যাপারগুলো সমেত চলতি ঘটনাবলির যাবতীয় সমস্যারই সঠিক মীমাংসা বের করে আসছে মার্কসবাদ— তার কারণ মার্কসবাদ কখনও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে নি, নিরবচ্ছিন্নভাবে বিকশিত হয়েছে, নিজ তত্ত্বমালায় নতুন নতুন উপস্থাপনা আর সিদ্ধান্ত সংযোজিত করেছে। কোন না কোন কারণে কোন নির্দিষ্ট পর্বে প্রধান হয়ে উঠতে না পারলেও যেসব ধারণায় বাস্তবতার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে সেইগুলিই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ইতিহাস সম্বন্ধে বুর্জোয়া লেখকদের 'বিচার-

বিশ্লেষণে পরম আগ্রহভরে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে লেনিনের মতাবস্থান থেকে ক্রমেই বেশি বেশি পরিমাণে সংকীর্ণতাবাদ আর মতান্ধতার দিকে সরে গেছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ক্রিয়াকলাপ। একজন ভারতীয় কমিউনিস্ট এম. এন. রায়ের উপস্থাপিত সুপরিচিত বক্তব্য এবং অন্য কোন কোন ভ্রান্ত উপস্থাপনার কথা সাধারণত উল্লেখ ক'রে ঐসব লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের বিষয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন কর্মকৌশল আর কর্মনীতির ভিত্তি ছিল লেনিনের বক্তব্য নয় — ঐসব বক্তব্যই। দেখা যাক ব্যাপারটা তাই ছিল কিনা।

স্মরণে থাকতে পারে — লেনিনের 'জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্নাবলি সম্বন্ধে প্রাথমিক খসড়া থিসিসের' ভিত্তিতে জাতি সমস্যা আর ঔপনিবেশিক সমস্যা সম্বন্ধে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, ঐ কংগ্রেসে এম.এন.রায়ের 'অতিরিক্ত থিসিস'ও অনুমোদিত হয়েছিল, — জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব সংক্রান্ত মূল প্রশ্নে লেনিনের থেকে ভিন্ন মত ছিল ঐ 'অতিরিক্ত থিসিসে'। উপনিবেশ এবং অধীনস্থ দেশগুলিতে সামাজিক আর আর্থনীতিক অবস্থা এবং বিভিন্ন শ্রেণীগত আর রাজনীতিক শক্তির বিন্যাস সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিশ্লেষণ ক'রে ভ. ই. লেনিন এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রাধান্যের অবস্থায় জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের অস্তিত্বের প্রারম্ভিক কালপর্যায়ে এই আন্দোলন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক হবে, এটা অবশ্যম্ভাবী। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন, 'যেকোন জাতীয় আন্দোলন কেবল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিকই হতে পারে, এটা সংশয়াতীত — কেননা, অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হল কৃষক, যারা বুর্জোয়া-পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রতিনিধি।'*

আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মূল্যায়নের জোরে লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, কোন দেশের পক্ষে পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রে যাওয়া সম্ভব — কিন্তু সে জন্যে দেশটিকে বিকাশের কয়েকটা নির্দিষ্ট পর্ব পার হয়ে যেতে হবে। কাজেই, প্রারম্ভিক পর্বে উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলিতে বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলিকে কমিউনিস্টদের সমর্থন

---

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 31. p. 241.

করতে হবে, যদিও এইসব আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকতে পারে বিভিন্ন বুর্জোয়া লোক — কেননা, এর অনেক দেশেই এখনও প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রবল, কাজেই, সেখানে বিশুদ্ধ প্রলেতারীয় আন্দোলনের কোন সম্ভাবনার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

রায়ের উপস্থাপিত বক্তব্যগুলিকে ঐ কংগ্রেসের একটা কমিটিতে বেশ আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করার পরও সেগুলিতে এই ভ্রান্ত ভাব-ধারণাটা থেকে যায় যে, উপনিবেশগুলিতে বিপ্লবের প্রারম্ভিক পর্বেও নেতৃত্ব বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের হাতে থাকতে দেওয়া চলে না। রায়ের নবম থিসিসটা এই: 'প্রথম প্রথম পর্বগুলিতে উপনিবেশগুলিতে বিপ্লব চালাতে হবে যে কর্মসূচি নিয়ে তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে অনেক পেটি বুর্জোয়া সংস্কারের ধারা, যেমন, ভূমি বিলি ইত্যাদি। কিন্তু এর থেকে আদৌ এমন কথা আসছে না যে, বিপ্লবের নেতৃত্ব তুলে দিতে হবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের হাতে।'*

ঐ কংগ্রেসে উপস্থিত একজন সদস্য ঐ দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখি বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে মিলে কাজ করা দরকার; আমরা জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলন অস্বীকার ক'রে মতান্ধ মার্কসবাদীদের মতো চললে আমাদের কাজ হবে আধখেঁচড়া।'**

জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সব সময়েই ষোল-আনা নির্ভুল প্রমাণিত হয় নি। জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন আর. পামে দত্ত, তিনি লিখেছেন, 'সংকীর্ণতাবাদের দিকে কিছু কিছু ঝোঁকের বিভিন্ন প্রারম্ভিক লক্ষণ দেখা দিয়েছিল ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের কোন কোন সিদ্ধান্ত-সূত্রে, বিশেষত তার সম্ভাব্য বিভ্রান্তিকর 'শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী' এই প্রধান স্লোগানে, তেমনি ঔপনিবেশিক প্রশ্নে অন্যান্য দিক দিয়ে মূল্যবান আলোচনায় কিছুটা সংকীর্ণতার মধ্যে...'*** এই প্রসঙ্গে একটা আগ্রহজনক মন্তব্য করেছিলেন প্রয়াত অ. ভ. কুসিনেন, তিনি লিখেছেন,

* *The Second Congress of the Communist International*, Proceedings, Moscow, 1920, p. 579.

** ঐ, পৃঃ ১৪৫।

*** R. Palme Dutt, *The Internationale*, London, 1964, p. 209.

আমাদের আরও কোন কোন প্রকাশিত বস্তুরও — যেমন, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সুবিদিত থিসিস পর্যালোচনা এবং সংশোধন করার যাবতীয় কারণই আমাদের ইতিহাসবেত্তা এবং প্রচারবিদদের রয়েছে। ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকার যে-সমালোচনা আর মূল্যায়ন এই থিসিসে দেওয়া হয়েছে, বিশেষভাবে সেটার কথা আমাকে উল্লেখ করতেই হবে। আলোচ্য থিসিসটি সূত্রবদ্ধ হতে থাকবার সময়ে ঐ মূল্যায়নে সংকীর্ণতাবাদের ছোপ ছিল। আমাদের একালের পরিবর্তিত অবস্থায়, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদার বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে, এখন ঐ মূল্যায়ন বাস্তবতার ঘোর বিরোধী।'* এমনকি পেটি বুর্জোয়াদেরও যেকোন প্রগতিশীল ভূমিকা বস্তুত অস্বীকার করা হয়েছিল। এই রকমের মূল্যায়ন ছিল লেনিনের মতের বিরোধী: জাতীয় বুর্জোয়ারা তখনও ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রগতিশীল লক্ষ্যের জন্যে কাজ করতে পারে, এই মর্মে লেনিনের যে-প্রত্যয় তারই জোরে তিনি উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলিতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের মূলকৌশল এবং কর্মকৌশল রচনা করেছিলেন।

জাতীয় বুর্জোয়াদের বৈপ্লবিক সামর্থ্যকে খাটো করে দেখার দরুন আরও একটা ভুল হয়েছিল: নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি আন্দোলনে জাতীয় উপাদানটাকে কিছুটা অবহেলা করা হয়েছিল; মুক্তি সংগ্রাম যে জাতীয় আন্দোলন না হয়ে পারে না, এই স্বতঃপ্রতীয়মান ব্যাপারটাকে দেখেও না-দেখার ঝোঁক এসেছিল। এর থেকে এমন ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারত যে, মার্কসবাদীরা যেন সামাজিক ধরনের দাবিদাওয়ার চেয়ে জাতীয় অনুভূতি থেকে উদ্ভূত দাবিদাওয়াকে কম গুরুত্ব দেন। ফলে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে জাতীয় আর সামাজিক উপাদানের মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্যের উপর হানিকর ক্রিয়া ঘটেছিল, তার দরুন কতকগুলি ক্ষেত্রে জাতির অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি থেকে সেরা সেরা অটল বিপ্লবীদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল।**

দুঃখের কথা, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রকাশিত সাহিত্যে যেসব

---

* অ. ভ. কুসিনেন, 'নির্বাচিত রচনাবলি', মস্কো, ১৯৬৬, পৃঃ ৫০৯ (রুশ সংস্করণ)।

** ঐ।

ভ্রান্ত বক্তব্য আর সিদ্ধান্ত-সূত্র রয়েছে তার কোন কোনটিকে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি সমালোচনামূলক প্রণালীতে পর্যালোচনা করেছে, আর সেগুলিকেই আজকাল ব্যবহার করছে মার্কসবাদের বুর্জোয়া সমালোচকেরাই কেবল নয় — যারা মার্কসীয় মতবাদের সংহতিরক্ষার একমাত্র গার্জেনের ভাব দেখায় তারাও। যেসব পুরন মত-সূত্র এখন বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না সেগুলিকে চীনের নেতারা এখন করেছেন তাঁদের বিভিন্ন তত্ত্বগত আর রাজনীতিক ধারণার ভিত্তি; যুদ্ধ-পূর্বকালে মার্কসবাদী পণ্ডিতদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় রচিত এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন প্রকাশিত সাহিত্যে আর দলিলপত্রে লিপিবদ্ধ বহু কাজের ধারণাকে তাঁরা উপেক্ষা করেছেন। এটাই হবার কথা — কেননা, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের উপর যেসব মত-সূত্রের বাঁধা ছক চাপিয়ে দিতে চাইছে সেটার সঙ্গে ঐসব ধারণা মেলে না।

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং তার সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্য যথার্থই বিপুল এবং বহুবিচিত্র। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন কথা বোধ হয় এই যে, প্রথমত, এতে ঐ আন্দোলনের প্রকৃতির এবং বিশ্ব বিপ্লবের একটা অঙ্গ-উপাদান বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে তার ঐতিহাসিক ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করা হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত, জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলি এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান মৈত্রীর ভিত্তিতে সামাজিক প্রগতির সম্ভাবনাগুলির বিষয়ে অনগ্রসর জাতিগুলির চোখ খুলে দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নিজস্ব জাতীয় বিশেষক উপাদানগুলি এবং প্রত্যেকটি দেশের বিশিষ্ট শ্রেণীগত আর পার্টিগত সম্পর্কগুলি, এই দুইয়েরই সযত্ন বিচার-বিশ্লেষণ এবং বিষয়গত মূল্যায়নের গুরুত্বের কথা লেনিন বারবার জোর দিয়ে বলেছেন। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টম কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'যেসব দেশে বৃহদায়তন খামারের কাজের প্রাধান্য, আর যেসব দেশে ক্ষুদ্রায়তন খামারের কাজের প্রাধান্য সেসব দেশে কমিউনিজম গড়ার কাজ যে চলবে বিভিন্ন পন্থায়, একথা পৃথিবীতে একজনও সমাজতন্ত্রী অস্বীকার করেন নি। সেটা একটা প্রাথমিক সত্য, একটা অ-আ-ক-খ।'*

প্রাকৃতিক সম্পদ অধিকতর যুক্তিসম্মতভাবে কাজে লাগানো এবং

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 29, p. 205.

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিগুলির আরও সুষ্ঠু সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, সমস্ত জনগণের জীবনযাত্রার উচ্চতর মানের (বিশেষত মেহনতী জনগণের জন্যে) স্বার্থে উৎপাদনশক্তিগুলির বিকাশ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক আর আর্থনীতিক সমতার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পুরন উৎপাদন-সম্পর্কগুলো (পুঁজিতান্ত্রিক এবং প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক) বদলাবার প্রক্রিয়াটার শুধু একটা মোটামুটি নকশাই পাওয়া যায় বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে।

লেনিন মনে করতেন, সমাজতন্ত্র গড়ার কাজ নিষ্পন্ন না হওয়া অবধি সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কোন রূপকে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা যায় না। পৃথক-পৃথকভাবে প্রত্যেকটি দেশের জন্যে সংগঠনের উত্তরণকালীন রূপ আর পদ্ধতি নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি দূরদর্শিতা এবং যুক্তিযুক্ততার প্রয়োজনের কথা বলেছেন। আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে যেসব দেশ বিশেষ অনগ্রসর তাদের বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কার সংক্রান্ত রূপ আর পদ্ধতি বাছার ব্যাপারে, এবং কৃষক আর পেটি বুর্জোয়াদের জীবনযাত্রা-প্রণালীতে বিভিন্ন পরিবর্তন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বেলায়, স্বভাবতই, সতর্ক আর দূরদর্শী হতে হবে আরও বিশেষভাবে। যেসব দেশে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক আর টেকনিকাল বনিয়াদ নেই কিংবা অর্থনীতিগতভাবে অগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে তুলনায় নেই বললেই হয়, সেসব দেশে সংস্কারসাধনের বেগ অনেক কম হবে, এটা স্বতঃপ্রতীয়মান। ছোট কৃষকের খামার, ক্ষুদ্রায়তন ব্যক্তিগত বাণিজ্য আর শিল্প এবং বিভিন্ন কুটিরশিল্প সামাজিকীকরণে অযথা তাড়াহুড়া করা হলে সমাজতন্ত্র আর তার মূলনীতিগুলি শুধু অপদস্থই হতে পারে।

গত কয়েক কয়েক বছর যাবত বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব হয়েছে মাও সে-তুং এবং তাঁর অনুগামীদের সমালোচনা আর ধিক্কারের লক্ষ্যস্থল; চীনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা একপেশে আর বিকৃত কাঠাম গড়ে, সেটাকে একটা পরম সত্তার রূপ দিয়ে তাঁরা বলেন, তাঁদের নিজেদের সেই ধারণাটাই নাকি পুঁজিতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত 'আদর্শ' সমাজের সর্বজনীন সর্বার্থসাধক। 'ভোগীর সমাজ' সংক্রান্ত বুর্জোয়া ধারণাগুলোকে সঠিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করে চীনের তত্ত্ববিদেরা বিপরীত চরমে গিয়ে বলেন, যেখানে মানুষ হবে নিছক উৎপাদনকারী, যেখানে দারিদ্র্য আর দুর্দশাকে এবং সমস্ত মানবিক মনোবৃত্তি, আবেগ কিংবা আনন্দ-আহ্লাদ

প্রত্যাখ্যান করাকে বলা হয় পরম গুণ আর চূড়ান্ত লক্ষ্য, সেটাই আদর্শ সমাজ। কঠোর জীবনযাত্রা, কৃচ্ছ্রতা আর সাংস্কৃতিক দৈন্যের অনুমোদন যুদ্ধের সময়ে বোধগম্য এবং যুক্তিসম্মত হতে পারে, কিন্তু শান্তিকালে তার অন্য অর্থ এসে যায় — তখন তো তৃতীয় দুনিয়ার বহু জাতির মধ্যে আগে থেকে বিদ্যমান জীবনযাত্রার নিচু মান সেই অবস্থায়ই রেখে দেবার উপায় নিয়ে আলোচনা করার বদলে বৈষয়িক আর আত্মিক সুযোগ-সুবিধাগুলোর ন্যায্য বণ্টনের প্রশ্ন, বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলগুলোর সুষম সদ্ব্যবহারের প্রশ্ন হাতে নেওয়াই উপযুক্ত কাজ।

শোচনীয় দুর্দশাগ্রস্ত অস্তিত্বটাকে জীইয়ে রাখার জন্যে নয় — উন্নততর জীবনের আশায়ই লোকে বিপ্লবের জন্যে যেকোন দুর্দশা মেনে নিতে এবং যেকোন বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত থাকে। প্রাক্‌পুঁজিতান্ত্রিক কিংবা অপ্রতুল মাত্রায় বিকশিত পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের অতি কঠিন এবং জটিল সমস্যাটাকে চীনা তত্ত্ববিদেরা বড় হালকাভাবেই দেখেন। যে-ডাক্তার নির্ভুলভাবে রোগনির্ণয় ক'রে রোগী কিভাবে চলবে সে সম্বন্ধে আর ওষুধ-পথ্যাদি সম্বন্ধে বিচক্ষণতাসহকারে ব্যবস্থাদি দেন তেমন নয় ঐ তত্ত্ববিদদের ফর্মুলাগুলো। জাদুকরের মন্ত্রতন্ত্র কিংবা অনুনাদী খঞ্জনী কিংবা মাদল যার ডাইনীবিদ্যার হাতুড়ে ওষুধ তারই সঙ্গে ঐসব তত্ত্ববিদের মিল দেখা যায়। সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ভাব-ভাবনা যা মাও সে-তুং প্রচার করেছেন, আর আর্থনীতিক অনগ্রসরতা অতিক্রম করার যেসব পদ্ধতি তিনি সুপারিশ করেছেন সেগুলো চীনে ব্যর্থ হয়েছে; সেগুলোতে জাদুকরী ক্ষমতা আর বিশ্বজনীন অকাট্যতা আরোপ করার জন্যে তাঁর চেষ্টা ঐ ব্যর্থতার ফলে আরও বেশি পরিমাণে ভণ্ডামি বলে ধরা পড়েছে।

বিভিন্ন প্রাক্তন উপনিবেশ এবং অধীনস্থ দেশের মানুষ আগে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারত কেবল তত্ত্বক্ষেত্রে, কিন্তু, সামাজিক সংগঠনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ আর শ্রেষ্ঠত্বগুলোকে প্রকৃত অভিজ্ঞতা আর বাস্তবতার পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়েই যথার্থ বলে যাচাই করে নিতে তাদের আর কোন বাধা নেই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বাস্তবে প্রয়োগ করা হচ্ছে অর্ধ-শতকের একটু বেশি কাল হল, কিন্তু এখন যেসব দেশ স্বাধীন বিকাশের পথে চলতে শুরু করছে তাদের বহু সামাজিক এবং আর্থনীতিক সমস্যার কত সুষ্ঠু এবং দ্রুত সমাধান পাওয়া যেতে

পারে সেটা প্রত্যয়জনক এবং মনোজ্ঞভাবে প্রদর্শন করবার পক্ষে ইতিহাসের নিরিখে ঐ স্বল্পকালই যথেষ্ট হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক ধারণাগুলির ফলপ্রদতার কথা বুর্জোয়া রাজনীতিক এবং মতাদর্শবিদেরা মানেন। যেমন, একজন বিশিষ্ট মার্কিন অর্থনীতিবিদ এবং 'আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন-উন্নয়ন ব্যাঙ্কের' প্রাক্তন সভাপতি ইউজিন ই. ব্ল্যাক্ সখেদে বলেছেন, 'কম-অগ্রসর দুনিয়ার নতুন নেতাদের মনে কমিউনিজমের একটা আভ্যন্তরিক সাড়া জাগে,' তিনি আরও বলেছেন, 'শিক্ষিতদের মধ্যে ভগ্নমনোরথ লোকদের সামনে কমিউনিজম তুলে ধরে একটা কার্যকর কর্মসূচির চিত্র — ব্যক্তিগত উচ্চাশার একটা নির্গম-পথ এবং জাতীয় ক্ষমতা গড়ার কাজে অংশগ্রহণবোধ। এই কর্মসূচি যে ফল দেয় তার নজির হিসেবে কমিউনিস্টরা দেখায় সোভিয়েত রাশিয়া আর কমিউনিস্ট চীন, দুইই কালও ছিল কম-অগ্রসর দেশ, তারা নিজেদের সেই তলা থেকে টেনে তুলে এমন হয়েছে বৃহৎ শক্তি, পশ্চিম যাদের ভয় করে।'*

এখনও ধীর-স্থিরভাবে বাস্তবতার অনুযায়ী চিন্তা করতে পারেন এমন অনেক বুর্জোয়া নেতা অর্থনীতিগতভাবে কম-অগ্রসর দেশগুলির মানুষের চিন্তাধারার উপর সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রবল ক্রিয়ার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হন। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের সদস্য উইলিয়ম ও. ডগলাস লিখেছেন, 'সোভিয়েত কমিউনিজম যেভাবে শিল্প বিপ্লবটাকে কাজে লাগিয়েছে সেটা কম-অগ্রসর এলাকাগুলোর উপর প্রবল মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া ঘটায়। প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে রাশিয়া সামন্ততন্ত্র থেকে শিল্পসমৃদ্ধ সমাজে উঠে এসেছে, রাশিয়ার স্পুৎনিক আর মহাকাশচরদের দিয়ে তার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিগুলির কথা ব্যাপকভাবে ঘোষিত হয়েছে।

''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ১৬৫ বছর লাগাতে যাবে কেন? আমাদের মতো নিজেদের জীবৎকালেই করো না কেন?' — যারা তাড়াতাড়ি কুড়েঘরের দুর্দশা থেকে রেহাই পেতে চায় তাদের উপর রাশিয়ার ঐ প্রচারের বিরাট ক্রিয়া ঘটেছে।'**

---

* Eugene R. Black, *The Diplomacy of Economic Development*, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1960, pp. 14-15.

** William O. Douglas, *Democracy's Manifesto*, New York, 1962, p. 31.

প্রাচ্যের জাতিগুলির মনে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া সম্বন্ধে সন্দেহের মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারযন্ত্রগুলো চেষ্টা করছে, — এ জন্যে তারা সেই বিরক্তিকর বানানো কথায় ঘ্যানঘেনিয়ে বলে, কম-অগ্রসর দেশগুলিতে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করাই কমিউনিজমের মতলব। যারা জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে লড়াই চালাচ্ছে তারা সবাই এই অপপ্রচারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।

যেসব জাতি ঔপনিবেশিক জোয়াল ছুড়ে ফেলেছে তারা পুঁজিতন্ত্রের দুনিয়ার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার তুলনা ক'রে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকেই পছন্দ করে, তার কারণ তারা দেখে, '**সমাজতন্ত্র হল দেশে দেশে জনগণের মুক্তি আর সুখী জীবনের পথ।** সমাজতন্ত্র দ্রুত আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নয়, এক পুরুষের জীবৎকালেই সমাজতন্ত্র কোন অনগ্রসর দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করে।'*

সমাজতন্ত্র যে-সম্ভাবনা তুলে ধরে সেটা যে বাস্তব তার প্রমাণ দেখা যেতে পারে অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে মধ্য এশিয়ার জাতিগুলির আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে। বিপ্লবের আগে উজবেক, কাজাখ, কিরগিজ, তুর্কমেন এবং তাজিকদের জীবন ঔপনিবেশিক জাতিগুলির জীবন থেকে পৃথক ছিল না। শিল্প ছিল না বললেই হয়। আধুনিক অর্থের শিক্ষার অবস্থাও ছিল তাইই, নিরক্ষরতাই ছিল নিয়ম — ব্যতিক্রম নয়।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রুশ সাম্রাজ্যের এই প্রান্তিক এলাকাগুলি আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। যেমন, কাজাখস্তানে গত ৫০ বছরে বৃহদায়তন শিল্প বেড়েছে এক-শ' গুণের বেশি, — এখন এই প্রজাতন্ত্রে যন্ত্রশিল্পে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ ইতালির সমান, আর বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ জাপানের সমান এবং ইতালির চেয়ে বেশি।

বিপ্লবের আগে গোটা সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় আর কাজাখস্তানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৭০ লক্ষ কিলোওয়াট-ঘণ্টার বেশি নয়। যাযাবর পশুপালকদের ফেল্টের ছাউনি-দেওয়া ইউর্তাগুলোতে আলোর ব্যবস্থা ছিল বড়জোর মাটির প্রদীপ কিংবা কেরোসিনের ডিবে — এখন ঘরে-ঘরে কলে-

---

* *Programme of the Communist Party of the Soviet Union*, p. 39.

কারখানায় সর্বত্র বিজলি বাতি। এই প্রজাতন্ত্রগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় বছরে মোট ১,৯০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা — অর্থাৎ, বিপ্লবের আগে সারা রাশিয়ায় যা ছিল তার ন' গুণ। এই প্রজাতন্ত্রগুলিতে মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ মোটামুটি ৮০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা — এই পরিমাণটা তুরস্কে ৯৫, ইরানে ৩৬, পাকিস্তানে ১১। এর প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রে গত অর্ধ-শতকে ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে বহু শিক্ষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়র, টেকনিশিয়ন এবং বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ-বিজ্ঞানী। বিপ্লবের আগে যেখানে উচ্চশিক্ষায়তন ছিল না একটিও সেখানে এখন পড়াশুনা করছে অযুত-অযুত ছাত্র-ছাত্রী।

সোভিয়েত উজবেকিস্তানে জনসংখ্যার প্রতি ১০,০০০ জনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা হল ফ্রান্সের ৩ গুণ, ইতালির চেয়ে ৩ গুণের বেশি, পশ্চিম জার্মানির ৪ গুণ, স্পেনের ৫ গুণ, তুরস্কের চেয়ে প্রায় ৮ গুণ এবং ইরানের চেয়ে প্রায় ১৭ গুণের বেশি।

উন্নয়নের পথে অনগ্রসর দেশের দ্রুত অগ্রগতির আর একটি প্রত্যয়জনক দৃষ্টান্ত কিরগিজিয়া। এখানেও ১৯১৭ সালের আগে শিল্প ছিল না বললেই হয়। যাযাবরদের পশুপালনই ছিল প্রধান কাজ। এখন কিরগিজ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র বড় বড় আধুনিক শিল্পায়তন রয়েছে শত শত, শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বিপ্লবের আগের আমলের চেয়ে ১১৭ গুণ বেশি।

জার রাশিয়ার প্রান্তবর্তী আগেকার এই অনগ্রসর দেশগুলিতে শিল্প ক্ষেত্রে এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক আর আত্মিক মূল্যে দু'দিক দিয়েই জীবনযাত্রার মান সমানে উন্নততর হয়ে আসছে। আধুনিক বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং আর্টের ক্ষেত্রে সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার জাতিগুলি উ'চু মানে উঠেছে। চিরাচরিত জাতীয় সংস্কৃতিরও যথার্থ্য পুনরুজ্জীবন হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত চিরায়ত সাহিত্য এইসব প্রজাতন্ত্রে সুলভ হয়েছে। আগের মতো দুর্ব্যবহারে ক্লিষ্ট এবং অন্যান্য জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করা তো দূরের কথা, এইসব মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রের জাতিগুলি এখন আন্তর্জাতিক পরিবারে সমান মর্যাদাসম্পন্ন সদস্য হিসেবে সচেতন, বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির একই অভিন্ন ভাণ্ডারে নিজেদের অবদানের জন্যে তারা গর্ব বোধ করে।

মঙ্গোলিয়া জনগণের প্রজাতন্ত্রের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক সদ্য-স্বাধীন

রাষ্ট্রের অনেক কিছু শেখার আছে, — পুঁজিতন্ত্রের পর্বটাকে এড়িয়ে এগিয়ে এই প্রজাতন্ত্রটির সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটেছে। জনগণের বিপ্লবের আগে এটি ছিল এশিয়ার সবচেয়ে অনগ্রসর দেশগুলিরই একটি। জীবনযাত্রা-প্রণালীর দিক দিয়ে দেখলে, দেশটি বেরিয়ে এল মধ্যযুগের ভিতর থেকে। এখানকার মেহনতী জনগণ ছিল নিরক্ষর, অজ্ঞ, সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত — তারা লামা আর সামন্ত নৃপতিদের হাতে নিষ্ঠুর নিপীড়ন সহ্য করত।

১৯২১ সালের বিপ্লবের পরে মঙ্গোলিয়ার জনগণ বেছে নিল বিকাশের অপুঁজিতান্ত্রিক পন্থা; সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে তারা জাতীয় শিল্পের ভিত্তি গড়ল, এখন জাতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক হয় সেই শিল্পে। দেশটির অর্থনীতির প্রধান শাখা পশুপালন উন্নততর হয়ে চলেছে। আরাত-যাযাবরেরা নতুন জীবনযাত্রা-প্রণালী ধরছে। ক্লাব-বাড়ি, আমোদপ্রমোদ ভবন আর পাঠাগার এবং হাসপাতাল বেড়ে চলেছে। ইউর্তাগুলিতে ঢুকছে রেডিও আর পত্রপত্রিকা। যাযাবরের জীবনযাত্রা থেকে স্থায়ী বসবাসের দিকে চলেছে তারা। পুরন মঙ্গোলিয়ায় ইস্কুল ছিল বোধ হয় দশ-বারোটা — এখন দেশটিতে আছে ৪১৯টা সাধারণ মধ্য বিদ্যালয়, ১৫টা বিশেষিত মধ্য বিদ্যালয়, ৭টা উচ্চ শিক্ষায়তন। বিজ্ঞান আকাদমি স্থাপিত হয়েছে। ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে বহু চিকিৎসক, শিক্ষক, কৃষিবিদ, পশুচিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়র এবং টেকনিশিয়ন।

দেশটির অগ্রগতি সম্বন্ধে নিজের যা মনে হয়েছে তার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিশিষ্ট বৃটিশ জননেতা আইভর মণ্টেগু লিখেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যেসব জাতি এখনও নিপীড়িত হচ্ছে তাদের আশা, উৎসাহ আর প্রেরণার একটা উৎস হল মঙ্গোলিয়ার মুক্তি এবং পুনরুজ্জীবনের কাহিনী।

কোরিয়া উপদ্বীপের উত্তর ভাগে প্রতিষ্ঠিত কোরিয়া জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল কাটিয়ে উঠে বহু দূর এগিয়েছে। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। কৃষকদের বিভিন্ন সমবায় সংগঠিত হয়েছে, গ্রাম্য জীবনে পরিবর্তন ঘটছে। সমস্ত গ্রামের শতকরা ৯২টিতে এবং শতকরা ৬২টি কৃষক-বাড়িতে বিজলি আলো আছে। সোভিয়েত ফৌজ দেশটিকে মুক্ত করার আগে যা ছিল তার চেয়ে সাত গুণ বেশি জমিতে এখন সেচ ব্যবস্থা হয়েছে। সমবায় খামারগুলিতে ট্র্যাক্টর এবং খামারের অন্যান্য যন্ত্রপাতির যোগান বেড়ে চলেছে।

যুদ্ধের সময়ে উত্তর কোরিয়ার ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল বিপুল, কিন্তু শিল্প সম্পূর্ণত পুনর্নির্মাণ ক'রে আরও অনেকটা বাড়ানো হয়েছে। তাদের শিল্পায়তনগুলিতে এখন বহু নতুন আধুনিক ধরনের যন্ত্র, মেশিন্‌টুল, ট্র্যাক্টর, মোটর গাড়ি, বৈদ্যুৎ মোটর, রেডিও, ইত্যাদি উৎপন্ন হচ্ছে। বড় বড় বহুমুখী রাসায়নিক শিল্পায়তন গড়া হয়েছে।

উত্তর ভিয়েৎনাম আগে ছিল আধা-সামন্ততান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক সমাজ — এখন সেখানে ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মানুষ বিকাশের পুঁজিতান্ত্রিক পর্ব এড়িয়ে এগিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ছে। মানুষের উপর মানুষের শোষণ এখন সেখানে অতীতের ব্যাপার। দেশের অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন ধানখেতগুলি এখন আর সামন্ত জমিদারদের সম্পত্তি নয় — সেগুলি এখন কৃষি সমবায়গুলির কৃষক সদস্যদের সম্পত্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যৌথখামারের প্রণালী ফসলের ফলন বাড়ার সহায়ক হয়েছে।

ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের আমলে ভিয়েৎনামে কার্যত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল না। এখন ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে চালু রয়েছে ডজন-ডজন নতুন শিল্পায়তন, — সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোস্লোভাকিয়া এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহায্যে সেগুলি তৈরি হয়েছে।

নিরক্ষরতা নেই বললেই হয়। প্রতি চার-জনে একজন উত্তর ভিয়েৎনামী ইস্কুলে যায়। শহর এবং গ্রামাঞ্চল থেকে সমস্ত রোগের মড়ক দূর করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক জোয়াল ছুড়ে ফেলার পরে মেহনতী জনগণ যদি লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে না থেমে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ অবধি দৃঢ়ভাবে সমাধা ক'রে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়তে এগিয়ে যায় তাহলে কি করতে পারে সেটা যেসব জাতি স্বাধীন বিকাশের পথে চলতে আরম্ভ করছে তাদের দেখাবার জন্যে এশিয়ার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট।

উপনিবেশবাদের মুখপাত্ররা যে বলতে চায় যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ঔপনিবেশিক দেশগুলির সামাজিক সমস্যাবলির সমাধান করতে পারে না, এই তত্ত্ব প্রাচ্যের জাতিগুলির পক্ষে বিজাতীয়, নিতান্তই হাস্যকর।

ঔপনিবেশিক এবং অধীনস্থ জাতিগুলির পক্ষে সমাজতন্ত্র আর একপ্রস্থ বিমূর্ত নীতি মাত্র নয়, সেটা জীবন্ত বাস্তবতা — সেগুলি হল সমুন্নত

আদর্শ, যা ইতোমধ্যে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে, এর ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মতাদর্শগত প্রভাব আরও শক্তিশালী হয়েছে। বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশের প্রগতিশীল নেতারা প্রথমে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নীতিগুলির প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে পরে কার্যক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রের চেহারাটাকে নিজেদের চোখেই দেখে উপলব্ধি করেন যে, মুক্তি, সমানতা আর ভ্রাতৃত্বের আশাপ্রদ স্লোগানগুলো বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু, অন্যদিকে, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের নেতারা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বাস্তবতা লক্ষ্য করলে দেখতে পান তাঁদের নিজেদেরই বহু আদর্শ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সেখানে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

আগে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতিগুলির জাতীয় বিকাশের পথ বেছে নেবার স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু আমাদের একালে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা, সেটা ক্রমাগত আরও বেশি শক্তিশালী হচ্ছে, তার আরও বেশি শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে — এই অবস্থায় প্রাক্তন উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলির জাতিগুলি দুই দুনিয়ার মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করে নিজেদের পথ বেছে নিতে পারে।

প্রস্‌পার মেরিমে'র লেখা 'তামাঙ্গো' নামে গল্পে নিগ্রো নেতা একখানা দাসব্যবসায়ের জাহাজে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দাসব্যবসায়ীদের নিহত করে দাসদের মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু সে জাহাজ চালাতে জানত না, জাহাজখানাকে স্বদেশে নিয়ে যেতে পারল না — কাজেই, সমুদ্রে ভাসতে থাকা ছাড়া জাহাজখানার গত্যন্তর ছিল না। অনেকটা সেইভাবেই, পরাক্রমশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে না ওঠা অবধি, ঔপনিবেশিক আর আধা-ঔপনিবেশিক জাতিগুলি মুক্তি অর্জন করে জানত না কোন্ পথে চলবে। এখন তাদের আর সঠিক পথ ধরবার জন্যে খোঁজাখুঁজি করার দরকার হয় না — কেননা, আলোকস্তম্ভের মতো সমাজতন্ত্র তাদের মুক্তি আর নতুন জীবনের জন্যে সবচেয়ে নিশ্চিত পথটা দেখিয়ে দেয়।

উঠতি দেশগুলির জন্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাহায্য কেবল দৃষ্টান্ত স্থাপন করাতে কিংবা বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব তুলে ধরাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এই দেশগুলিকে দাঁড় করিয়ে দিতে কার্যক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির রাজনীতিক সমর্থন এবং আর্থনীতিক সহায়তা খুবই কার্যকর হয়।

শান্তি সুরক্ষিত করা, যুদ্ধ রোধ করা এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কর্মনীতি এগিয়ে নিয়ে চলার জন্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির প্রচেষ্টার ফলে নতুন স্বাধীন দেশগুলির বিকাশের পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

চীনা নেতারা যা বলেন তার বিপরীতটাই সত্যি: বিভিন্ন-সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লেনিনীয় কর্মনীতি জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের পরিপন্থী নয় — বরং তার উল্টো, উপনিবেশবাদের বলের শ্রেষ্ঠত্বের মুখে এই কর্মনীতি ঐ আন্দোলনে অগ্রগতির সহায়ক। চীনা তত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান কর্মনীতির অর্থ হল যেসব জাতি এখন মুক্তি আর স্বাধীনতার জন্যে লড়াই চালাচ্ছে তাদের অস্ত্র ত্যাগ ক'রে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা আর পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ওটা হল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লেনিনীয় কর্মনীতির একটা বিকৃত ব্যাখ্যা। প্রকৃতপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অনুসৃত এই কর্মনীতি আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণমুখী শক্তিগুলোকে রুখে রাখে, তাদের হাইড্রোজেনবোমার যুদ্ধ বাধানো থেকে বিরত রাখে এবং সংগ্রামরত জাতিগুলি যাতে স্বাধীনতা অর্জন ক'রে সেটা নিরাপদ রাখার জন্যে সামরিক এবং রাজনীতিক যত উপায় পাওয়া যায় সবই ব্যবহার করতে পারে তাতে সাহায্য করে। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান কর্মনীতির বিকল্প হল লাগাতর এবং ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক উত্তেজনার কর্মনীতি, যা অনুসরণ করছেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এখনকার নেতারা। কিন্তু ঐ কর্মনীতি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের শক্তিগুলোকে রুখে রাখা তো দূরের কথা, বরং তাদের সম্প্রসারণের পন্থার পক্ষে সেটাই অসাধারণ আনুকূল্য করে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা যত বেশি হয়, সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের আগ্রাসী তৎপরতার সাফাই গাওয়া, পৃথিবীর সর্বত্র তাদের সামরিক ঘাঁটি বসানো এবং 'তৃতীয় দুনিয়ার' দেশগুলির সরকারগুলির উপর চাপ দেওয়া ততই বেশি সহজ হয়।

জাতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামকে শান্তি সুরক্ষিত করার সংগ্রামের পাল্টা দাঁড় করিয়ে চীনা তত্ত্ববিদেরা বস্তুত বুর্জোয়া মতাদর্শবিদদেরই সারিতে নিজেদের দাঁড় করান — বুর্জোয়া মতাদর্শবিদেরাও মনে করে, বিশ্ব বিপ্লব শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সঙ্গে বেমানান, আর শান্তির কর্মনীতি নাকি জাতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রাম সমর্থন করতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির

অস্বীকৃতিরই সামিল। কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা জানেন, শান্তির তরফে সংগ্রামের অর্থ আদৌ এমন নয় যে, যেসব জাতি তাদের উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে তাদের একমাত্র নিজেদের সংগতি-সংস্থানের উপরই নির্ভর করতে হবে। জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামকে সর্বতোভাবে সাহায্য করাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনার যেকোন প্রশমন ঘটলে সেটা অমন সাহায্য দেবার সুযোগ বাড়িয়ে দেয়।

চীনা নেতারা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে বলেন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে 'নতজানু' হবার কর্মনীতি, কিন্তু তেমন কোন অর্থ এই কর্মনীতিতে নেই। বরং এর অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সক্রিয়, জটিল, বহুমুখী সংগ্রাম, — সোভিয়েত ইউনিয়ন তার একেবারে গোড়ার দিনগুলি থেকেই শান্তি সুরক্ষিত এবং সুদৃঢ় করার সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংগ্রাম চালিয়ে আসছে।

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নতুন যুগের সূত্রপাত করল। লেনিনের 'মেহনতী এবং শোষিত জাতির অধিকারের ঘোষণা'তে প্রাচ্যের জাতিগুলির মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে গেল, কেননা, এই ঘোষণায় সোভিয়েত সরকার বুর্জোয়া সভ্যতার বর্বর কর্মনীতিটাকে সম্পূর্ণত প্রত্যাখ্যান করল — ঐ কর্মনীতি অনুসারে বুর্জোয়ারা এশিয়ায়, সাধারণভাবে উপনিবেশগুলিতে এবং ক্ষুদ্রতর দেশগুলিতে কোটি কোটি মেহনতী মানুষকে পদানত করে সৃষ্টি করেছে অল্প কয়েকটি সুবিধাভোগী দেশে শোষকদের সমৃদ্ধি।

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, সমানতা, সমস্ত জাতির মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদা আর পারস্পরিক সাহায্যের বনিয়াদে নির্ধারিত লেনিনের নীতি ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক জাতিগুলির উপর গভীর ছাপ ফেলল এবং জাতীয় মুক্তির জন্যে তাদের সংগ্রামের উপর সক্রিয় বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করল। আগে যা ছিল রুশ সাম্রাজ্য তার জাতিগুলির মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের বিকাশ আর ক্রমবৃদ্ধি ঘটল; পৃথিবীর সর্বত্র লোকে দেখল সেটা হল জাতিতে-জাতিতে সম্পর্কের একটা নতুন ধরনের দৃষ্টান্ত, নিপীড়িত জাতিগুলির মধ্যে সেটা জাতীয় এবং শ্রেণীগত চেতনা জাগিয়ে তুলল।

অক্টোবর বিপ্লবের পরে গোড়ার বছরগুলিতে সোভিয়েত রাষ্ট্র

অর্থনীতিগতভাবে দুর্বল ছিল, অর্থনীতিক্ষেত্রে তার সামনে ছিল বহু বাধাবিপত্তি, কিন্তু তখনও সোভিয়েত রাষ্ট্র তার নিকটতম প্রতিবেশীদের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমর্থন দিল। বৈদেশিক উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মঙ্গোলিয়ার মানুষকে সমর্থন দিল সোভিয়েত রাষ্ট্র। স্বাধীনতা রক্ষা করতে তুরস্ককে সাহায্য করল সোভিয়েত রাষ্ট্র — তখন কঠিন অবস্থার মধ্যে ছিল ঐ নবীন প্রজাতন্ত্রটি।

'এখন অবধি যারা ধৈর্য আর অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত বশ্যতা দিয়ে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন সমর্থন করেছে তাদের সবাইকে ঐ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে'* তুরস্ক এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের গুরুত্ব সম্বন্ধে কেমাল আতাতুর্ক সোভিয়েত সরকারের কাছে লিখেছিলেন ১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে।

জাতীয় স্বাধীনতা আর সামাজিক মুক্তির জন্যে সংগ্রামে সোভিয়েত জনগণ চীনের জনগণকে মূল্যবান সাহায্য দিয়েছিল। বিপ্লবের সময়ে — ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে — এবং জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধের সময়ে, অর্থাৎ, ১৯৩২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে, সোভিয়েত জনগণ চীনের মেহনতী জনগণকে অবিচলিতভাবে সমর্থন এবং সাহায্য দিয়েছিল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে চীনের লড়াইয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা সম্বন্ধে মাও সে-তুং বলেছিলেন, 'জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হবার পরে কোন সাম্রাজ্যবাদী সরকার আমাদের সত্যকার সাহায্য দিতে চায় নি। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিমান আর সরবরাহাদি দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছিল।'**

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে নতুন প্রেরণা যোগাল হিটলার জার্মানি আর সমরবাদী জাপানের পরাজয় — এই পরাজয় ঘটাতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকায় ছিল সোভিয়েত সশস্ত্র শক্তি। যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক পরাক্রমের বিশেষ লক্ষণীয় বিভিন্ন সাফল্য ঘটল। কতকগুলি ইউরোপীয় আর এশীয় রাষ্ট্র পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে

---

* 'সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত দলিলপত্র', ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১-১২ (রুশ সংস্করণ)।

** মাও সে-তুং, 'নির্বাচিত রচনাবলি', ৩য় খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৩, পৃঃ ১৯০ (রুশ সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

এসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একযোগে গড়ল জাতিসমূহের মহান সমাজতান্ত্রিক শিবির।

যেসব জাতি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে তারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সমর্থন পাবে বলে ভরসা রাখতে পারে, তাতে অন্যথা হবে না। ১৯৬০ সালে কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের সভার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'যেসব জাতি মুক্তির জন্যে লড়ছে, আর যারা সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল ছুড়ে ফেলেছে, তাদের যথার্থ এবং অকৃত্রিম বন্ধু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি। নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরিক ব্যাপারে যেকোন হস্তক্ষেপ নীতিনিষ্ঠাসহকারে প্রত্যাখ্যান ক'রে জাতিগুলির স্বাধীনতা আরও শক্তিশালী করার কাজে সাহায্য করাকে তারা আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য বলে মনে করে। অগ্রগতি ঘটাবার জন্যে, জাতীয় শিল্প গড়ে তোলার কাজে, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ আর সংহতি ঘটাতে এবং জাতীয় কর্মিদল গড়ে তোলার কাজে এই দেশগুলিকে তারা সহায়তা-সমর্থন দেয়, এবং বিশ্বশান্তির জন্যে আর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে।'*

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙনটা সহজ-সরল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া নয়। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের উপায়ও আছে একাধিক। কোন কোন দেশ ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন থেকে মুক্তি অর্জন করে দীর্ঘ বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীরা যেন সদয় হয়ে 'দাসত্বমোচন' ক'রে জাতীয় স্বাধীনতা দেয়। এমন জাতীয় স্বাধীনতা যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন, এই 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' ফেলে দেওয়াটা যে উপনিবেশবাদীদের স্বেচ্ছার ব্যাপার নয় সেটা খুবই স্পষ্ট।

অতীতে এমন হত — কোন জাতি উৎপীড়কদের ছুড়ে ফেলে দিলে সেই জাতি মুক্ত থাকতে পারত শুধু স্বল্পকালের জন্যে — কেননা, আগেকার প্রভুদের জায়গায় শিগগিরই আসত নতুন, এমনকি আরও শক্তিশালী প্রভু। উনিশ শতকের শেষের দিকে, দীর্ঘ সংগ্রামের পরে ফিলিপাইনের মানুষ স্পেনীয় উপনিবেশবাদীদের খেদিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ঐ উপনিবেশবাদীরা যেতে না-যেতেই ফিলিপাইনের মানুষের উপর গিয়ে চেপে

---

* *The Struggle for Peace, Democracy and Socialism*, Moscow, 1963, p. 66.

বসেছিল নতুন আক্রমণকারী — এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশেও এই কায়দা খাটাতে দেখা গেছে।

কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পরাক্রমশালী শিবির রয়েছে বলে আজকাল উঠতি দেশগুলির মুক্তি চলে যাবার ভয় আর নেই। তারা যে রক্ষণের জন্যে বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য বন্ধুদের উপর ভরসা রাখতে পারে সেটা তাদের বেশ ভালভাবেই জানা আছে। সাম্রাজ্যবাদীরা চাবুক কষাতে গেলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কঠোর হুঁশিয়ারি তাদের পিছু হঠতে বাধ্য করে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির জাতিগুলির বিভিন্ন অধিকার আর স্বার্থের জন্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সক্রিয় সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে — সেটা সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপকে অসাড় করে দেয় এবং জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের প্রসার আর শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হয়।

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে সমানতা আর পারস্পরিক মর্যাদার ভিত্তিতে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন ক'রে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই দেশগুলির রাজনীতিক বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দেয়, তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব মজবুত করার এবং বিদেশের উপর নির্ভরশীলতার অবসান ঘটাবার সুযোগ এনে দেয়। গত কয়েক বছরের ঘটনাবলির পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদীদের সুযোগসুবিধা কমে গেছে, তাদের সেই আগেকার তেজ আর দাপটও আর তেমন নেই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের বৃটিশ, ফরাসী আর অন্যান্য সহযোগীরা একদা যেমনটা ছিল তার চেয়ে এখন কম সর্বশক্তিমান — সেটা পশ্চিম গোলার্ধেই কেবল নয়, পূর্ব গোলার্ধেও।

১৯৫৬ সালে স্বাধীন মিসর সুয়েজ খাল জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিল। বৃটেন আর ফ্রান্স এই সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার ক'রে ইস্রায়েলের সঙ্গে মিলে মিসরের উপর আক্রমণ চালালো। এই আক্রমণ সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃঢ়সংকল্প মতাবস্থান এবং আক্রমণকারীদের উদ্দেশে তার প্রবল হুঁশিয়ারি মিসরের মানুষের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করতে সহায়ক হয়েছিল, মিসরে সাম্রাজ্যবাদী জুয়াড়ী চালের কলঙ্কজনক পরিণতি ঘটেছিল।

১৯৫৮ সালে জুলাই মাসে ইরাকে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজের বিরুদ্ধে দেশটির জনগণ বিদ্রোহ করল, সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ফৌজ নিয়ে

গেল এই ছোট আরব দেশটির সীমান্তে । তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আবারও ইরাকের মানুষের অর্জিত বৈপ্লবিক সাফল্যগুলির সপক্ষে দাঁড়ালো এবং আবারও সাম্রাজ্যবাদীদের হঠে যেতে বাধ্য করল।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের একেবারে নাকের ডগায় মুক্তির শিখা জ্বালালো সাহসী কিউবা -- সেই কিউবাকে সাহায্য দিয়ে আসছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিউবার মানুষের সুদৃঢ় অবস্থান এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক জাতির প্রবল সমর্থনের মুখে বিদেশ থেকে কিউবার বিরুদ্ধে পরিচালিত সমস্ত প্রতিবিপ্লবী অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় স্বাধীনতা মজবুত করার জন্যে সে দেশের জনগণের প্রচেষ্টায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরাট রাজনীতিক এবং বৈষয়িক সাহায্য দিয়েছে। সেই ১৯৪৭—১৯৪৮ সালে সদ্যোজাত ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের জাতীয় অধিকারগুলি পোক্ত-নিরাপদ করার জন্যে এবং ওলন্দাজ আক্রমণের বিরুদ্ধে ধিক্কার তোলাবার জন্যে ও ওলান্দাজ আগ্রাসন বন্ধ করানোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে অনমনীয় এবং অবিচলিতভাবে চেষ্টা করেছিল। পশ্চিম ইরিয়ান সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার জনগণকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিল।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভিটো ক্ষমতা খাটিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের জাতীয় অধিকারের বিরোধী অপচেষ্টা প্রতিহত করতে পেরেছিল এবং পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের গোয়া থেকে তাড়াবার ভারতীয় কার্যকলাপের নিন্দা ক'রে উত্থাপিত প্রস্তাবগ্রহণ রোধ করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমর্থনে ১৯৬০ সালে ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৫শ অধিবেশনে গৃহীত 'ঔপনিবেশিক দেশ এবং জাতিগুলির স্বাধীনতা মেনে নেবার ঘোষণাটি' ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক জাতিগুলির মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে বিরাট তাৎপর্যসম্পন্ন হয়েছে। সোভিয়েত খসড়া প্রস্তাবে একটা দাবি ছিল, 'অবিলম্বে সমস্ত ঔপনিবেশিক দেশ, অছিভুক্ত অঞ্চল এবং অন্যান্য অস্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলির মানুষের অবাধে প্রকাশিত ইচ্ছা আর কামনা অনুসারে তাদের নিজ নিজ জাতীয় রাষ্ট্র গড়ার ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আর মুক্তি মেনে নিতে হবে। এই রকমের সব অঞ্চলের মানুষের পক্ষে তাদের ভাগ্য এবং সরকারের রূপ নির্ধারণ করা

সম্ভব করে তোলার জন্যে ঔপনিবেশিক শাসন, ঔপনিবেশিক পরিচালনব্যবস্থাদি যত রূপে আছে সবই বিলুপ্ত করতে হবে সম্পূর্ণত।'*

'ঔপনিবেশিক দেশ এবং জাতিগুলির স্বাধীনতা মেনে নেবার ঘোষণাটি' শক্তি সমাবেশ ঘটাবার জন্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে, ঔপনিবেশিক জাতিগুলিকে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে এবং তাদের সংগ্রামের প্রতি অন্যান্য দেশে সহানুভূতি সৃষ্টি করে। ঐ 'ঘোষণা' গ্রহণ করাবার পরে তাতে ঘোষিত নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করাবার জন্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অবিচলিতভাবে চেষ্টা চালিয়েছে।

প্রাচ্যের দেশগুলিতে যাকিছু নতুন আর প্রগতিশীল সেগুলিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সমর্থন করে, আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বড় গলা করে প্রগতির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে করতে, প্রকৃতপক্ষে, আগাগোড়া দুর্নীতিগ্রস্ত, মধ্যযুগীয়, অচল রাজগুলোর সারিতেই দাঁড়ায়। আমেরিকার অনেকেই আজকাল এটা স্বীকার করেন। প্রফেসর জন ডাব্লিউ. স্প্যানিয়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্দেশে তিরস্কার জানিয়ে সখেদে বলেছেন, কমিউনিজম-বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট হয়েছে বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক রাজের সঙ্গে, গণ-সমর্থন হারিয়েছে বলে যাদের দিন ফুরিয়ে গিয়েছিল: চীনে চিয়াং কাই-শেক্, ইন্দোচীনে বাও দাই, ইরাকে রাজা হুসেন।... এইসব দেশের সামন্ততান্ত্রিক সরকারগুলি মার্কিনঘেঁষা এবং কমিউনিস্টবিরোধী ছিল কিংবা আছে, এরই ফলে তারা আমাদের দৃষ্টিতে 'গণতন্ত্রী' বলে কিংবা অন্তত সম্ভাব্য 'গণতন্ত্রী' বলে গণ্য হয়েছে।'**

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চাগিয়ে তোলা যুদ্ধোন্মাদনার দরুন বহু রাষ্ট্র সশস্ত্র শক্তি ট্রেনিং দিতে আর রাখতে এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে বিস্তর অর্থ বরাদ্দ করতে বাধ্য হয়, তাদের অর্থনীতি এখনও যথেষ্ট ভাল অবস্থায় নয় তা সত্ত্বেও। মোটামুটি হিসেবে দেখা যায়, অর্থনীতিক্ষেত্রে কম অগ্রসর দেশগুলি তাদের আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক বিকাশের হানি ঘটিয়ে সামরিক প্রয়োজন বাবত এখন খরচ করে বছরে আনুমানিকভাবে ৫০০-৬০০ কোটি ডলার। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক

---

* Fifteenth Session of the U. N. General Assembly. Proposals by the USSR, Sept. 23, 1960, New York, 1960, p. 88.

** John W. Spanier, *American Foreign Policy Since World War II*, New York, 1960, p. 199.

দেশের দৃঢ়ভাবে অনুসৃত শান্তির কর্মনীতিটিকে এশিয়ার বেশির ভাগ দেশ অনুমোদন করে এবং খুবই মূল্যবান মনে করে ঐ কারণেই।

শান্তি সুরক্ষিত করা এবং সাধারণ আর ষোল-আনা নিরস্ত্রীকরণের সংগ্রাম জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন — কেননা, এই সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঔপনিবেশিকতাবিরোধী ফ্রন্টকে দুর্বল করে না — আরও শক্তিশালী করে। পৃথিবীর সর্বত্র আরও বেশি বেশি দেশ এই সংগ্রামের সমর্থনে সমবেত হচ্ছেও বটে।

বিধ্বংসী হাইড্রোজেনবোমার যুদ্ধ রোধ করা এবং শান্তি বজায় রাখা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জাতিগুলির, ইউরোপ আর আমেরিকার পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মেহনতী জনগণের এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছে কিংবা সেজন্যে লড়ছে যেসব জাতি তাদের একই অভিন্ন লক্ষ্য। আমাদের এই গ্রহে সুস্থিত শান্তি সুরক্ষিত করার এই সংগ্রাম জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য আর স্বার্থের সঙ্গে ষোল-আনা সংগতিপূর্ণ — কোনক্রমেই ঐ আন্দোলনের সঙ্গে এর কোন বৈষম্য নেই।

বিভিন্ন-সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের অর্থ কোনক্রমেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টকে দুর্বল করা নয়: বরং তার উল্টো — পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালিত শ্রেণী-সংগ্রামে এবং নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি আন্দোলনে নতুন প্রাণশক্তি যোগায় শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের ১৯৬০ সালের মস্কো বৈঠকের বিবৃতিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়: 'শান্তি সমাজতন্ত্রের একটি বিশ্বস্ত মিত্র — তার কারণ সময় কাজ করছে সমাজতন্ত্রের পক্ষে, পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে'।*

যুদ্ধোত্তরকালের ঘটনাবলি থেকে দেখা যাচ্ছে, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কর্মনীতি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাবার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ সব সময়েই এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার জাতিগুলিকে তাদের জাতীয় মুক্তির সমুন্নত সংগ্রামে সমর্থন করতে প্রস্তুত থেকেছে এবং প্রকৃতপক্ষে সে সমর্থন দিয়েছে। এই দুই কর্মধারার মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে বেমানান কিছুই নেই।

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি শান্তি সুরক্ষিত করতে আগ্রহশীল। তাদের

* *The Struggle for Peace, Democracy and Socialism*, p. 59.

অনেকেই নিরপেক্ষতার কর্মনীতি অনুসারে চলে, তারা কোন সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটের অনুসঙ্গী নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে এখন এইসব দেশের অভিপ্রায় বিবেচনায় ধরতে বাধ্য হচ্ছে তার কারণ সর্বোপরি এই যে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী উপাদান হয়ে উঠেছে।

আগে, এশিয়া, আফ্রিকা কিংবা লাতিন আমেরিকার দেশগুলির বিষয় যেখানে সংশ্লিষ্ট থাকত সেখানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি মানত কেবল একই কর্মনীতি — সেটা হল আদেশ-নির্দেশ আর বলপ্রয়োগের কর্মনীতি, আর জানত কেবল একই ভাষা — সেটা হুমকি আর ভীতিপ্রদর্শনের ভাষা। আজকাল সাম্রাজ্যবাদীরা, স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কৌশলে চলতে, ভান করতে এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনাদি করতে বাধ্য হয়।

এইসব প্রাক্তন উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের মিত্র বলে মনে করে — এই রাষ্ট্রগুলির সমর্থনের উপর তারা ভরসা রাখতে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব তাদের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে চলবার এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী হুমকি আর 'রণংদেহি' প্ররোচনার মুখে ভয় না পেয়ে চলবার সহায়ক। তেমনি, তারাও শান্তি, নিরস্ত্রীকরণের আর উপনিবেশবাদের অবসানের জন্যে সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মিত্রের মতো কাজ করে — এইভাবে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের অবস্থান মজবুত করে।

জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, সাধারণ এবং ষোল-আনা নিরস্ত্রীকরণের জন্যে সংগ্রাম যেন জাতীয়-মুক্তি আর স্বাধীনতার সংগ্রামের বিরোধী। কিন্তু তাদের ধারণাটা ভুল — কেননা, যেসব শক্তি আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত এবং ধ্বংসের সবচেয়ে আধুনিক আর প্রবল অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী, প্রথমে এবং সর্বোপরি তাদের নিরস্ত্র করাবার জন্যেই নিরস্ত্রীকরণের জন্যে সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিরস্ত্রীকরণ স্পষ্টতই জাতীয়-মুক্তি সংগ্রাম প্রসারের অনুকূল হবে।

অস্ত্র বিক্রির ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীদের একচেটিয়া আর নেই — তার ফলে সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির রাজনীতিক অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়। মরোক্কোর রাজা ৫ম মোহাম্মেদের জীবৎকালে ফ্রান্স ঐ দেশে বিমান সরবরাহ করতে রাজি ছিল — যদি তিনি গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার কর্মনীতি

ছাড়েন। মরোক্কোর রাজা সেই শর্ত মানতে নারাজ হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে কথা তুলেছিলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন মরক্কোর ফৌজের যেমন দরকার সেইসব বিমান যথাযথভাবে সরবরাহ করেছিল, তাতে কোন শর্ত ছিল না।

শান্তি এবং সাধারণ আর ষোল-আনা নিরস্ত্রীকরণের জন্যে সংগ্রাম, আর জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের প্রাবল্যবৃদ্ধি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট; এই দুই পরস্পরের পরিপূরক। নিরস্ত্রীকরণের অর্থ হল যুদ্ধের শক্তিগুলোকে নিরস্ত্র করা — কাজেই, সেটা সম্পূর্ণতই জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের আরও বিকাশের অনুযায়ী।

নিরস্ত্রীকরণ, না, ঔপনিবেশিকতামোচন, কোন্‌টাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, এমনভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে না। অমন প্রশ্ন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চালালে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে এশিয়া আর আফ্রিকার জাতিগুলির প্রগতিশীল শক্তিগুলির মধ্যে ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং অভিন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট দুর্বল হয়।

শান্তি সুনিশ্চিত হলে এবং সাধারণ আর ষোল-আনা নিরস্ত্রীকরণ নিষ্পন্ন হলে অর্থনীতিক্ষেত্রে কম-অগ্রসর দেশগুলি আর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারবে, তারা নির্মাণ করতে পারবে আরও বেশি শিলপায়তন, সেচব্যবস্থা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, স্টেডিয়াম, ইত্যাদি।

নিরস্ত্রীকরণ নিষ্পন্ন হলে সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির জন্যে আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক এবং টেকনিকাল সহায়তা বিস্তর বাড়ানো যেতে পারে। শিল্পে-অগ্রসর দেশগুলি যে রকমের সাহায্য দিতে পারে সেটার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির। এই প্রয়োজন এবং কম-অগ্রসর দেশগুলির অন্যান্য ফ্যাসাদের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া কারবারগুলো সাহায্যের নামে তাদের প্রাক্তন উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশগুলির উপর আয়ত্তি বজায় রাখতে এবং সেটা আরও মজবুত করতে চেষ্টা করে।

শান্তি সুরক্ষিত করার এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কর্মনীতি বাস্তবে রূপায়ণের জন্যে যে-সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে সেটা এইসব সদ্য-সবাধীন দেশের জন্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আর্থনীতিক সহায়তার আরও বেশি সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। তাদের স্বাধীনতা দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যেই এই সহায়তা দেওয়া হয়। বিশেষভাবে তাদের আর্থনীতিক স্বাধীনতার

উন্নতিবিধান করে এই সহায়তা, অর্থাৎ কিনা, অনগ্রসরতা অতিক্রম করতে, বৈদেশিক পুঁজির আধিপত্যের অবসান ঘটাতে এবং পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যে আরও ভাল শর্ত পেতে সহায়ক হয় এই সহায়তা; এই সহায়তা পররাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে চলে স্বাধীন কর্মধারা (অর্থাৎ, নিরপেক্ষতা, কোন সামরিক জোটের অনুসঙ্গী না-হবার কর্মনীতি); ট্রেনিং দিয়ে বৈজ্ঞানিক এবং টেকনিকাল কর্মিদল গড়তে আনুকূল্য করে এই সহায়তা।

এক কথায়, এই সহায়তা নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের হার বাড়িয়ে চলে।

কম হারের সুদে দীর্ঘমেয়াদী ক্রেডিট দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোনায় কিংবা বৈদেশিক মুদ্রায় নয় — ক্রেডিট-পাওয়া দেশের চিরাচরিত রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রী দিয়েই ঐসব ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

ভারতে মার্কিন এবং সোভিয়েত সাহায্যের মধ্যে যাঁরা তুলনা করেন এমনসব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের দেওয়া ঋণগুলি পরিমাণে অপেক্ষাকৃত কম হতে পারে, কিন্তু এই সাহায্য অপেক্ষাকৃত বেশি আকর্ষণীয় চারটে দিক থেকে: (ক) সোভিয়েত ক্রেডিট দেওয়া হয় শতকরা মাত্র ২ ১/২ শতাংশ সুদে, কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সুদ চায় ৫ শতাংশ; (খ) সোভিয়েত ক্রেডিট পরিশোধ করতে হয় সংশ্লিষ্ট শিল্পায়তন চালু হবার পর থেকে ১২ বছরের মধ্যে, কিন্তু পশ্চিমী ক্রেডিটের মেয়াদ অপেক্ষাকৃত কম; (গ) সোভিয়েত ক্রেডিট দেওয়া হয় সরাসরি সরকারের হাতে, তার ফলে আরও বেশি পরিমাণে ক্রেডিট-পাওয়া দেশের বিচার-বুদ্ধি অনুসারেই সেটা ব্যবহৃত হতে পারে; (ঘ) বনিয়াদী সরঞ্জামের বাবত সোভিয়েত ইউনিয়ন টেকনিকাল সাহায্য দেয়।*

হংকং'-এর 'দি ফার ঈস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ' এই প্রসঙ্গে লিখেছিল: 'শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে ধনী হিসেবে উত্তর আমেরিকা আর পশ্চিম ইউরোপ দক্ষিণকে দিতে পারে অনেক কিছু — তবু, কম-অগ্রসর দুনিয়া আর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ সমানে বেড়ে চলেছে। সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উপরতলার দিকে পূর্ব-ইউরোপীয়দের বেয়ে উঠতে থাকবার সঙ্গে সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা আর

---

* 'এশিয়া এবং আফ্রিকার জাতিগুলি', মস্কো, ১৯৬৭, নং ৫, পৃঃ ২০ (রুশ সংস্করণ)।

দক্ষিণ আমেরিকার গরিব জাতিগুলিকে তাদের আর্থিক সহায়তা দেবার ক্ষমতা দ্রুত বেড়ে চলেছে। অধিকন্তু, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ঝাপে-অগ্রগতি এত সম্প্রতি ঘটেছে বলে কৃষি আর শিল্পে প্রগতির ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার সেরা উপায় সম্বন্ধে উন্নয়নশীল দুনিয়াকে দেবার মতো মূল্যবান টেকনিকাল জ্ঞান তাদের আছে।'*

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলি থেকে কেনে তাদের চিরাচরিত রপ্তানি পণ্যগুলো, আর তাছাড়া, তাদের নতুন শিল্পায়তনগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী এবং আর্থনীতিক সহযোগিতার কাঠামের মধ্যে উৎপন্ন জিনিস আর আধা-প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী — বুর্জোয়া সংবাদপত্রজগৎ এটাকে ঐ দেশগুলির আর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বিরাট গুরুত্বসম্পন্ন উপাদান হিসেবেই মনে করে।

এখন তৃতীয় দুনিয়ার ৩৪টি দেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের চুক্তি আছে। এইসব দেশকে বিস্তৃত পরিসরে অনুকূল শর্তে ক্রেডিট দেওয়া হয়েছে; মোট ক্রেডিটের তিন-চতুর্থাংশ দেওয়া হয়েছে এশিয়ার দেশগুলিকে।

৬০০টার বেশি শিল্পায়তন এবং অন্যান্য নির্মাণ প্রকল্পের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন টেকনিকাল সাহায্য দিচ্ছে — সেগুলির মধ্যে ২২০টার বেশি ইতোমধ্যে চালু হয়ে গেছে। এইসব প্রকল্পের একটা বড় অংশ হল বিভিন্ন ভারি-শিল্পায়তন — যেগুলি নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির শিল্পোন্নয়নের জন্যে উঁচু মাত্রায় গুরুত্বসম্পন্ন। ধাতুশিল্প, যন্ত্রনির্মাণ, রাসায়নিক কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহায্য করছেন সোভিয়েত টেকনিশিয়নরা।

কম-অগ্রসর দেশগুলিতে বিভিন্ন রকমের মণিকখনির জন্যে সন্ধানের কাজে সোভিয়েত ভূবিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করছেন। ভারতে পেট্রলের খনি নেই বলে পশ্চিমী একচেটিয়া কারবারিরা বলে দিয়েছিল, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং রুমানিয়ার আবিষ্কার অনুসন্ধানীরা সেইসব গালগল্পের স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে গোটা-গোটা প্রস্থ-প্রস্থ সরঞ্জামের সরবরাহ কম-অগ্রসর দেশগুলির অর্থনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বসম্পন্ন

---

* *The Far Eastern Economic Review*, Hongkong, Dec. 31, 1967—Jan. 6, No. 1, p. 23.

বৈশিষ্ট্য এই যে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির বৈদেশিক মুদ্রা আরও বেশি জরুরী কাজের জন্যে বাঁচাবার জন্যে স্থানীয় নির্মাণের-মালমসলার যথাসম্ভব বেশি সদ্ব্যবহারের জন্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিশেষজ্ঞদের চেষ্টা।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত সাহায্যে বিভিন্ন বিদ্যুত উৎপাদনকেন্দ্র আর রাস্তা তৈরি হচ্ছে, বিভিন্ন মূল্যবান কাঁচামাল আহরণ করা হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে আর্থনীতিক সহযোগিতাক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি ঘটেছে; ভারতে ৩০টার বেশি বৃহদায়তন প্রকল্প তৈরি হচ্ছে সোভিয়েত সাহায্যে। সোভিয়েত-ভারত বন্ধুত্বের একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে বিখ্যাত ভিলাই লোহা-ইস্পাত কারখানা -- এই কারখানায় ইতোমধ্যেই পরিকল্পিত পরিমাণে উৎপাদন হচ্ছে।

ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ভিলাই ছাড়া আরও দুটো লোহা-ইস্পাত কারখানা তৈরি হয়েছে -- একটা বৃটিশ সাহায্যে দুর্গাপুরে, অন্যটা পশ্চিম জার্মানির সাহায্যে রুঢ়কেলায়। এই তিনটে লোহা-ইস্পাত কারখানার মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে ভারতের বিশেষজ্ঞেরা এবং বিদেশী পর্যবেক্ষকেরা সবাই ভিলাইকেই অন্য দুটোর চেয়ে উন্নত বলেন।

'ভিলাই রেকর্ড করল', 'রুঢ়কেলায় অচলাবস্থা, কাজে দেরি, মেরামত' এবং এই রকমের অন্যান্য শিরনাম প্রায়ই দেখা যায় ভারতের পত্রপত্রিকায়। রুঢ়কেলা আর দুর্গাপুরে মিলিয়ে যতটা তত ইস্পাত উৎপন্ন হয় ভিলাইয়ে। এই তিনটে কারখানার মধ্যে একমাত্র ভিলাই থেকেই রাষ্ট্রের লাভ ওঠে। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়র, টেকনিশিয়ন এবং শ্রমিকদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল সোভিয়েত ওস্তাদদের সাহায্যে।

ভিলাই কারখানার ডিরেক্টর-জেনারেল শ্রী সেন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের সম্বন্ধে উঁচু ধারণা প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন, উঁচু মাত্রায় কর্মদক্ষ বিভিন্ন ভারতীয় কর্মীকে এই কারখানায় ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যগুলি পূরণ হয়ে চলেছে, কারখানায় কাজ চলে পরিকল্পিত ক্ষমতা অনুসারেই। কর্মীদের ট্রেনিং দেবার সমস্যা প্রসঙ্গে পর্যবেক্ষণাদি করার জন্যে শ্রী সেন ইংলন্ড, পশ্চিম জার্মানি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছেন -- তাঁর মতে সোভিয়েত প্রণালী আর ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেছেন, ভিলাইয়ে সোভিয়েত ওস্তাদ-বিশেষজ্ঞেরা টেকনিকাল শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু করেছেন -- কেননা, তাঁরা কাজ করেছেন অন্তর থেকে, সেটা ভারতীয় কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছে, ঐ

কারখানায় চমৎকার কর্মিদল গড়ে তুলতে সেটাই বহুলাংশে সাফল্য দিয়েছে।

১৯৬২ সালের মে মাসে ভারতের উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে একটা ভারি বৈদ্যুৎ সরঞ্জাম উৎপাদনের কারখানা নির্মাণের জন্যে ভারত তার ডিজাইন করার ভার দেয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে; সেটা হল ঐ রকমের কারখানার মধ্যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে বড়। এই প্রথম কণ্ট্র্যাক্টে ব্যবস্থা থাকে যে, ভারতীয় ইঞ্জিনিয়র আর টেকনিকাল কর্মীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রাথমিক ট্রেনিং পাবেন ভারতে, তারপরে সোভিয়েত সবচেয়ে বড় বড় কলে-কারখানায় তাঁরা হাতে-কলমে ট্রেনিং পাবেন। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়রিং এবং টেকনিকাল কর্মিদল গড়ে তুলতে এই ব্যবস্থায় সময় কম লাগবার কথা।

আসোয়ান বাঁধের নির্মাণকাজে মিসরকে সাহায্য করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। মিসরী অর্থনিতিবিদদের হিসাব মতো এই প্রকল্পটি চালু হবার ফলে জাতীয় আয় ৪৫ শতাংশ বেড়ে যাবে। তাছাড়া, আসোয়ান বাঁধ প্রকল্পটি জাতীয় কর্মিদলের বিস্তৃত টেকনিকাল ট্রেনিং কর্মসূচির জন্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এখানকার কর্মীরা কাজে গেছে মিসরেই শুধু নয় — আরব প্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও। কায়রোর 'আল্ মুসাওয়ার' পত্রিকা এই প্রসঙ্গে লিখেছিল: 'মিসরে ৩১২,০০০ ফেদান্ (মোটামুটি ৩২৪,৫০০ একর) অহল্যাভূমি আবাদ করার প্রকল্পে -- দেশের পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন এই প্রকল্পে -- কাজ করতে যাবে আসোয়ানে ট্রেনিং-পাওয়া কর্মীরাই। শুধু তাই নয়, 'আসোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে'র এই রকমের 'স্নাতকে'রা ইতোমধ্যেই আরব প্রাচ্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন উন্নয়নশীল বন্ধু দেশে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন কোন কোন নির্মাণপ্রকল্পে অংশগ্রহণ করছে। মিসরী বিশেষজ্ঞ এবং শ্রমিকদের সম্বন্ধে খুশির খবর আসছে কোয়াইট, জর্ডান, লিবিয়া, সৌদী আরবদেশ এবং অন্যান্য দেশ থেকে।'*

ইরাকে মজবুত জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজে সোভিয়েত সাহায্যের অবদান পড়ছে। সোভিয়েত সাহায্যে গড়া কয়েকটা শিল্পায়তনে উৎপাদন শুরু হবার পর থেকে দেশটি বেশকিছু পরিমাণ আমদানি কমাতে পেরেছে।

---

* 'বৈদেশিক পত্রিকা পরিক্রমা', নং ৩, ১২-১৮ জানুয়ারি, মস্কো, ১৯৬৮ (রুশ সংস্করণ)।

বাগদাদের সঙ্গে বস্‌রা বন্দরের যোগাযোগের রেলপথ নির্মাণের কাজে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞেরা সাহায্য করছেন। মধ্য প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় বেতারকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে, এখন গড়া হচ্ছে একটা অ্যাণ্টিবায়োটিক কারখানা এবং রেলপথের জন্যে কন্‌ক্রিটের স্লিপার উৎপাদনের কারখানা। এইসব কারখানায় কাজ পাবে ১৫,০০০ নর-নারী।

ইরাকী পত্রপত্রিকাগুলিতে বলা হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ওস্তাদ-বিশেষজ্ঞেরা জাতীয় শিল্পের বনিয়াদ গড়ার কাজে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনিকাল কর্মীদের ট্রেনিংয়ের ব্যাপারেও অনেক দিক থেকে সাহায্য দেন। পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে দেওয়া টেকনিকাল সহায়তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি থেকে দেওয়া টেকনিকাল সহায়তার যে-বিরাট পার্থক্য আছে তার কয়েকটা উপাদানের এই একটা। বাগদাদের কাছে দোরায় পেট্রল শোধনাগারটি তার একটা দৃষ্টান্ত। মার্কিন আর বৃটিশদের তৈরি এই কারখানায় ১৯৫৮ সাল অবধি নিযুক্ত ১৫৩ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞের মোট বার্ষিক মাইনে ছিল দশ লক্ষ দিনার। ১৯৫৯ সালে মে-জুন মাসে তাদের জায়গায় নিযুক্ত হন ইরাকী ইঞ্জিনিয়রেরা এবং সোভিয়েত বিশেষজ্ঞেরা — এঁরা শিগগিরই কারখানাটাকে লাভজনক অবস্থায় দাঁড় করান। তার এক বছর পরে কারখানাটিতে মাত্র তিন জন সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়র কাজ করছিলেন, — ট্রেনিং দিয়ে স্থানীয় বিশেষজ্ঞদল গড়ে দিয়ে বাদবাকি সবাই দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

আরও যে একটা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন গুরুত্বসম্পন্ন বৈষয়িক এবং টেকনিকাল সহায়তা দিয়েছে সেটা হল খামারের যন্ত্রপাতি ভাড়া দেবার স্টেশন। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রচুর পরিমাণে খামারের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে — যেমন, ট্র্যাক্টর, কাল্টিভেটর, সীডার, মই-যন্ত্র, আর তার সঙ্গে মেরামতের সরঞ্জাম। তার উপর বিভিন্ন বিশেষ পাঠ্যধারা সংগঠিত করে ইরাকের ট্র্যাক্টরচালক, মেকানিক এবং অন্যান্য কৃষিকাজের কর্মিদল গড়ে দেওয়া হয় — মোট ১২০ জন।

কম-অগ্রসর দেশগুলিতে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দেওয়া আর্থনীতিক সাহায্য প্রসঙ্গে দেখা যায়। চেকোস্লোভাকিয়া এশিয়া এবং আফ্রিকার অনেক দেশে যন্ত্রপাতি এবং গোটা প্রস্থ-প্রস্থ সরঞ্জাম সরবরাহ করছে। আফগানিস্তানে চেকোস্লোভাকিয়ার সাহায্যে তৈরি হচ্ছে একটা

সীমেণ্ট কারখানা, একটা খাদ্যাদি টিনে সংরক্ষণের কারখানা এবং অন্যান্য শিল্পায়তন। একটা ট্র্যাক্টর কারখানা এবং একটা প্রযুক্তিবিদ্যা ইনস্টিটিউট তৈরি হচ্ছে ভারতে। ইন্দোনেশিয়ায় তৈরি হচ্ছে একটা বড় টায়ার কারখানা --- তাতে দেশটির যত টায়ার দরকার হয় তার মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হবে। চেকোস্লোভাক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে মরোক্কো, তিউনিসিয়া, ইথিয়োপিয়া এবং অন্যান্য দেশে।

তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশে পোল্যান্ডের বিশেষজ্ঞেরা কাজ করছেন বিভিন্ন প্রকল্পে — যেমন, গিনীতে প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান-আবিষ্কার এবং ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র রচনার কাজে, ইরাকে একটা জল-সম্পদ বিকাশ প্রকল্পে, সিংহলে এবং আফগানিস্তানে চিনি শিল্প গড়ার কাজে।

ভারত, সিংহল এবং অন্যান্য দেশে পেট্রল শিল্প গড়ার কাজে রুমানিয়া জন-প্রজাতন্ত্র গুরুত্বসম্পন্ন সাহায্য দিচ্ছে। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং হাঙ্গেরি জনগণের প্রজাতন্ত্রও বিভিন্ন কম-অগ্রসর দেশের শিল্পোন্নয়নে আর্থনীতিক এবং টেকনিকাল সহায়তা দিচ্ছে।

অক্টোবর বিপ্লবের আগে রাশিয়ার কমিউনিস্টদের তরফে লেনিন একবার বলেছিলেন, 'মঙ্গোলীয়, পারসীক, ভারতীয়, মিসরীদের সঙ্গে পরিমেল আর মিলমিশ ঘটাবার জন্যে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব। এটা করা আমাদের কর্তব্য এবং **আমাদের স্বার্থের অনুযায়ী** বলে আমরা মনে করি — কেননা, নইলে ইউরোপে সমাজতন্ত্র **নিরাপদ হবে না**। আমাদের চেয়ে অনগ্রসর এবং নিপীড়িত এই জাতিগুলিকে আমরা **দিতে চেষ্টা করব** 'নিঃস্বার্থ সাংস্কৃতিক সহায়তা' — এই সুষ্ঠু কথাটা পোল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কাছ থেকে নেওয়া। অর্থাৎ কিনা, তারা যাতে যন্ত্রপাতির ব্যবহারে, শ্রমের লাঘবে, গণতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে এগোতে পারে সেজন্যে আমরা তাদের সাহায্য করব।* এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এইসব কর্মবিধি কার্যে পরিণত হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশক্তি এবং পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আর্থনীতিক প্রতিযোগিতায় তাদের সাফল্যগুলি পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র সংকুচিত করে ফেলছে, তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের আর্থনীতিক বনিয়াদটাকে ক্ষুণ্ন করছে, সমগ্রভাবে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

* V. I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 23, p. 67.

বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলো যেকোন উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক সাহায্যের মূল্যটাকে খাটো করে দেখাবার চেষ্টা করে তারা দেখায়, এই সাহায্যের পরিমাণ মার্কিন 'সাহায্যের' চেয়ে কম। পরিমাণটা অবশ্য কম হতে পারে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সাহায্যের উদ্দেশ্য পৃথক — এই উদ্দেশ্য হল জাতীয় স্বাধীনতা দৃঢ়তর করা; এই সাহায্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে এবং তারা যেমনটি চায় সেইভাবে জীবনযাত্রাপ্রণালী গড়তে সহায়ক হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের দেওয়া সাহায্য যেন প্রচার ছাড়া কিছু নয়, এই রকমের একটা ধারণা সৃষ্টি করা মার্কিন এবং পশ্চিম-ইউরোপীয় সংবাদপত্র জগতের বড় সাধের ব্যাপার। তবে, সোভিয়েত সাহায্যের 'অপদার্থতা' নিয়ে এইসব ভণ্ডামি আর বাকচাতুরির পিছনে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে এই সাহায্য যে আন্তরিক সংবর্ধনা পায় সে সম্বন্ধে ঐসব বুর্জোয়া অপপ্রচারকদের উদ্বেগটাও তেমন গোপন থাকে না। পশ্চিম জার্মান বুন্ডেস্টাগে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের অন্যতম বিশেষজ্ঞ হেলমুট কালবিৎসের এই রকমের উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, সোভিয়েত সাহায্যের প্রভাবে 'কম-অগ্রসর দেশগুলিতে অনেকে মার্কসীয় মতবাদ গ্রহণ করে, তারা আশা করে ঐ মতবাদ তাদের সমস্যাবলি সমাধানের সহায়ক হবে'।*

কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাহায্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে এবং বিকৃত রূপে দেখাবার জন্যে তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, পুঁজিতন্ত্রের পক্ষে যারা ওকালতি করে তারা কম-অগ্রসর দেশগুলির মানুষকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কোন রকমের 'অসদুদ্দেশ্যের' কথা বিশ্বাস করাতে পারবে না। কোন ভারতীয়ের কাছে ভিলাই — তেমনি কোন মিসরীয়ের কাছে আসোয়ান — সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত, সেটা কিছুতেই মুছে যাবার নয়। উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রগুলোর দোষে যেসব জাতি আর্থনীতিক বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি — এই যে দেশ কাঠের লাঙল থেকে এগিয়ে এসেছে পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরে আর মহাকাশযানে, এই দেশের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ, সপ্রশংস।

---

* 'বৈদেশিক পত্রিকা পরিক্রমা', নং ১২, ১৫-২১ মার্চ, মস্কো, ১৯৬৮ (রুশ সংস্করণ)।

আলজিয়ার্সের *Révolution Africaine* পত্রিকায় লেখা হয়েছে: 'আর্থনীতিক সম্পর্ক বিকাশের জন্যে চেষ্টিত আলজিরিয়া সম্পর্কে তার চমৎকার অংশীদার বলে প্রতিপন্ন হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখিয়েছে, একটা বৃহৎ শক্তি কোন কর্তৃত্ব-নির্ভরতার প্রশ্ন না তুলে সমানতার ভিত্তিতে একটা দরিদ্র দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে।

'দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার জন্যে, সততা আর সুষম বিকাশের নীতির ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপনের বিস্তৃত সম্ভাবনা রয়েছে সামনে।'*

সোভিয়েত সহায়তাকে খাটো করে দেখাবার চেষ্টায় বুর্জোয়া প্রচারকেরা নিঃসঙ্গ নয়: এখনকার চীনা নেতারা আজকাল তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী: এই নেতারা সমানে বলে চলেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলির সম্পর্ক হুবহু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্কেরই মতো। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সংশ্লিষ্ট জাতিগুলিকে বুঝাতে চাইছে যে, সমাজতান্ত্রিক সাহায্য নির্ভরযোগ্য নয় — কাজেই, তাদের নির্ভর করতে হবে নিজেদের উপর, নইলে কেবল চীনের সাহায্যের উপর। এই রকমের ভাব-ধারণা হানিকর এবং বিপজ্জনক — তার কারণ মূলত এটা হল জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামকে ভুলিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এই আন্দোলনের চারদিকে শূন্যতা সৃষ্টি করার চেষ্টা, তার আরও কারণ এই যে, সংগ্রামরত জাতিগুলির সংগ্রাম এবং ইতোমধ্যে মুক্ত যেসব জাতি ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যাবর্তন রোধ করার জন্যে লড়াই চালাচ্ছে তাদের সংগ্রাম এর দরুন দুর্বল হয়ে পড়ে।

তৃতীয় দুনিয়ার — এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার -- জাতিগুলি যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বন্ধুত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা স্থাপন করতে পারে এ সম্বন্ধে ঐসব জাতির প্রত্যয় সৃষ্টি করার জন্যে ইতিহাসের ধারা এবং আমাদের একালের ঘটনাবলি অনেক কিছুই করেছে। সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলি এবং জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের শক্তিগুলির জোট আমাদের একালের একটা পরাক্রমশালী উপাদান, -- সামাজিক প্রগতির পথে মানবজাতির যে অগ্রগতি ঘটছে সেটাকে বহুলাংশে নির্ধারণ করছে এই জোট।

---

*'বৈদেশিক পত্রিকা পরিক্রমা', নং ১২, ১৫-২১ মার্চ, মস্কো, ১৯৬৮ (রুশ সংস্করণ)।

তৃতীয় দুনিয়া